ABHYUDAYA

অভ্যুদয়

17th Reunion

21-22 Nov. 2015

PURULIA RAMAKRISHNA MISSION VIDYAPITH ALUMNI ASSOCIATION

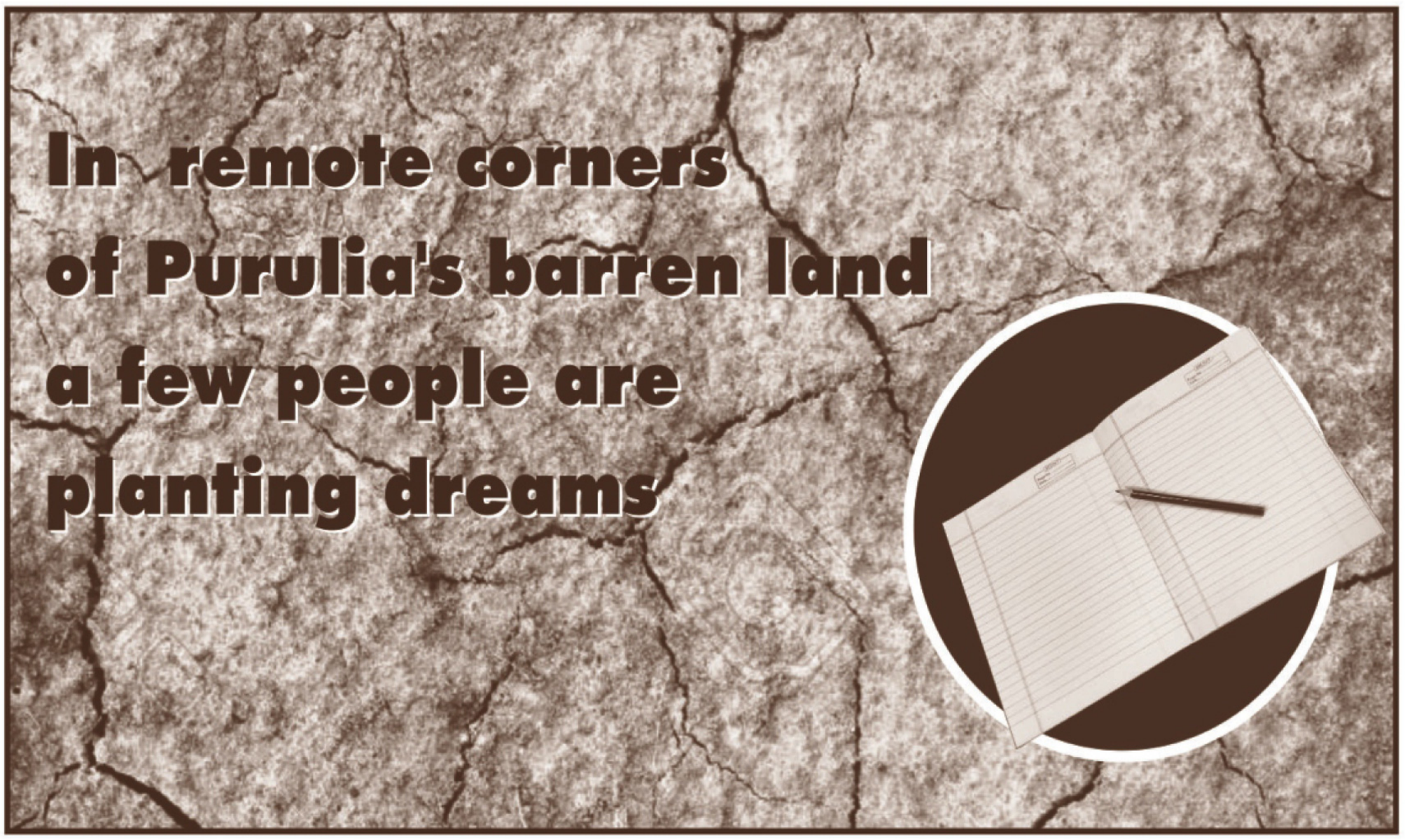

Such dreams have touched us, the 1985 Vidyapith batch

In places where even water doesn't readily reach, these people have built schools! Where hundreds of children board and hundreds come to study. Where even rice and daal serve as school fees, mud-walled huts as classes and dorms. Where the most basic amenities are like rare luxuries.

Such dreams have affected us! We, the '85 Vidyapith batch, will stand beside such schools and their children. We could only convey this to a few classmates as yet - and the help has literally overwhelmed us! But then this is the spirit of Vidyapith. This is the spirit that drives us.

We don't know how much help we'll get, how much we'll actually be able to do. But we know we'll fight. With whatever resources we can muster, we'll fight for these children. For we know that, whatever little we do will mean a lot for them. And for us. Very soon our website will also start giving you every detail of what we're doing and where.

Any ex-student of our Vidyapith, or anyone else, if you want to help such schools and their children, you're warmly welcome. By us. And by those children and teachers, who're fighting against all odds for their right to education

RKMVP 85,
55 Bhupendra Bose Avenue, Kolkata 700004 | Debasis Ghosh 98300 65295
Anindya Ghosh 80172 37023 Sanjay Tripathi 92305 02346 Partha De 98305 82495
rkmvp85@gmail.com | www.rkmvp85.in

অভ্যুদয়

সপ্তদশ সংখ্যা ২০১৫

Purulia Ramakrishna Mission Vidyapith Alumni Association

(Regd. Under the W.B. Societies Regn. Act. XXVI of 1961 No. S/68117 Dt. 16.7.91)

পুনর্মিলন উৎসব

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রাক্তন ছাত্র সমিতি

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ ১০/৩ এল্, উমাকান্ত সেন লেন, কলকাতা-৭০০ ০৩০

অফিস ঃ ৯/১, অক্রুর দত্ত লেন, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০১২

Published by :
SRI SANJAY CHATTERJEE
General Secretary
Purulia Ramakrishna Mission Vidyapith Alumni Association
9/1, Akrur Dutta Lane, Second Floor, Kolkata-700 012
Mob. : 9831161926

Published on :
21.11.2015

Editor :
SRI DEBASIS GHOSH
(Ex Student 1985)
Mob. : 9830065295

Editorial Team :
SANJAY TRIPATHI, MANISHI MUKHERJI, PARTHA DE, DEBABRATA GUHA
Ex Students 1985

Cover Picture :
SRI PANCHU GOPAL DUTTA
Ex-Teacher, Ramakrishna Mission Vidyapith, Purulia

Illustration :
PARTHA DE
Ex Student 1985

Type Setting :
PRINTING UDYOG
19D/H/14, Goabagan Street
Kolkata-700 006

Printed at :
SARADA PRINTING WORKS
3, Muktaram Babu Lane
Kolkata-700 006

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

RAMAKRISHNA MATH
P.O. BELUR MATH, DT. HOWRAH
১৫.২.৮৩

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের
প্রথম প্রাক্তন-ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব আগামী
২৬শে – ২৮শে মার্চ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে
অনুষ্ঠিত হইবে জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি।
স্বামীজীর ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত বিদ্যালয়
জাতীয়জীবনের সার্বিক উন্নতির সহায়ক।
সেই আদর্শের বিকাশের সম্ভাবনা দীর্ঘ
সর্বস্তরে কার্যকর করা সহজ তাহার
প্রাক্তনরাই এই কাজের অগ্রণীর মূল
উদ্দেশ্য হওয়া প্রয়োজন। উদ্দেশ্যের দীর্ঘ
সাফল্যের অভিমুখে এই পুনর্মিলন উৎসবের
সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করিয়া উদ্যোক্তাদের
সকলকে আমার আশীর্বাদ জানাইতেছি। ইতি

শুভানুধ্যায়ী

বীরেশ্বরানন্দ

প্রথম পুনর্মিলন উৎসব উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী

BLESSINGS FROM SRIMAT SWAMI BIRESHWARANANDA,
THE THEN PRESIDENT, RAMAKRISHNA MATH & MISSION ON THE
OCCASION OF FIRST RE-UNION

Keshari Nath Tripathi
GOVERNOR OF WEST BENGAL

RAJ BHAVAN
KOLKATA 700 062

3rd November, 2015

Message

I am glad to learn that Purulia Ramakrishna Mission Vidyapith Alumni Association is celebrating its 17th Reunion at the premises of the Vidyapith, Purulia on 21st and 22nd November, 2015.

It is laudable that a souvenir titled Abhudaya is being released to commemorate the occasion.

I convey my felicitations to the members of the Association and wish the celebration and publication all success.

K. N. Tripathi

Keshari Nath Tripathi

PHONES PBX : (033)
2654-1144 2654-5700
2654-1180 2654-5701
2654-5391 2654-5702
2654-9581 2654-5703
2654-9681 2654-8494
FAX : 033-2654-4071
E-Mail : president@belurmath.org
presidentoffice@belurmath.org

RAMAKRISHNA MATH
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711 202
INDIA

Shri Ramakrishna Sharanam

MESSAGE

30th October 2015

It is a matter of great joy that the Purulia Ramakrishna Mission Vidyapith Alumni Association will be celebration its 17th Reunion on 21st and 22nd November 2015 at the serene premises of the Vidyapitha itself. On the occasion of the 17th re-union of the alumni, a Souvenir 'Abhudaya' too will be released.

It gives me great pleasure to know that the alumni has supported and conducted welfare activities for the benefit of their Alma Mater as well as the public in general. May your noble work grow in leaps and bounds, helping more and more people of the society, is my earnest prayer to Sri Ramakrishna and Holy Mother Sri Sarada Devi.

I convey my best wishes to all the alumni and the members of the school. May Sri Ramakrishna, Holy Mother Sri Sarada Devi and Swami Vivekananda continue to bestow their infinite grace on this institution and all those associated with it.

(Swami Atmasthananda)
President
Ramakrishna Math & Ramakrishna Mission

Sri Sanjay Chattopadhyay
General Secretary
Purulia Ramakrishna Mission Vidyapith Alumni Association

Phone PBX .
(033) 2654-1144 / 1180
(033) 2654-9581 / 9681
FAX : (033) 2654-4346
Email : rkmhq@belurmath.org
rkmhqoffice@gmail.com
Website : www.belurmath.org

RAMAKRISHNA MATH
(The Headquarters)
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711202
INDIA

Message

Dated 24 October 2015

Infused with the inspiration of Swami Vivekananda, Ramakrishna Mission Vidyapith Purulia is trying to maintain the spirit. I believe that Vidyapith's Alumni Association too is committed to follow the journey. I am happy to note that the Association's 17th Reunion will be celebrated on the 21st and 22nd November 2015 and that a souvenir 'Abhudaya' will be an important feature.

I pray to Sri Sri Thakur, Sri Sri Ma and Sri Swamiji Maharaj to bless your noble endeavours.

Swami Prabhananda

(Swami Prabhananda)
Vice President

Sri Sanjay Chattopadhyay
General Secretary
Purulia Ramakrishna Mission Vidyapith Alumni Association

সূ চি প ত্র

চিন্তনে মননে 13-43

বিদ্যাপীঠের আঙ্গিকের একাংশ / স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ 13
স্বামী বিবেকানন্দ ঃ এক ঘনীভূত প্রেমমূর্তি / স্বামী বিশ্বনাথানন্দ 16
সত্যের স্বরূপ ও সত্যস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ / স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ 25
স্বাধীনতার রঙ / স্বামী শিবপ্রদানন্দ 34
নচিকেতা ঃ ফিরে দেখা / স্বামী দিব্যসুখানন্দ 36
Evolve Yourself to God / Swami Dhyeyananda 40

শিক্ষকের কলম 44-52

প্রিয় অভী / শক্তিপ্রসাদ মিশ্র 44
Dr. A. P. J Abdul Kalam : The Ratna of Mother India / Md. Anwarul Haq 52

স্মরণ 54-62

সে দিন গেছে চলে / অজন্তা দত্ত 54
অনুকে লেখা খোলা চিঠি / প্রান্তিক সিংহ 56
মনে রেখো / সুভাষ চন্দ্র চৌধুরী 58
রঞ্জিতদা / অনির্বাণ নাগ 60
পাঁচুদা / বিশ্বজিৎ রায় 61

কবিতা 63-74

চরৈবেতি / চন্দন সেন 63
কল্পনার কথা / সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় 63
বোঙাবাড়ি / মনীষী মুখোপাধ্যায় 64
আমি, আমার বন্ধু যারা / দেবব্রত গুহ 68
গানের পাখি / উদ্দালক ভরদ্বাজ 69
ঘরে ফেরা / সঞ্জয় মুখার্জী 70
আঁকার ক্লাস-এ ছুটি / কৌশিকীশরণ মিশ্র 71
এপার ওপার / বিশ্বরূপ যশ 72
''Thank You Sir'' / Smarajit DasGupta 74

অনুগল্প 75

অস্বাভাবিক / দেবাশিস ঘোষ-২ 75

গল্প 76-78

সম্পর্ক চিরকালীন / চিন্ময় দাস 76

সূচিপত্র

গ্রন্থচর্চা 79-90

পুস্তক সমালোচনার সার্বিক মূল্যায়ণ / পৃথু হালদার 79
Rowlingverse / Manash Sarkar 81

পরবাস থেকে 91-99

উলটো রাজার দেশ / অরিন্দম চক্রবর্তী 91
Karibu Africa / Suman Sankar Ghosh 93
Musings on a journey back home / Samik Kumar Bandyopadhyay 97

প্রবন্ধ 100-109

স্কুল ছুটির পরে / ইন্দ্রজিৎ রায় 100
Cafe Commoners / Ritwik Mukherjee 102
Global Warming Conundrum : What can we do? / Sankha Bhowmick 107

স্মৃতিসুধা 110-163

বোধোদয় / দীপক অধিকারী 110
'তোমার পরে ঠেকাই মাথা' / ডাঃ (অধ্যাপক) উদয় চৌধুরী 112
অনুভবে বিদ্যাপীঠ / সুজয় দে 118
নকশি-কাঁথা / পার্থ দে 121
একটুকরো স্মৃতির খোঁজে / অভিজিৎ ভট্টাচার্য-২ 134
বিদ্যাপীঠের স্মৃতি / তীর্থংকর বন্দ্যোপাধ্যায় 136
হারানিধি অথবা পারশনাথের বিরল তীর্থঙ্কর / প্রসেনজিৎ সিংহ 139
প্রিয় মিতসিজা / শুভ্রকান্তি চক্রবর্তী 143
মা-বিদ্যাপীঠ / বিশঙ্ক বিশ্বাস 144
প্রিয় অর্ক, ইতি অভিষেক / অভিষেক মল্লিক 147
ঘরের ওপরে চিলেকোঠা / প্রকাশ কুণ্ডু 149
My School : Remembrance of things past / Niranjan Goswami 153
A Desperate Effort / Jaydip Ganguli 155
Purulia Ramakrishna Mission—My memories / Somrita Mazumder 162

পেশার নেশা 164-166

জলের জঙ্গলে / অয়ন ঘোষ 164

Faith-Hope-Shelter

শিল্পী : ডাঃ অনির্বাণ সেনগুপ্ত (মাধ্যমিক ১৯৯৩)

বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ (বাঁকুড়া)

ফণিভূষণ খাটুয়া (১৯৪৪-২০১৪)

আমাদের প্রিয় বাংলা শিক্ষক ফণিদার জন্ম ৩রা জানুয়ারী ১৯৪৪ সালে। ছোটবেলা কেটেছে মেদিনীপুরের রাগপুর গ্রামে। গোবর্ধনপুরের প্রমথনাথ বিদ্যায়তনে স্কুল শিক্ষার পর কলকাতা চলে আসেন প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলায় অনার্স পড়তে।

স্নাতক হওয়ার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় স্নাতকোত্তরেও সসম্মানে উত্তীর্ণ হন।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে বাংলার শিক্ষক পদে যোগদান করেন '৬৭ সালে। সেই থেকে মিশনের ছাত্রদের বাংলা ব্যাকরণের নরম জমি শক্তপোক্ত করে তোলার কাজে তিনি আজীবন ব্রতী ছিলেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের বাংলা ভাষার নির্মাণ শেখা। তিনি দীর্ঘদিন সহকারী প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেন। এই মননশীল মানুষটি চমৎকার গল্প বলতেন যা ছাত্রদের কাছে খুব আকর্ষক ছিল। শিক্ষক দিবসের নাটকে তাঁর অনবদ্য নাট্যাভিনয় বিদ্যাপীঠবাসীর স্মৃতিতে বরাবর উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমাদের প্রিয় অঙ্কন শিক্ষক পাঁচুদার জন্ম অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে। তাঁর আদি বাড়ি ঢাকাতে শৈশব কাটে। পরবর্তীকালে নদীয়ার চাকদহে চলে আসেন এক আত্মীয়ের কাছে। তিনি বিদ্যাপীঠে (১৯৬২-১৯৬৪) আর্ট এ্যাসিসটেন্ট রূপে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালে ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেন। এরপর ১৯৭২ সালে পাকাপাকি ভাবে বিদ্যাপীঠে অঙ্কন শিক্ষকের পদে যোগ দেন। 'নন্দলাল বসু ঘরানার' অঙ্কনশৈলীর অনুসারি ছিলেন তিনি। অগ্রজপ্রতিম সহকর্মী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি 'মাষ্টারমশাই' সম্বোধন করতেন। কলকাতার অ্যাকাডেমিতে (১৯৭৪, ১৯৭৬, ১৯৭৮, ১৯৯১) পাঁচুদা নিজস্ব একক প্রদর্শনী করেন। (২০০৭, ২০০৮) সালে মিলিতভাবে দুটি প্রদর্শনী করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত ও চিত্রকলা অ্যাকাডেমি থেকে (১৯৭৮) চিত্রকলা বিভাগে পুরস্কৃত হন। তাঁর প্রেরণায় বিদ্যাপীঠের বহু ছাত্রের শিল্পীসত্তা বিকশিত হয়।

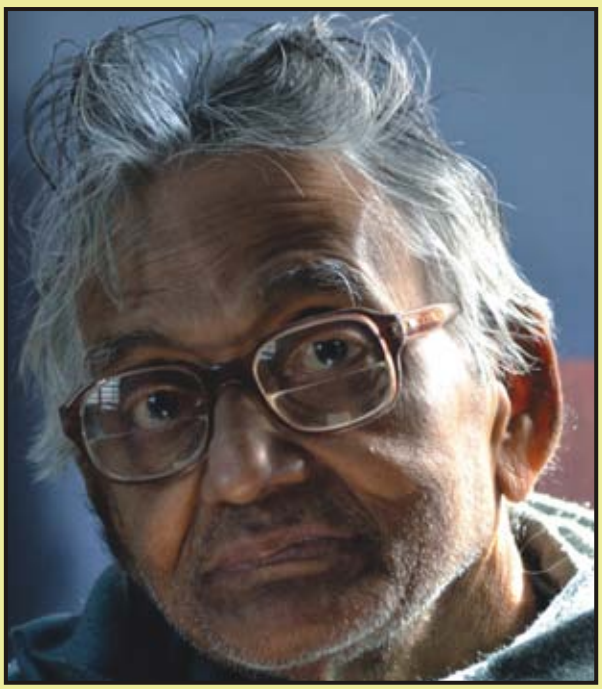

পাঁচুগোপাল দত্ত (১৯৩৯-২০১৫)

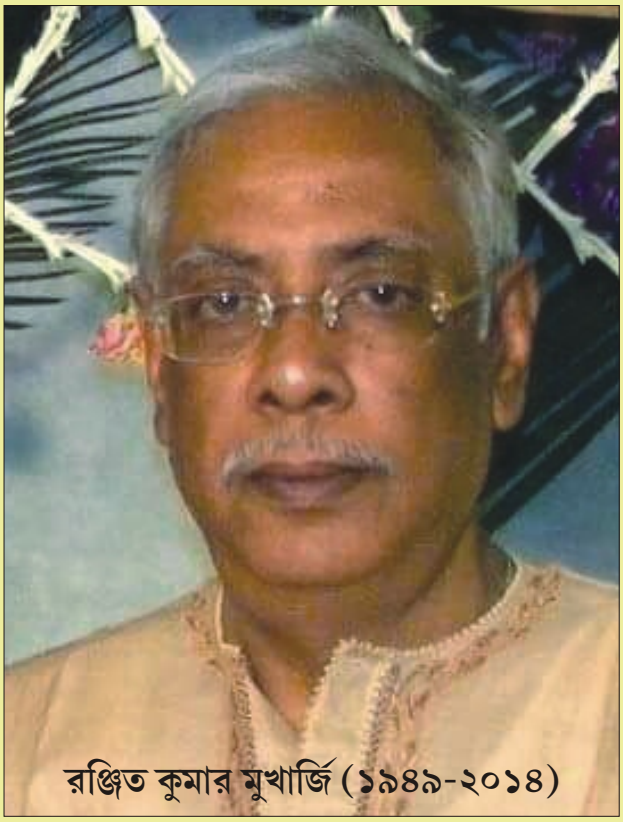

রঞ্জিত কুমার মুখার্জি (১৯৪৯-২০১৪)

রঞ্জিত কুমার মুখার্জী জন্ম কলকাতায় ১লা নভেম্বর ১৯৪৯ সালে। বাবা রেলে চাকরি করার সুবাদে তাঁর শৈশব কাটে কলকাতা, পাটনা, বারাউনি ইত্যাদি নানা শহরে। পড়াশুনা শুরু করেন কলকাতার মেট্রোপলিটন স্কুলে। পরে ভর্তি হন ব্রাহ্মবয়েজ স্কুলে। এরপর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর আবাসিক স্কুলে ভর্তি হন এবং পরবর্তীতে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ থেকে ১৯৬৮ সালে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করেন। পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রাক্তন ছাত্র সমিতি গঠনে এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে রঞ্জিতদার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। উনি দীর্ঘদিন সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব সফলতার সঙ্গে পালন করেন। রঞ্জিতদার নিজস্ব বাড়িতে (উমাকান্ত সেন লেন) সমিতির রেজিস্টার্ড অফিস স্থাপিত হয়। পরে উনি প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন নিয়ে সমিতির ৯/১ অক্রুর দত্ত লেনে অফিস ঘরটি কিনতে সহায়তা করেন। বাস্তবিক অর্থে রঞ্জিতদাই এই সমিতির জীবনী ও চালিকা শক্তি ছিলেন।

সুধন্য রায়

সুধন্য রায় বাঁকুড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বয়সে বিদ্যাপীঠে আসেন বাসচালকের দায়িত্ব নিয়ে। এক সময় ডি.এস.টি.সি-র চাকরিতেও যোগ দেওয়া হয়নি তাঁর কারণ কালীপদ মহারাজের স্নেহের আকর্ষণ তাঁর পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ যখন সম্পাদক ছিলেন তখন তাঁকে নিয়ে টাটা নগর চলে গিয়েছিলেন বিদ্যাপীঠের জন্য বাস কিনতে। আমাদের এক্সকারসনের রোমাঞ্চকর দিনগুলোয় সুধন্যদা আমাদের কাছে নায়কের মতো হয়ে উঠেছিলেন।

মনে পড়ে অ্যাসেম্বলি হলে প্রজেক্টার চালিয়ে আমাদের সিনেমা দেখাতেন তিনি। সেই মরমী মানুষটি চলে গেলেন ১৬ জুলাই ২০১৫।

১৯৮৫-এর প্রাক্তনীরা বিদ্যাপীঠের বেসরকারী চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের কল্যানার্থে
৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকার একটি চেক তুলে দিলেন বিদ্যাপীঠ কর্তৃপক্ষের হাতে

সুবর্ণ জয়ন্তী ব্যাচ, ১৯৬৬ সালে বিদ্যাপীঠ থেকে হায়ার সেকেন্ডারী পরীক্ষার্থীদের গ্রুপ ছবি।
এদের অনেকেই বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনীদের সংগঠন 'পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ
অ্যালামনি এ্যাসোসিয়েশন' গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন।

চিন্তনে মননে

বিদ্যাপীঠের আঙ্গিকের একাংশ

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—যদি পিছনে ভাবনা থাকে তাহলে পরে সেটা একটা Structure। কিন্তু যদি ভাব থাকে সেটা হল Architecture। স্বামীজীর এই ভাব ও চিন্তাধারাই আমাকে পরিচালিত করেছিল। আমি চেয়েছিলাম আমাদের এখানকার প্রত্যেকটি বিল্ডিং-এর পিছনে কিছু কিছু ভাবধারা থাকবে। তাই সারদা মন্দির নামে যে বিল্ডিং, সেই বিল্ডিং তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর সেই আইডিয়াকে কিভাবে রূপ দেওয়া যায় আমরা তার চেষ্টা করেছিলাম।

নতুন ধরণের বাড়ী গড়ার কাজ আরম্ভ করার পিছনে একটা চিন্তাধারা আমার মনে ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যখন নব অভ্যুত্থান হয়, রেনেসাঁস হয় ধর্মের ক্ষেত্রে, তাকে অবলম্বন করে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা রকমের নতুন চিন্তাধারার অভ্যুদয় হয়। শিল্পকলা, চারুকলা, স্থাপত্যবিদ্যা এ সমস্ত ক্ষেত্রেও নতুন চিন্তার অভ্যুত্থান হয়ে থাকে। মুসলমান যুগের সময়ে ভারতীয় শিল্পকলা ব্যাহত হয়েছিল। যদিও মুসলমানদের যে শিল্পবিদ্যা তার সংমিশ্রণে ভারতে মুঘলদের শিল্পকলা গড়ে উঠেছিল। এবং তার পরেও নানারকম শিল্পকলার চর্চা হয়েছিল; কিন্তু ঠিক ঠিক চিন্তা করতে গেলে দেখা যায় মুসলমান যুগের পর থেকেই ভারতের বিশেষ করে স্থাপত্য বিদ্যা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল যেখান থেকে তার গতিবেগ প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বৃটিশ রাজত্ব আসার পর সেটা আরও বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। এর ব্যতিক্রম হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠের জন্য যে মন্দিরের পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই মন্দির। এই মন্দির যেন বহুযুগের অবরুদ্ধ স্রোতকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ভারতের স্থাপত্যকলার একটি নতুন দিগ্‌দর্শন রামকৃষ্ণ মন্দির যা বেলুড়ে অবস্থিত।

আমারও এই কথাই মনে হয়েছিল যে স্বামীজীর চিন্তাধারা যে সমস্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে সেখানে কেবলমাত্র কতগুলি structure বা বাড়ী তৈরী করলেই হবে না, সেখানে থাকা প্রয়োজন স্থাপত্যবিদ্যার নতুন কিছু চিন্তার প্রয়াস, নতুন কিছু প্রস্ফুরণের প্রয়াস। এইটি দিয়েই পুরুলিয়ায় সারদা মন্দির, যা বিদ্যালয় গৃহ, সেই বিদ্যালয় গৃহকে আরম্ভ করতে হবে। এই বিষয়ে আমরা প্রচুর সাহায্য পেয়েছি শ্রী সুনীল পালের কাছে, যিনি একজন বড় শিল্পী।

এই বিদ্যালয়ের আঙ্গিকের পিছনে একটি চিন্তাধারা আছে। বিদ্যালয় হচ্ছে সরস্বতীর স্থান। সুতরাং বিদ্যালয়ের সামনে সরস্বতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু সরস্বতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে তাকে একটা মন্দিরের ভেতর প্রতিষ্ঠা করা দরকার। সে জন্য বিদ্যালয়ের চূড়া পরিকল্পিত হয়েছে। এবং সেই চূড়ার ভেতরে দেবী সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটেছে।

বিদ্যালয় গৃহের একেবারে উপরে রয়েছে দুটো মকরের মূর্তি। সেই মকর মূর্তির মাঝখানে রয়েছে একটি সূর্যমুখীর কুঁড়ি। মকর হচ্ছে জলের জন্তু। সেই জন্তু হঠাৎ আকাশে গিয়ে উঠল কেন? তার কারণ হচ্ছে আকাশেও রয়েছে মকর। সে মকর হচ্ছে মকর রাশি। মকর রাশি আকাশে দেখা যায়। সেই মকর রাশির মাঝখানে রয়েছে সূর্যমুখীর ফুল। এর দ্বারা সূচিত হচ্ছে মকর রাশিতে সূর্যের সংক্রমণ। 'মকর রাশিস্থে ভাস্করে'। রবি যখন মকর রাশিতে আসে তখন মাঘ মাস। এটি হচ্ছে সরস্বতী পূজার প্রশস্তকাল। সেই কাল

সম্পাদকীয়

বাউলমন আমার...

পূণর্মিলন ব্যাপারটাই আমাদের কাছে বেশ পুলক জাগানো। নতুন-পুরোনো মানুষগুলোকে কাছে পাওয়া। বিদ্যাপীঠের বাতাস বুক ভরে টেনে নেওয়ার সুযোগ আর স্মৃতিসুধায় অবগাহন। এবারের ১৭তম পূণর্মিলন উৎসব একইসঙ্গে আনন্দ ও বেদনার।

ফণীদা নেই, পাঁচুদা নেই, সুধন্যদা নেই—ভাবলেই দু-চোখ জুড়ে নেমে আসে বিষাদসিন্ধু। রঞ্জিতদাকে আচমকা হারানোও প্রাক্তনীদের কাছে বড় আঘাত!

তবু দু-বছর অন্তর পূণর্মিলন উদ্‌যাপন তো আর আনুষ্ঠানিকতা নয় তা যেন মাতৃক্রোড়ে ফিরে আসার ওম জড়ানো অনুভূতি। তাই আমরা বারবার ফিরে আসি এক অমোঘ টানে। ভাবতে ভাল লাগে বিদ্যাপীঠ এখনও দু-হাত প্রসারিত করে আমাদের ডাকে মায়ের মতো। আমাদের এ অনুভব থাকবে আজীবন।

এবারের 'অভ্যুদয়' হাজির মনোজ্ঞ প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প আর ছাত্রদের স্মৃতিসুধার ভাণ্ড উজাড় করে। প্রয়াত প্রিয় শিক্ষকদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গ্রন্থিত এই সংখ্যাটির প্রচ্ছদ হয়েছে প্রয়াত পাঁচুদার সুবিখ্যাত বাউল ছবিটি। প্রশ্ন জাগে—'বাউল কেন?'

শিল্পী পাঁচুদার অন্তরটিতো এক মরমী বাউলেরই ছিল যে লঘু ছন্দে ছুটে বেড়াত বিদ্যাপীঠের প্রাঙ্গনে। সৌন্দর্য চয়ন করে বন্দী করত ক্যানভাসে... তেলরঙে, অ্যাক্রিলিকে... সেও তো বাউলের সঙ্গীতময় সৌন্দর্য!

পূণর্মিলন উৎসবও পাঁচুদার ছবির মত। হাজারো আনন্দ বেদনার রং মিলেমিশে এক সঙ্গীতময় চিত্র রচনা ক'রে। প্রকৃত অর্থেই জীবনের পূর্ণতা ও শূণ্যতার মিলন বিন্দু হয়ে ওঠে।

চিন্তনে মননে

বিদ্যাপীঠের আঙ্গিকের একাংশ

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—যদি পিছনে ভাবনা থাকে তাহলে পরে সেটা একটা Structure। কিন্তু যদি ভাব থাকে সেটা হল Architecture। স্বামীজীর এই ভাব ও চিন্তাধারাই আমাকে পরিচালিত করেছিল। আমি চেয়েছিলাম আমাদের এখানকার প্রত্যেকটি বিল্ডিং-এর পিছনে কিছু কিছু ভাবধারা থাকবে। তাই সারদা মন্দির নামে যে বিল্ডিং, সেই বিল্ডিং তৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর সেই আইডিয়াকে কিভাবে রূপ দেওয়া যায় আমরা তার চেষ্টা করেছিলাম।

নতুন ধরণের বাড়ী গড়ার কাজ আরম্ভ করার পিছনে একটা চিন্তাধারা আমার মনে ছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন যখন নব অভ্যুত্থান হয়, রেনেসাঁস হয় ধর্মের ক্ষেত্রে, তাকে অবলম্বন করে সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা রকমের নতুন চিন্তাধারার অভ্যুদয় হয়। শিল্পকলা, চারুকলা, স্থাপত্যবিদ্যা এ সমস্ত ক্ষেত্রেও নতুন চিন্তার অভ্যুত্থান হয়ে থাকে। মুসলমান যুগের সময়ে ভারতীয় শিল্পকলা ব্যাহত হয়েছিল। যদিও মুসলমানদের যে শিল্পবিদ্যা তার সংমিশ্রণে ভারতে মুঘলদের শিল্পকলা গড়ে উঠেছিল। এবং তার পরেও নানারকম শিল্পকলার চর্চা হয়েছিল; কিন্তু ঠিক ঠিক চিন্তা করতে গেলে দেখা যায় মুসলমান যুগের পর থেকেই ভারতের বিশেষ করে স্থাপত্য বিদ্যা এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল যেখান থেকে তার গতিবেগ প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বৃটিশ রাজত্ব আসার পর সেটা আরও বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়। এর ব্যতিক্রম হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠের জন্য যে মন্দিরের পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই মন্দির। এই মন্দির যেন বহুযুগের অবরুদ্ধ স্রোতকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। ভারতের স্থাপত্যকলার একটি নতুন দিগ্‌দর্শন রামকৃষ্ণ মন্দির যা বেলুড়ে অবস্থিত।

আমারও এই কথাই মনে হয়েছিল যে স্বামীজীর চিন্তাধারা যে সমস্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রকাশ পাচ্ছে সেখানে কেবলমাত্র কতগুলি structure বা বাড়ী তৈরী করলেই হবে না, সেখানে থাকা প্রয়োজন স্থাপত্যবিদ্যার নতুন কিছু চিন্তার প্রয়াস, নতুন কিছু প্রস্ফুরণের প্রয়াস। এইটি দিয়েই পুরুলিয়ায় সারদা মন্দির, যা বিদ্যালয় গৃহ, সেই বিদ্যালয় গৃহকে আরম্ভ করতে হবে। এই বিষয়ে আমরা প্রচুর সাহায্য পেয়েছি শ্রী সুনীল পালের কাছে, যিনি একজন বড় শিল্পী।

এই বিদ্যালয়ের আঙ্গিকের পিছনে একটি চিন্তাধারা আছে। বিদ্যালয় হচ্ছে সরস্বতীর স্থান। সুতরাং বিদ্যালয়ের সামনে সরস্বতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু সরস্বতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে গেলে তাকে একটা মন্দিরের ভেতর প্রতিষ্ঠা করা দরকার। সে জন্য বিদ্যালয়ের চূড়া পরিকল্পিত হয়েছে। এবং সেই চূড়ার ভেতরে দেবী সরস্বতীর আবির্ভাব ঘটেছে।

বিদ্যালয় গৃহের একেবারে উপরে রয়েছে দুটো মকরের মূর্তি। সেই মকর মূর্তির মাঝখানে রয়েছে একটি সূর্যমুখীর কুঁড়ি। মকর হচ্ছে জলের জন্তু। সেই জন্তু হঠাৎ আকাশে গিয়ে উঠল কেন? তার কারণ হচ্ছে আকাশেও রয়েছে মকর। সে মকর হচ্ছে মকর রাশি। মকর রাশি আকাশে দেখা যায়। সেই মকর রাশির মাঝখানে রয়েছে সূর্যমুখীর ফুল। এর দ্বারা সূচিত হচ্ছে মকর রাশিতে সূর্যের সংক্রমণ। 'মকর রাশিস্থে ভাস্করে'। রবি যখন মকর রাশিতে আসে তখন মাঘ মাস। এটি হচ্ছে সরস্বতী পূজার প্রশস্তকাল। সেই কাল

এসেছে বিদ্যাপীঠ গৃহে। দেবী সরস্বতীর আবাহনের কাল। তাঁর অবতরণের কাল। দেবী নেমে আসছেন, তাঁর পা এসে ছুঁয়েছে একটি বিকচোন্মুখ কমলকে। বিকচোন্মুখ কেন? কারণ এখানে যারা আসবে তাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত নয়। তারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান পায়নি। দেবীর পদার্পণে তাদের হৃদয় কমল ধীরে ধীরে উন্মীলিত হবে, তাদের জ্ঞানলাভ হবে। সেই দেবী ছাত্রের হৃদয়ে, ভক্তের হৃদয়ে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ করছেন এবং ভক্তের হৃদয়ে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ করছেন এবং ভক্তের হৃদয়কমল ধীরে ধীরে উন্মীলিত হচ্ছে। তার নীচে রয়েছে উত্তর দিকে মুখ করে একটি হংস। সেই হংস উত্তর দিকে মুখ করে চলেছে। উত্তর দিকে মুখ করে কেন? কারণ উত্তর দিকে রয়েছে মানস সরোবর। মানস সরোবর মানে হচ্ছে মনের সরোবর। Intellectual যে life, বুদ্ধির যে জীবন, সেই জীবনের দিকে হংসের গতি। হংস হচ্ছে দেবীর বাহন এবং সেই হংস চলেছে মানস সরোবরের দিকে। হংস হচ্ছে মানবাত্মার প্রতীক। এখানে মানস সরোবরযাত্রী যে হংস সে হংস হচ্ছে ছাত্রাত্মার প্রতীক। শুধু একটি হংস নেই, নীচে দেওয়ালের উপরে অসংখ্য হংস রয়েছে। হংসযূথঃ—অনেক হংস। তারা চলেছে মানস পথে মানস সরোবরের দিকে। দেবী নেমে এসেছেন। যখন সরস্বতী পূজা করা হয় তখন আমরা দেখি যে সরস্বতী পূজার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীদেবীরও পূজা করতে হয়, লক্ষ্মীদেবীরও পূজা করতে হয়। কেননা যেখানে বিদ্যা সেখানে শ্রী, সেই শ্রীদেবী পঞ্চপ্রদীপ হাতে দেবীকে বরণ করে নিচ্ছেন পঞ্চদীপ-পক্ষ্মী। তাঁর একটি ছোট্ট মূর্তি ঠিক সরস্বতীর মূর্তির নীচে রয়েছে।

দেবীর আবির্ভাব হয়েছে। দেওয়ালে অসংখ্য প্রদীপ। এই সমস্ত প্রদীপ হচ্ছে জ্ঞানদীপ। জ্ঞান-দীপগুলি জ্বলে উঠেছে দেবীর আবির্ভাবে। এই জ্ঞানদীপগুলি জ্বলে উঠার মধ্যে সমস্ত ছাত্রভক্তের হৃদয়ে জ্ঞানের দীপ জ্বলে উঠার সূচনা হচ্ছে। এর ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি লেখা রয়েছে দরজার ঠিক সামনে। লেখাটি হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের। সেই লেখার ভিতরে রয়েছেন এই সরস্বতী দেবী। এই সরস্বতী দেবীর স্বরূপ কি? তিনি হচ্ছেন বাইরের বস্তু—থাকেন তিনি বৈকুণ্ঠে—স্বর্গে। তিনি এসেছেন আমাদের ভিতরে, কিন্তু তাঁর সত্যকার স্বরূপ কি? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ''Education is the manifestation of the perfection already in man'' মানুষের ভিতরে পূর্ব থেকেই যে পূর্ণতা রয়েছে সেই পূর্ণতার প্রকাশই হচ্ছে বিদ্যা। সেই পূর্ণতা মানুষের ভিতরেই রয়েছে। কাজেই দেবী সরস্বতী বাইরের দেবী নন তিনি অন্তরে রয়েছেন; তাঁকে প্রস্ফুটিত করে তুলতে হবে।

এর পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রবেশ করবার দরজার দুপাশে দুটি ছাত্র দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি ছাত্রের হাতে একটি পদ্ম রয়েছে। পদ্ম সূচিত করছে শ্রদ্ধাকে। শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্—জ্ঞান লাভ করতে হলে শ্রদ্ধার প্রয়োজন। আর একটি ছাত্রের হাতে রয়েছে দীপ—বিচার-অগ্রবুদ্ধি। ছাত্রদের ঠিক নীচে রয়েছে দুটি সূর্যমুখী ফুল। সূর্যমুখী ফুল সূচিত করছে একাগ্রতা, যে একাগ্রতা ছাড়া কোন বিদ্যার অভ্যাস হতে পারে না। স্বামীজী বলেছেন বিদ্যাভ্যাস করতে হলে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন concentration-এর। Concentration বা একাগ্রতা ছাড়া কোন বিদ্যাভ্যাস হতে পারে না। স্বামীজী বিদ্যাভ্যাসের জন্য যে উপকরণের প্রয়োজন বলেছেন, তাই এখানে দেখানো হচ্ছে। শ্রদ্ধা চাই, আত্মবিশ্বাস চাই, আর চাই ধীশক্তি। তখনই পূর্ণত্ব প্রাপ্তি ঘটবে। তাই সিঁড়ির দু পাশে রয়েছে দুটি পূর্ণকুম্ভ। পূর্ণকুম্ভ এই পূর্ণত্ব সূচিত করছে।

তারপরে সিঁড়ির উপরে সুন্দর আলপনা দেওয়া রয়েছে। দেবী আসছেন আলপনার উপর দিয়ে। দেবীর

আসার স্থান করে দেওয়া রয়েছে, তাঁর মন্দিরে বসার স্থান করে দেওয়া হয়েছে এবং তারপর মন্দিরের সমস্ত চত্বর জুড়ে নানারকমের ফুল লতাপাতার মেলা। দেবী এসেছেন, দেবীর মণ্ডপকে সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং সেই সুসজ্জিত মণ্ডপের ভিতর দেবীর অধিষ্ঠান ঘটেছে। এই দেবীর নাম কি? ইনি হচ্ছেন দেবী সরস্বতী, দেবী সারদা। সেই জন্যই এই বিদ্যালয় গৃহে, যেটি উচ্চতর মাধ্যমিক ক্লাসের বিদ্যালয় গৃহ—এই গৃহের ভিতরে হয়েছে দেবী সারদার অধিষ্ঠান। এই জন্য এই গৃহের নাম হচ্ছে সারদা মন্দির! ঠিক যেখানে দেবী সারদা, দেবী সরস্বতীর মূর্তি রয়েছে তার ঠিক ভিতর দিকে তারই পিছনে একটি ছবি রয়েছে; সেই ছবিটি আঁকা শ্রী সুনীল পালের। সেটি হচ্ছে দেবী মা সারদার। শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেছেন, ''ও সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে।'' কাজেই বাইরের দিক্ থেকে দেখতে গেলে তিনি হচ্ছেন সারদামণি। সারদাদেবীর মন্দির হচ্ছে এই সারদা গৃহ, এই সারদা মন্দির। তিনি এই সারদা মূর্তিতে সারদা মন্দিরের ভিতরে বিরাজমান।

বিদ্যালয়ের যে গৃহ সারদা মন্দির, তার সামনে একটি ছোট পুকুর রয়েছে। আমরা জানি উত্তর দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে মন্দিরের সামনে একটি পুকুর থাকে। সেটিকে বলা হয় সেই দেবতার পুকুর। এটিও হচ্ছে সরস্বতী সরোবর বা সারদা-সরোবর। এর ভেতরে ফুল রয়েছে, কমল পুষ্প। শ্বেত কমল প্রচুর ভাবে ফুটে ওঠে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এবং এই সরস্বতী সরোবর—এই সারদা মন্দির তার সঙ্গে সংযুক্ত।

মন্দিরের সামনে রয়েছে একটি স্তম্ভ। এই স্তম্ভ একটু এগিয়ে রয়েছে। স্তম্ভের মাথায় রয়েছে দুটি অগ্নিশিখা আর মাঝখানে কমল। এর দ্বারা সুচিত হচ্ছে এই মন্দির জ্ঞানের মন্দির এবং এই মন্দির শ্রদ্ধা ভক্তির মন্দির। স্তম্ভ যেখানে রয়েছে সে স্থানটিকে বলা হয় স্বদেশবেদী। স্বদেশ বেদী বলার অর্থ হচ্ছে—আমাদের এই যে বিদ্যাপীঠ—এ বিদ্যাপীঠ দেশের ভিতরে প্রতিষ্ঠিত—যে স্বদেশ পঞ্চভূতাত্মক। সেজন্য স্বদেশবেদীর নীচে বৌদ্ধ যে Symbol, চতুঃষ্কোণ Symbol, যেটি পৃথিবীর সুচক, সেই Symbol, সেই প্রতীক দেখানো রয়েছে। তার ওপর রয়েছে অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এগুলির Symbol এবং এর উপরে স্বদেশবেদীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এবং এর উপরে আমাদের স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা যাতে বৃদ্ধি পায় তার জন্য দেওয়া হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের সেই বাণী, ''ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ'', দেওয়া হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের বাণী যাতে তিনি এই দেশকে বন্দনা করেছেন বন্দেমাতরম্ বলে, দেওয়া হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী যাতে তিনি বলেছেন, ''হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।'' আরও দেওয়া হয়েছে বিষ্ণু পুরাণের সেই বাণী যাতে বলা হয়েছে দেবতারা পর্যন্ত তাঁদের দেবত্ব ত্যাগ করে এই ভারত ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন, কারণ এই ভারত ভূখণ্ড জন্ম-জন্ম স্বর্গ এবং তারপর মুক্তি—এই দুটি এনে দেয়। ''গায়ন্তি দেবাঃ কিলগীতকানি ধন্যাস্তু তে ভারতভূমি ভাগে। স্বর্গাপবগাস্পদমার্গভূতে ভবান্তি ভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ।'' এই হচ্ছে বিষ্ণু-পুরাণের বাণী। এই স্বদেশবেদীর উপরে যে স্তম্ভ রয়েছে তা জ্ঞান-স্তম্ভ। যখন আমাদের স্বাধীনতা দিবস বা অন্য কোন দিবস উদ্‌যাপিত হয় তখন সেই জ্ঞান-স্তম্ভের উপরের দিকটা খুলে নিয়ে সেখানে কোন পতাকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়—বিদ্যাপীঠের বা জাতীয় পতাকা। তখন তার সামনে আমাদের ছাত্ররা কুচ্‌কাওয়াজ দেখাতে পারে। এই গেল বাইরের যে বিদ্যাপীঠ বা তার আঙ্গিকের কথা।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজীর প্রদত্ত একটি ভাষণের অংশ। ১৯৮২ সালের বিদ্যাপীঠের রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুভেনির পৃষ্ঠা পি ৪৭-৫০ থেকে পুনর্মুদ্রণ করা হল।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ এক ঘনীভূত প্রেমমূর্তি

স্বামী বিশ্বনাথানন্দ

স্বামীজী বলছেন ঃ "আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না না—আমি সাধুও নই। আমি গরীব—গরীবদের আমি ভালবাসি।... কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটি নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে?... তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরীবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়।... তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বলো?... এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাবো, তাদের জন্য কাজ করো, তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রার্থনা করো—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন।"

নরেন্দ্রনাথের সহপাঠী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের যুবক নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মন্তব্য : ''বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান যুবক, মুক্তস্বভাব, বেপরোয়া, মিশুক, সামাজিক সম্মেলনের প্রাণস্বরূপ এবং মধুকণ্ঠ গায়ক, অসাধারণ বাক্-নিপূণ, যদিও কথাগুলি অনেক সময়েই ব্যঙ্গপূর্ণ ও তিক্ত; পৃথিবীর ভন্ডামি ও জুয়াচুরিকে তীক্ষ্ণস্বর সহাস্য বাক্যে অবিরত বিদ্ধ করেন, মনে হয় অবজ্ঞার উচ্চাসনে আসীন তিনি, কিন্তু সেটা ছদ্মবেশ, তার দ্বারা আবৃত করে রাখেন কোমলতম হৃদয়কে।" 'হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক' যুগন্ধর পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ—প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় তাঁর অটুট বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন, দরিদ্র মানুষ যে দুঃখ পাচ্ছে—তা আমাদের মুক্তির জন্য; সাধারণ মানুষ ঐ রোগী, পাগল, পাপীদের সেবা করে ভববন্ধন ছেদন করবে, লাভ করবে অনাবিল আনন্দ ও শান্তি।

নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন মুক্তহস্ত দাতা, দূরসম্পর্কের অনেক আত্মীয় তাঁর বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করত। আপদ-বিপদে অকাতরে মানুষকে সাহায্য করতেন বলে তিনি 'দাতা বিশ্বনাথ' নামে পরিচিত ছিলেন। স্বামীজীর ভাই মহেন্দ্রনাথ বলতেন, গরিব-দুঃখীকে দান করা তাঁর পিতৃদেবের একটা 'ব্যামো'র মতো ছিল। আর নরেন্দ্রনাথের মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী ছিলেন মিতভাষিণী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, উচ্চমনা ও কোমলহৃদয়া; দয়া, দান ছিল তাঁর অঙ্গের ভূষণ। এমন পিতা-মাতার সন্তান নরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই সাধু বা দরিদ্র মানুষের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করতেন; সাধু, ভিখারিকে কিছু দিতে পারলে শিশু-হৃদয়টি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। ছয় বছরে বালকের সাহস ও হৃদয়বত্তার পরিচয় আমরা পাই যখন নিজের জীবনের পরোয়া না করে সঙ্গী বালককে গাড়ি-চাপা পড়া থেকে রক্ষা করেন। এ তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত স্বভাব। পরোপকার পরম ধর্ম, পরের জন্য এতটুকু ভাবলে ক্রমে হৃদয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়—এ ছিল তাঁর অটল বিশ্বাস। তিনি চাইতেন, মানুষের হৃদয়ের বিস্তার হোক। আত্মসুখ সুখ নয়—বরং আত্মসুখ বলি দিয়ে মুক্ত হওয়ার, বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান মানুষকে গভীর বিস্ময়ে অভিভূত করে। আবাল্য নরেন্দ্রনাথের জীবনে সেবাধর্ম প্রকট দেখা যায়। দুঃখ, কষ্টে, দারিদ্র্যে, রোগে তিনি নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন। বাল্যে কেল্লা দেখতে যাওয়ার সময় সমবয়স্ক একজন পথপার্শ্বে অবসন্ন হয়ে বসে পড়লে নরেন্দ্রনাথ তাকে সেবা-শুশ্রূষা করে বাড়ি পৌঁছে দেন; কেল্লা দেখা আর হয় না! অন্য সঙ্গীরা ভাবে, ব্যাপার সামান্যমাত্র।

স্বামীজী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, মহৎ কাজের জন্য যেসব গুণের প্রয়োজন, তার প্রথমটাই হল হৃদয়বত্তা।

তা না হলে আশৈশব সবার প্রতি তাঁর এই আত্মীয়তাবোধ কেমন করে সম্ভব? বাল্যে আখড়ায় শরীরচর্চাকালে একদিন ট্রাপিজ খাটানোর সময় এক ইংরেজ নাবিক বালকদের সাহায্যের জন্য এসে একটি খুঁটির আঘাতে অজ্ঞান হয়ে যায়। এই ঘটনায় ভয় পেয়ে সবাই সত্বর স্থানত্যাগ করে, শুধু নরেন ও তার দু-একজন বন্ধু ছাড়া। নরেন সেবা-শুশ্রূষা করে, ডাক্তার ডেকে, চাঁদা তুলে চিকিৎসা করিয়ে ইংরেজ নাবিকটিকে বিদায় দেন।

সাধু-সন্ন্যাসীর পর্যটনস্পৃহা মজ্জাগত—'রমতা সাধু বহতা পানি।' সম্ভবত ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্বামীজী কাশী যান, সঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দ ও ফকির। এই তীর্থদর্শনকালে স্বামীজী ভারতাত্মার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েছিলেন। এই সময় কাশীতে স্বনামধন্য ত্রৈলঙ্গস্বামী ও ভারতবিশ্রুত বিদ্বান সাধু স্বামী ভাস্করানন্দকে দর্শন করেন। শীঘ্রই তাঁর মনে ধর্মপ্রচারের সংকল্প আসে এবং দুঃস্থ ও নিপীড়িতদের দুঃখমোচনের ঐকান্তিক অভিলাষ জাগে। কাশী থেকে অযোধ্যা, আগ্রা হয়ে বৃন্দাবন। বৃন্দাবন পৌঁছানোর মাইল দু-এক আগে একজনের ধূমপান করা দেখে তাঁরও ধূমপানের ইচ্ছা জাগে। ধূমপায়ীর নিকট ছিলিম চাইলে সে সঙ্কুচিতভাবে জানায়, সে ভাঙ্গি অর্থাৎ মেথর — নীচজাতি। স্বামীজীর মনে জাত্যভিমান ও আভিজাত্যের সংস্কার জেগে ওঠে। কিন্তু কিছু দূর যেতে না যেতে তাঁর সন্ন্যাসজীবনের আদর্শের কথা মনে পড়ে, প্রকাশিত হয় তাঁর উদার হৃদয়বত্তা। তিনি দেখেন, সে ভাঙ্গি নয়, সে একজন মানুষ এই 'মানুষ'ই তাঁর সারাজীবনের, সর্বকর্মের ধ্যানের বস্তু, পূজা-স্তুতির দেববিগ্রহ; সবাই ভগবানের সন্তান।

বস্তুত, হৃদয়বত্তা না থাকলে যথার্থ সেবা করা যায় না। স্বামীজী একদিন নিরঞ্জনানন্দজীর সঙ্গে দেওঘরে ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। সেখানে তিনি প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি বেশ অসুস্থ ছিলেন, হাঁপানিতে কষ্ট পাচ্ছিলেন। একদিন ভ্রমণে বের হয়ে তিনি দেখলেন, রাস্তার ধারে এক দুস্থ মানুষ আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে, শীতে কাঁপছে, পরিধানে ছিন্নবস্ত্র। এই মানুষটির সেবার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব, অথচ তিনিই রয়েছেন পরের বাড়িতে অতিথি হয়ে। গুরুভ্রাতার সাহায্যে তিনি রোগীকে প্রিয়নাথবাবুর বাড়ি নিয়ে গিয়ে, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়ে আগুনের সেঁক দিতে আরম্ভ করলেন। মানুষটি ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করল। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে স্বামী গম্ভীরানন্দ লিখেছেন ঃ ''প্রিয়নাথবাবু ইহাতে বিরক্ত হওয়া তো দূরের কথা, বরং স্বামী বিবেকানন্দ শুধু বক্তৃতা দেন না, মুখে যাহা বলেন, কার্যেও তাহা করেন, তাঁহার বুদ্ধি ও হৃদয় সমভাবে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এবং অতি মূর্খ, দরিদ্র ইত্যাদির মধ্যে তিনি সত্যই নারায়ণকে দর্শন করিয়া থাকেন—এই চাক্ষুষ প্রমাণ পাইয়া আহ্লাদিত হইলেন।''

দেওঘর থেকে ফিরে এসে স্বামীজী প্রচারের দিকে দৃষ্টি দিলেন। স্বামী বিরজানন্দ ও স্বামী প্রকাশানন্দকে পূর্ববঙ্গের ঢাকা শহরে প্রেরণের কথা ভাবলেন। প্রথমজন সবিনয়ে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করলে ও তপস্যার অনুমতি চাইলে স্বামীজী গর্জে বললেন ঃ ''তুই যদি আত্মমুক্তির জন্য সাধনা করতে চাস তো তুই জাহান্নামে যাবি। পরমার্থ লাভ করতে হলে পরের মুক্তির চেষ্টা কর, আত্মমুক্তির লালসায় জলাঞ্জলি দে। ঐ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা।'' তারপর তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন ঃ ''বাবারা, কাজে লেগে যা, মনপ্রাণ দিয়ে কাজে লেগে যা! ঐ হচ্ছে কাজের কথা; ফলের দিকে দৃষ্টি দিবি না। যদি অপরের কল্যাণসাধন করতে গিয়ে নরকগামী হতে হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? স্বার্থপরতা নিয়ে নিজের স্বর্গলাভ করার চেয়ে এ ঢের ভাল।'' স্বামীজীর জীবনে নিঃস্বার্থপরতার চরম প্রকাশ ও হৃদয়বত্তার পরম বিকাশ বহুবার দেখা গেছে।

হিমালয় ভ্রমণকালে—আলমোড়ার নিকটে একদিন ক্ষুধায় ও পথশ্রমে ক্লান্ত স্বামীজী অবসন্ন হয়ে পড়লেন, সঙ্গে ছিলেন স্বামী অখন্ডানন্দ। চলচ্ছক্তিহীন অবস্থায় তিনি একটি শিলাখন্ডের উপর শুয়ে পড়লেন। কাছে ছিল মুসলমানদের গোরস্থান, আর এক ফকিরের পর্ণকুটির। স্বামীজীর এই অবস্থা দেখে ফকির একফালি শশা স্বামীজীকে খেতে দিলেন, শশা খেয়ে স্বামীজী অনেকটা সুস্থবোধ করলেন। অনেকদিন পর আমেরিকা থেকে ফিরে বিশ্বজয়ী স্বামীজী আলমোড়ায় এক বক্তৃতাসভায় ঐ ফকিরকে উপস্থিত থাকতে দেখে কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাকে ডেকে সকলের কাছে এই বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন যে, একদা ইনিই তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন। ফকির অবশ্য স্বামীজীকে চিনতে পারেননি, কিন্তু স্বামীজী ফকিরের ক্ষুদ্র সেবাটুকু হৃদয়ে সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছিলেন এবং প্রতিদানস্বরূপ ফকিরকে কিছু অর্থও দিয়েছিলেন।

হিমালয় ভ্রমণকালেই তিনি একদিন এক শীতার্ত বৃদ্ধ সাধুকে দেখেন, যাঁর যথেষ্ট শীতবস্ত্র ছিল না। তাঁর কষ্ট নিবারণের জন্য স্বামীজী কম্বলখানি সাধুটির গায়ে জড়িয়ে দিলেন, নিজের কথা ভাবলেন না। বৃদ্ধ সাধু তুষ্ট হয়ে স্বামীজীকে আশীর্বাদ করেন ঃ ''নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন।'' একটি ঘটনার কথা স্বামীজী বলেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষকে। রাজস্থানের এক রেলস্টেশনে তিনি অপেক্ষা করছেন অন্যত্র যাওয়ার জন্য, কিন্তু কোন কারণে ট্রেনে উঠতে না পেরে স্টেশনেই তিনদিন থাকতে হল। এই সময় বহু লোক এসে তাঁর সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গ করতে লাগল, কিন্তু কেউই স্বামীজীর ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা ভাবল না। তৃতীয় রাত্রে এক দীন ব্যক্তি এসে বলল, স্বামীজী তিনদিন ধরে উপবাসী, এতে সে প্রাণে ব্যথা অনুভব করছে। স্বামীজীর মনে হল, স্বয়ং নারায়ণ বুঝি দীনবেশে তাঁর কাছে এসেছেন। তিনি বললেন ঃ ''তুমি আমায় কিছু খেতে দেবে?'' ব্যক্তিটি জানাল, তার মনের ইচ্ছা তাই, কিন্তু সে তো জাতে চামার। তার স্পর্শিত খাদ্য যদি সাধুকে দেওয়া হয় তাহলে এটি রাজ-অপরাধ হবে, এমনকি রাজ্য থেকে বিতাড়িতও করা হতে পারে। স্বামীজী সাহস যোগালেন; সে বাড়ি থেকে রুটি প্রস্তুত করে এনে স্বামীজীকে ভোজন করাল। স্বামীজী পরে বলেন ঃ ''সেসময় দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণপাত্রে সুধা এনে দিলেও তেমন তৃপ্তিকর হত কিনা সন্দেহ।'' ব্যক্তিগতভাবে স্বামীজী এইসব দরিদ্র কিন্তু উচ্চ চেতনাযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে মেশার সুযোগ পেয়েছিলেন—যারা পর্ণকুটিরে বাস করে আর তথাকথিত শিক্ষিত মানুষের কাছে চিরদিন ঘৃণ্য ও হীন বলে লাঞ্ছিত হয়। তাই পরবর্তী কালে স্বামীজীর মহান বাণী ঃ ''লক্ষ লক্ষ নরনারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ বর্মে সজ্জিত হইয়া দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধুক এবং মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক।''

স্বামীজী পরিব্রাজক জীবনে অনেক দুঃখ, কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন; আবার ঐ অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর হৃদয়ের সম্প্রসারণ ঘটেছে, জ্ঞানের ভান্ডার পূর্ণ হয়েছে। ''অনেক দিন এমন ঘটিয়াছে যে, কয়েক দিবস নিরম্বু উপবাসের পর কোনরূপে জীবনধারণোপযোগী দুটি সামান্য কিছু আহার করিয়া শরীরটা রাখিতে হইয়াছে। এই সময়েই তিনি এক মেথর-পরিবারের মধ্যে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলেন এবং এই অবহেলিত নীচজাতীয়দিগের হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন। সম্ভবত এই ঘটনা ও এইরূপ অন্যান্য কয়েকটি ঘটনায় তিনি উপেক্ষিত জাতিসমূহের মধ্যে মহত্ত্বের অঙ্কুর লক্ষ্য করিয়া তাহাদের উন্নতি-বিধানের জন্য এত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন।'' স্বামীজীর এখানেই মহত্ত্ব; বাস্তবিক তিনি হৃদিবান নিঃস্বার্থ প্রেমিক। স্বামীজী

বলছেন ঃ ''আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না না—আমি সাধুও নই। আমি গরীব—গরীবদের আমি ভালবাসি।... কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটি নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে?... তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরীবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়।... তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বলো?... এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাবো, তাদের জন্য কাজ করো, তাদের জন্য সদাসর্বদা প্রার্থনা করো—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন।''

স্বামীজী একদিন দিগন্ত-প্রসারিত এক গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটছেন আর ভাবছেন, অনাহার আর তপস্যায় শরীর গেলে ক্ষতি কী! এদিকে ক্ষুধার জ্বালা—একমুষ্টি অন্নও জুটল না। একটা গভীর আধ্যাত্মিক অসন্তোষ—ভগবানলাভ যদি না হল তবে এই শরীর রেখে লাভ কী! ক্লান্তদেহে এক বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে পড়লেন স্বামীজী। একটু পরে দেখলেন, একটি বাঘ তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। এই বুঝি লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বামীজী তখন ভাবছেন ঃ ''বাঃ, বেশ হয়েছে! আমরা দুজনেই তো ক্ষুধিত। এদিকে আমার এদেহে তো জ্ঞান লাভ হলো না এবং এর দ্বারা জগতের কোন কল্যাণ হওয়ারও তো সম্ভাবনা দেখছি না; অতএব এর দ্বারা যদি অন্তত এই ক্ষুধিত পশুটির খিদে মিটে তো মন্দ কি?' তিনি বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া... শুইয়া রহিলেন এবং অপেক্ষা করিতে লাগিলেন,... কিয়ৎক্ষণ পরে...ব্যাঘ্রটি...চলিয়া গেল। স্বামীজী তখনও ভাবিতে লাগিলেন, হয়তো সে ফিরিবে।... সে রাত্রি তিনি ভগবচ্চিন্তায় ঐ বৃক্ষতলেই কাটাইলেন।'' বুদ্ধহৃদয় বিবেকানন্দ নিজের দেহ দিয়ে এক পশুর ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য বৃক্ষতলে নিশিযাপন করলেন। ভগবান বুদ্ধও একটি ছাগশিশুর প্রাণরক্ষার বিনিময়ে আত্মবলি দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র যে মহৎ বাণী গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্বামীজী লাভ করেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করেছেন। এই হলেন প্রেমিক বিবেকানন্দ—যোগী বিবেকানন্দ। গীতা বলছেন ঃ ''আত্মৌপম্যেন সর্বত্রং সমং পশ্যতি যোহর্জুন।/সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥'' (৬। ৩২)—হে অর্জুন, যিনি সকল ভূতের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখ বলে অনুভব করেন; আমার মতে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। স্বামীজীর জীবনের একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করেছেন স্বামী গম্ভীরানন্দ তাঁর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে ঃ ''খেতড়ির একটি ঘটনা বিশেষ মর্মস্পর্শী; উহাতে যেন স্বামীজীর একটা নূতন দিকে চক্ষু খুলিয়া গেল। এক সন্ধ্যায় এক নর্তকী গান গাহিয়া রাজার চিত্তবিনোদন করিতেছিল। সঙ্গীতের আরম্ভকালে স্বামীজী আপনার ঘরে ছিলেন; রাজা তাঁহাকে সঙ্গীতের আসরে আসিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। স্বামীজী কিন্তু বলিয়া পাঠাইলেন, সন্ন্যাসীর পক্ষে ঐ আসরে উপস্থিত থাকা অনুচিত। গায়িকা ইহা শুনিয়া খুবই মর্মাহত হইল এবং স্বামীজীর কথায় প্রত্যুত্তরচ্ছলেই যেন গান ধরিল—

'হমারে প্রভু অবগুণ চিত না ধরো,
সমদরশী হ্যায় নাম তিহারো, অব মোহি পার করো॥'

সঙ্গীতটি স্বামীজীর হৃদয় আকুল করিয়া তুলিল; সঙ্গীতের মধ্য দিয়া বাইজী যেন তাঁহাকে এক অবহেলিত সত্য স্মরণ করাইয়া দিতেছিল—জগতে ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', সর্ববস্তুর পশ্চাতে এক অভিন্ন ব্রহ্মসত্তা বিরাজিত, এমনকি ঘৃণিতা নারীতেও তিনি বিদ্যমান। অতএব স্বামীজী আসরে আসিয়া সকলের মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি পরে বলিয়াছিলেন, 'গানটি শুনে আমার মনে হলো,

এই কি আমার সন্ন্যাস? আমি সন্ন্যাসী, অথচ আমার ও এই নারীর মধ্যে আমার ভেদজ্ঞান রয়ে গেছে; সে ঘটনাতে আমার চোখ খুলে গেল। সর্ববস্তু সেই একই সত্তার অভিব্যক্তি জেনে আর কাউকে নিন্দা করার জো ছিল না।'

ঘটনাপ্রবাহ স্বামীজীকে নতুন নতুন জীবনের স্বাদ দিয়েছে। স্থান কায়রো—শ্রীমতী ম্যাকলাউড-সহ কয়েকজনের সঙ্গে গল্প করতে করতে তিনি এমন একটা রাস্তায় ভুলক্রমে এসে গেছেন যা নোংরা, আবর্জনাপূর্ণ আর অর্ধাবৃতা রমণীরা দ্বারপ্রান্তে উপবিষ্টা। সহসা ঐ মহিলাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন হাসতে হাসতে স্বামীজীকে আহ্বান করলে স্বামীজী একাকী রমণীদের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি বলতে লাগলেন ঃ ''আহা বাছারা! আহা অভাগিনীরা! ওরা তাদের সৌন্দর্যের পায়ে নিজেদের দেবীত্বকে বলি দিয়েছে! এখন দেখ দিকি তাদের অবস্থা!'' এর পরের ঘটনা এইরকম ঃ ''তিনি অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন; নারীগুলি নীরব ও লজ্জিতা হইল। একজন সম্মুখে ঝুঁকিয়া স্বামীজীর আবরণপ্রান্ত চুম্বন করিল এবং স্পেনিশ ভাষায় ভাঙা ভাঙা স্বরে মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'ইনি ঈশ্বরজানিত মানুষ', 'ইনি ঈশ্বরজানিত মানুষ', 'ইনি ভগবানের লোক'। আর একটি নারী অকস্মাৎ লজ্জা ও ভয়ে অভিভূতা হইয়া স্বহস্তে বদন আবৃত করিল—যেন ঐ পবিত্র নয়নদ্বয় হইতে সে তাহার ক্রমসঙ্কুচিত আত্মাকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়।'' ভাবতে অবাক লাগে, এদের জন্য স্বামীজী নীরবে অশ্রুপাত করেছেন! প্রথমবার আমেরিকা যাওয়ার আগে স্বামীজী স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেছিলেন ঃ ''হরিভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না।'' মুখে একটা গভীর বিষাদের ছায়া নিয়ে, কম্পিত কলেবরে তিনি নিজের হাত বুকের ওপর রেখে বললেন ঃ ''কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে!'' তাঁর কণ্ঠ ভাবাবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল, চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। পরবর্তীকালে এই কথাগুলি বলতে বলতে স্বামী তুরীয়ানন্দ বিহ্বল হয়ে পড়তেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ অশ্রুসিক্ত নয়নে নীরবে বসে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন ঃ ''স্বামীজী যখন ঐ কথাগুলি বলছিলেন, তখন আমার মনে কি খেলছিল বলতে পার? আমি ভাবছিলাম, 'বুদ্ধও কি ঠিক এমনি অনুভব করেননি, আর এমনি কথা বলেননি?... আমি যেন ঠিক দেখছিলাম যে, জগতের দুঃখে স্বামীজীর হৃদয় তোলপাড় হচ্ছে—তাঁর হৃদয়টা যেন তখন একটা প্রকাণ্ড কড়াই, যাতে জগতের সমস্ত দুঃখকে রেঁধে একটা প্রতিষেধক মলম তৈরি করা হচ্ছিল।''

স্বামীজীর সঙ্গে শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর শাস্ত্রালোচনা হচ্ছে। স্থান—বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ি, এখন যা 'বলরাম মন্দির' নামে পরিচিত। এমন সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ এসে উপস্থিত হলেন ও স্বামীজীর অপূর্ব শাস্ত্রব্যাখ্যা নিবিষ্টমনে শুনতে লাগলেন। এরপর গিরিশবাবু ও স্বামীজীর মধ্যে কিছু কথাবার্তা হল। সহসা গিরিশবাবু স্বামীজীকে সম্বোধন করে বললেন ঃ ''হাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ির গিন্নী, এককালে যার বাড়িতে রোজ পঞ্চাশখানি পাতা পড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায়নি; ঐ অমুকের বাড়ির কুলস্ত্রীকে গুন্ডাগুলো অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে; ঐ অমুকের বাড়িতে ভ্রূণহত্যা হয়েছে, অমুক জোচ্চুরি করে বিধবার সর্বস্ব হরণ করেছে—এ-সকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি?'' গিরিশবাবু এইভাবে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি একের

পর এক দেখাতে আরম্ভ করলে স্বামীজী নির্বাক হয়ে রইলেন। জগতের দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর চোখে জল এল। তিনি মনের ভাব গোপন রাখতে উঠে চলে গেলেন। গিরিশবাবু শিষ্যকে লক্ষ করে বললেন ঃ ''দেখলি বাঙাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদবেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল।''

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আবার আলোচনা আরম্ভ হল। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী সদানন্দ সেখানে উপস্থিত হলেন। স্বামীজী তাঁকে দেখে বললেন ঃ ''ওরে এই জি সি-র মুখে দেশের দুর্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে। দেশের জন্য কিছু করতে পারিস?''

সদানন্দ—মহারাজ! জো হুকুম—বান্দা তৈয়ার হ্যায়।

স্বামীজী—প্রথমে ছোটখাট scale-এ (হারে) একটা relief centre (সেবাশ্রম) খোল, যাতে গরীব-দুঃখীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে, যাদের কেউ দেখবার নেই—এমন অসহায় লোকদের জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সেবা করা হবে। বুঝলি?

সদানন্দ—জো হুকুম মহারাজ।

স্বামীজী—জীবসেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। সেবাধর্মের ঠিক ঠিক অনুষ্ঠান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—'মুক্তিঃ করফলায়তে'।

এইবার গিরিশবাবুকে সম্বোধন করে স্বামীজী বললেন ঃ ''দেখ গিরিশবাবু, মনে হয়—এই জগতের দুঃখ দূর করতে আমায় যদি হাজারো জন্ম নিতে হয় তাও নেব। তাতে যদি কারও এতটুকু দুঃখ দূর হয় তো তা করব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে যেতে হবে। কেন বল দেখি—এমন ভাব ওঠে?

গিরিশবাবু—তা না হলে আর তিনি (ঠাকুর) তোমায় সকলের চেয়ে বড় আধার বলতেন!''

মানুষের জন্য স্বামীজীর হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল এই বেদনাবোধ। স্বদেশে, বিদেশে—যেখানেই থেকেছেন তিনি ভারতের নিরন্ন, পীড়িত মানুষের কথা ভেবেছেন—এ যেন তাঁর নিজস্ব দায়!

কলকাতায় যখন প্লেগ দেখা দিয়েছে, স্বামীজী তখন দার্জিলিঙে। প্লেগের খবর শুনে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। সেবাকাজ আরম্ভ হল। জায়গায় জায়গায় প্লেগ-আক্রান্তদের সেবাকেন্দ্র স্থাপন করলেন। টাকা আসবে কোথা থেকে—এই প্রশ্নের উত্তরে তৎক্ষণাৎ স্বামীজীর জবাব ঃ ''দরকার হলে নতুন মঠের জমি—জায়গা সব বিক্রি করব। আমরা ফকির; মুষ্টিভিক্ষা করে গাছতলায় শুয়ে দিন কাটাতে পারি। যদি জায়গা-জমি বিক্রি করলে হাজার হাজার লোকের প্রাণ বাঁচাতে পারা যায় তো কিসের জায়গা আর কিসের জমি?'' প্রয়োজনীয় অর্থ অন্য সূত্রে এসে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত অবশ্য জমি বিক্রি করতে হয়নি। কিন্তু কী হৃদয়বান ছিলেন স্বামীজী তার পরিচয় আমরা তাঁর এই উক্তিতে পাই। বেলুড় মঠ স্থাপনের জন্য তিনি কী পরিশ্রমই না করেছেন, কিন্তু মানুষের দুর্দশা যেই দেখলেন, অমনি সেই মঠের জমি বিক্রির কথা বলতে একটুও বুকে বাজল না তাঁর!

আর্তের ত্রাতা বিবেকানন্দের অপরের জন্য এই বেদনাবোধই তাঁকে দেবত্বে উত্তরণ করেছে। বিদেশ—প্রত্যাগত স্বামীজী রয়েছেন বলরাম মন্দিরে, স্বামী তুরীয়ানন্দ এসেছেন দেখা করতে। তুরীয়ানন্দজী লক্ষ করলেন, গভীর

চিন্তামগ্ন হয়ে স্বামীজী বারান্দায় পায়চারি করছেন, কেউ যে সামনে দাঁড়িয়ে তা তিনি টেরই পেলেন না। তুরীয়ানন্দজী শুনছেন, স্বামীজী গুনগুন করে বিষাদমাখা কণ্ঠে একখানি মীরার ভজন গাইছেন—''দরদ না জানে কোঈ/ঘায়ল কী খত ঘায়ল জানে, আওর না জানে কোঈ''—আমার ব্যথা কেউ জানে না, যে আঘাত পেয়েছে সে-ই বোঝে আঘাতের যন্ত্রণা। আপন মনে গাইছেন তিনি, অশ্রুভারাক্রান্ত তাঁর আঁখিপল্লব; বিষাদী সুরমূর্ছনায় এক বেদনাহত পরিবেশ। তুরীয়ানন্দজী গান শুনে উপলব্ধি করলেন, জগতের মানুষের দুঃখের কথা ভেবে তাঁর এই নীরবে নিভৃতে অশ্রুবিসর্জন।

ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় স্বামীজী দার্জিলিঙে এলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, গুডউইন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও মাদ্রাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ভক্তসহ। স্বামীজী এম. এন. ব্যানার্জির অতিথি হয়ে আছেন। একদিন সকালে পাহাড়ি পথে ভ্রমণের সময় তিনি দেখলেন, এক ভুটিয়া স্ত্রীলোক পিঠে গুরুভার নিয়ে খুব কষ্ট করে পথ চলছে। হঠাৎ স্ত্রীলোকটি হোঁচট খেয়ে বোঝা সমেত পড়ে গেল, তার পাঁজরে আঘাতও লাগল খুব। দূর থেকে স্বামীজী ঘটনাটি দেখলেন, আর আশ্চর্য! স্ত্রীলোকটির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও নিজের পাঁজরে আঘাত অনুভব করলেন—এমন আঘাত যে, তিনি চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পড়লেন। বললেন ঃ ''বড্ড ব্যথা লেগেছে—আর হাঁটতে পারছি না।'' সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করল ঃ ''কোথায় ব্যথা লেগেছে স্বামীজী'' নিজের ব্যথার জায়গা হাত দিয়ে দেখিয়ে বললেন ঃ ''এইখানে—দেখিসনি ঐ স্ত্রীলোকটির লেগেছে।'' মনে পড়ে, দক্ষিণেশ্বরে দুই মাঝির বিবাদ ও একজনের পিঠে অন্যের চপেটাঘাতে শ্রীরামকৃষ্ণের পিঠেও দাগ পড়েছিল, তিনিও ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছিলেন।

বিজ্ঞানানন্দজীর স্মৃতিকথা ঃ ''একদিন বেলুড় মঠে রাতে দুটোর সময় স্বামীজীর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। বারান্দায় পায়চারি করছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি স্বামীজী, আপনার ঘুম হচ্ছে না?' স্বামীজী বললেন, 'দেখ পেসন, আমি বেশ ঘুমিয়েছিলাম। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা লাগল আর আমার ঘুম ভেঙে গেল। আমার মনে হয়, কোন জায়গায় একটা দুর্ঘটনা হয়েছে এবং অনেক লোক তাতে দুঃখকষ্ট পেয়েছে'। স্বামীজীর মনে এই কথা শুনে আমি ভাবলাম, কোথায় কি দুর্ঘটনা হলো আর স্বামীজীর এখানে ঘুম ভেঙে গেল—এটা কি সম্ভব! এরকম চিন্তা করে মনে মনে একটু হাসলাম। কিন্তু আশ্চর্য! পরদিন সকালে খবরের কাগজে দেখি গত রাতে দুটোর সময় ফিজির কাছে একটি দ্বীপে অগ্ন্যুৎপাত হয়ে বহু লোক মারা গিয়েছে, বহু লোক নিরাশ্রয় হয়েছে, অবর্ণনীয় দুঃখের সম্মুখীন হয়েছে। খবরটি পড়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম সিস্‌মোগ্রাফের (পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ কম্পন পরিমাপের যন্ত্রের) চেয়েও স্বামীজীর Nervous System (স্নায়ুবিক গঠন) more responsive to human miseries (মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল)।''

স্বামীজীর এই অনুভূতির পিছনে ছিল নিপীড়িত মানবাত্মার জন্য তাঁর বেদনাবোধ। তাঁর হৃদয়ে ছিল অসীম ভালবাসা—বিশেষ করে দরিদ্র, মূর্খ, অন্ত্যজ ও পদদলিতদের জন্য; এদের যেকোন দুঃখ-কষ্ট স্বামীজীকে পাগল করে তুলত। এই পরদুখে কাতরতার অনুভূতি তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে; শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছায় ও আশীর্বাদে তাই তিনি হয়ে উঠেছিলেন 'বটবৃক্ষ'।

স্বামীজী ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ জুন দুর্ভিক্ষ-সেবানিরত স্বামী অখন্ডানন্দকে লিখলেন ঃ ''কর্ম, কর্ম, কর্ম—হম ঔর কুছ নহীঁ মাঙ্গতে হৈঁ।... হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হয়ে থাকে—মস্তিষ্ক নয়। পুঁথিপাতড়া, বিদ্যেসিদ্যে, যোগ

ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূলসমান—প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই তো পুজো—নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পুজো, আর যা-কিছু 'নেদং যদিদমুপাসতে'। মেরি হেলকে লেখা একখানি চিঠির কিয়দংশ উল্লেখ করলে বিবেকানন্দের হৃদয়ের বার্তা হৃদয় দিয়ে শোনা যায় ঃ ''নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান এবং একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি; আর সর্বোপরি আমার উপাস্য, পাপী-নারায়ণ, তাপী-নারায়ণ, সর্বজাতির দরিদ্র-নারায়ণ। এরাই বিশেষভাবে আমার আরাধ্য।''

পাশ্চাত্য থেকে ফেরার পর স্বামীজী যখন পুনরায় আলোয়ারে এলেন তখন আলোয়ারবাসীদের অনেকেই তাঁকে নিজেদের গৃহে সেবার আমন্ত্রণ জানাতে লাগালেন। কিন্তু একজনের আমন্ত্রণ তিনি পরম সমাদরে স্বীকার করলেন—সে এক বৃদ্ধার। আগে স্বামীজী তাঁর গৃহে ভিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, এবার তিনি বলে পাঠালেন সেই মোটা মোটা চাপাটির জন্য। বৃদ্ধা আনন্দে উৎফুল্লা। সযত্নে স্বামীজীকে পরিবেশন করতে করতে বৃদ্ধার আক্ষেপ—স্বামীজীকে ভাল করে খাওয়াতে খুব ইচ্ছা করে, কিন্তু দারিদ্র্য হেতু ভাল জিনিস কোথায় পাবেন! খেতে খেতে স্বামীজীর মন্তব্য ঃ ''দেখছ হে, বুড়িমার কি স্নেহ—আর চাপাটিগুলি কি সাত্ত্বিক!'' উল্লেখ্য, ঐ দিন একই সময়ে এক ধনী ব্যক্তিও স্বামীজীকে আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু তিনি দরিদ্র বৃদ্ধার বাড়িতে ভিক্ষাগ্রহণ করেন এবং ভিক্ষান্তে বৃদ্ধার অগোচরে গৃহস্বামীর হাতে একশো টাকার একখানি নোট দিয়ে আসেন। স্বামীজী বৃদ্ধার সন্তানতুল্য আর স্বামীজীর কাছে বৃদ্ধা মাতৃবৎ ও হৃদয়ের সম্পর্কে সম্পর্কিত। আর্থিক কৌলিন্য দিয়ে স্বামীজী মানুষকে দেখেননি—দেখেছেন অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে।

বেলুড় মঠের প্রথম দিকের কথা—সম্ভবত ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ। কতকগুলি সাঁওতাল স্ত্রী-পুরুষ মাটি কাটার কাজ করছে। এদের মধ্যে একজনের নাম 'কেষ্টা'। স্বামীজী তার সঙ্গে তাদের সুখ-দুঃখের আলোচনা করতেন, আবার রঙ্গরসও করতেন। কেষ্টা ভয় পেত—কাজের ক্ষতি হলে 'বুড়োবাবা' (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) বকাবকি করবেন। স্বামীজী একদিন সাঁওতালদের লুচি, তরকারি, মেঠাই, মন্ডা, দধি সহযোগে পেটভরে খাওয়ালেন। ভোজনে পরিতৃপ্ত কেষ্টা সানন্দে জিজ্ঞেস করল ঃ ''হাঁরে স্বামী বাপ, তোরা এমন জিনিসটা কোথা পেলি? হামরা এমনটা কখনো খাইনি।'' স্বামীজী পরিতোষপূর্বক খাইয়ে বললেন ঃ ''তোরা যে নারায়ণ, আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হল।'' পরে শিষ্য শরচ্চন্দ্রকে তিনি বললেন ঃ ''এদের দেখলুম যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরলচিত্ত, এমন অকপট, অকৃত্রিম ভালবাসা আর দেখিনি।'' মঠের সন্ন্যাসীদের বললেন ঃ ''দেখ্ এরা কেমন সরল! এদের কিছু দুঃখ দূর করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হলো? পরহিতায় সর্বস্ব অর্পণ—এরই নাম যথার্থ সন্ন্যাস। এদের ভাল জিনিস কখনো কিছু ভোগ হয়নি। ইচ্ছা হয়—মঠ-ফঠ সব বিক্রি করে দিই, এইসব গরিব-দুঃখী দরিদ্র-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা তো গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরতে পাচ্ছে না! আমরা কোন প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? ...আহা! দেশে গরিব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে!''

ঠাকুরের আশীর্বাদে স্বামীজী বুঝেছিলেন দারিদ্র্যের কী জালা! ক্ষুধিতের যন্ত্রণা সারাজীবন তিনি স্মরণে রেখেছেন আর দরিদ্র মানুষের দুঃখ দেখে তাঁর হৃদয় হাহাকার করে উঠেছে। বুদ্ধের হৃদয় নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। গুরুভ্রাতার মৃত্যুসংবাদে তিনি যখন শোকাকুল, তখন কাশীর বিখ্যাত পন্ডিত প্রমদাদাসবাবু বলেন, সন্ন্যাসীর শোক করা অনুচিত। তার উত্তরে স্বামীজীর বক্তব্য—সন্ন্যাস তো হৃদয়কে বিসর্জন দিতে বলে না; সন্ন্যাসীর হৃদয়

সাধারণ অপেক্ষা আরো কোমল হবে। যে-সন্ন্যাস হৃদয়কে পাষণ করতে শিক্ষা দেয়, সে—সন্ন্যাস তিনি গ্রাহ্য করেন না।

স্বামীজীর শিষ্য অচলানন্দজীর স্মৃতি ঃ ''স্বামীজীর ভালবাসা কেবল মানুষেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ছাগল গরু প্রভৃতি ইতর প্রাণীদের প্রতিও প্রসারিত হতো। জন্তু-জানোয়ারের প্রতি তাঁর ভালবাসার উদাহরণ দিচ্ছি।... মঠে ছাগল, গরু, কুকুর, হাঁস প্রভৃতি গৃহপালিত প্রাণী পোষা হতো। তাঁর একটি ছাগল ছিল—নাম মটরু। তিনি ছাগলটিকে এত ভালবাসতেন যে, ছাগলটি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত।... ছাগলটি এত ভাগ্যবান, যে, শেষ সময়ে স্বামীজীর কোলে মাথা রেখে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। তাঁর দুটি কুকুর ছিল—একটির নাম 'বাঘা', অপরটির নাম 'লায়ন'।... একবার বাঘাকে তিনি কি এক কারণে মঠ থেকে তাড়িয়ে ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, সে দু—দুবার খেয়া নৌকায় পুনরায় মঠে এসে উপস্থিত হলো। গরু, ভেড়া, হাঁস প্রভৃতির প্রতিও তাঁর ভালবাসা ঠিক এইরূপই ছিল। তিনি এগুলির সঙ্গে এমনভাবে খেলা করতেন যে, তারা তাঁর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেত।'' স্বামীজীর পোষা হরিণ ও সারসের কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁর চিনে হাঁসটির নাম ছিল 'যশোমতী', রাজহাঁসের নাম 'বোম্বেটে'। ছিল পাঁতিহাস, নানারকম পায়রা, বিড়াল ইত্যাদি।

বিবেকানন্দের মধ্যে ছিল বিশ্বাত্মবোধ। বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলির সমন্বয় হয়েছিল তাঁর মধ্যে। খ্যাতি ও গৌরবের শীর্ষে আসীন হয়েও তিনি ভুলে যাননি দেশের দরিদ্র, নিরন্ন, অবহেলিত জনসমষ্টিকে। এদের জন্য ছিল তাঁর সুগভীর বেদনাবোধ, আর এই বেদনাবোধের উৎস ছিল তাঁর বিশাল হৃদয়। হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব মেলবন্ধনে স্বামীজী কোটি কোটি মানুষের হৃদয়সিংহাসনে চির অধিষ্ঠিত।

অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার (শ্রীশ্রী মায়েরবাড়ী)

''The Poor, the down-trodden, the ignorant, let these be your God''

—Swami Vivekananda

সত্যের স্বরূপ ও সত্যস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ

একটি প্রচলিত কাহিনি—এক বৃদ্ধ রাজার কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পর কে রাজা হবে? কে হবে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী? এ নিয়ে তাঁর মনে ছিল প্রভূত দুশ্চিন্তা। একদিন রাজার প্রাসাদে এলেন তাঁর গুরুমাতা। রাজাকে চিন্তিত দেখে তিনি এর কারণ সহজেই অনুমান করলেন। তিনি বললেন—"তোমার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী নির্বাচন করা নিয়ে তুমি এত দুশ্চিন্তা ক'রো না। আমি তোমার রাজ্যের যোগ্য উত্তরসূরী বেছে দেব। তুমি কেবল একটি শুভ দিনে রাজ্যের কিশোরদের সকলকে নিমন্ত্রণ কর। বাকী ব্যবস্থা আমি করব।" গুরুমাতার কথা অনুসারে রাজা রাজ্যের কিশোরদের একটি সমাবেশ করলেন। সে সমাবেশে গুরুমাতা প্রতিটি কিশোরকে দুটি করে বীজ দান করলেন। তিনি তাদের বললেন তারা যেন এই বীজগুলিকে টবে বসিয়ে যত্ন করে চারাগাছে পরিণত করে। আরও বললেন একবছর পরে এগুলি গাছে পরিণত হলে পরে সেই গাছ এনে তাদের একটি নির্ধারিত দিনে রাজপ্রাসাদের প্রদর্শনীতে জমা দিতে হবে। সেই গাছ দেখে স্থির করা হবে কে রাজ্যের পরবর্তী রাজা হবে।

শর্ত অনুসারে এক বছর পর নিজ নিজ টবে গাছ তৈরী করে কিশোরের দল রাজপ্রাসাদে আয়োজিত প্রদর্শনীতে এসে সমবেত হল। রং-বেরঙের সবুজ সতেজ গাছে প্রদর্শনী ভরে উঠল। এই বিরাট সমাবেশে একটি কিশোর কেবল দুটি শূন্য টব নিয়ে এসে প্রদর্শনীর এক কোণে বসে রইল। তার দিকে কারও দৃষ্টি নেই। থাকলেও তা নিতান্তই করুণার দৃষ্টি। অপরদিকে উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে অন্য কিশোরদের আনা গাছের শোভা দেখতে লাগল। প্রতিটি গাছই নিজ নিজ মহিমায় অনন্য। গুরুমাতা এবার সব গাছ পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। বিরাট প্রদর্শনী সারাদিন ঘুরে ঘুরে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন কিন্তু কোন গাছই তাঁর পছন্দ হল না। অবশেষে তিনি দূর থেকে দেখলেন শূণ্য টব নিয়ে বসে থাকা সেই কিশোরটিকে। দ্রুতপদে তিনি এগিয়ে গেলেন তার দিকে। দেখলেন কিশোরটি তখনও নিষ্ঠার সঙ্গে বৃক্ষহীন টবটিকেই পরিচর্যা করে চলেছে। গুরু মা তার নিকট জানতে চাইলেন সে শূণ্য টব নিয়ে কী করছে। কিশোরটি বলল সে তার বীজদুটির যত্ন করছে। গুরুমাতা বললেন, একবছর ধরে যত্ন করেও যে বীজে গাছ হয়নি সে বীজ থেকে কি এখন আর গাছ হবার সম্ভাবনা আছে? কিশোরটি দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলল গুরুমাতার প্রদত্ত বীজ কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। এ বীজ নিশ্চয় সাধারণ বীজ নয়। এ বীজ অমোঘ। ধৈর্য ধরে তার পরিচর্যা করলে সে নিশ্চয় একদিন সুফল পাবে। গুরুমাতা কিশোরটিকে সস্নেহে সঙ্গে নিয়ে মঞ্চে এলেন। তিনি ঘোষণা করলেন এই কিশোরটিই হবে দেশের পরবর্তী রাজা। ঘোষণা শুনে সকলে হতবাক। এবারে আরও অবাক করে দিয়ে রানীমাতা তাঁর অদ্ভুত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের রহস্য সকলের সামনে উন্মোচন করলেন। তিনি বললেন একবছর আগে যে বীজগুলি তিনি রাজ্যের কিশোরদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন সে বীজগুলি সবই ছিল ভাজা বীজ। এর কোনটিরই অঙ্কুরোদ্গমের কোন সম্ভাবনা ছিল না। সবুজ-সতেজ উৎকৃষ্টমানের যত চারা গাছ টবে এনে প্রদর্শনীতে জমা দেওয়া হয়েছে সেগুলি সবই নিজেদের সংগৃহীত বীজের গাছ। অল্পদিন পরিচর্যার পর যখন কিশোরেরা দেখল বীজ অঙ্কুরিত

হচ্ছে না তখন তারা রাজ্য লাভের লোভে বাজার থেকে উৎকৃষ্টমানের বীজ সংগ্রহ করে তা গাছে পরিণত করেছে। এতে এদের মিথ্যাচার হয়েছে। অপরদিকে গাছবিহীন টব নিয়ে যে কিশোরটি আজ প্রদর্শনীতে এসে উপস্থিত হয়েছে সে সত্যে অবিচল থেকে গভীর ধৈর্য, নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সঙ্গে নিজ কাজ কর্তব্যবুদ্ধিতে সম্পন্ন করেছে। অতএব যে ব্যক্তি এই সত্য, ধৈর্য, নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের অধিকারী সে-ই রাজা হবার উপযুক্ত পাত্র। তার হাতেই এই সুবিশাল রাজ্য বেশি নিরাপদ ও রাজ্যবাসী তার নিকট থেকেই অধিক সুবিচার প্রত্যাশা করতে পারেন।

সত্য সম্বন্ধে ভারতীয় মহাকাব্যের কাহিনি ও শাস্ত্রীয় ঘোষণা :

উপরোক্ত কাহিনিটির মধ্য দিয়ে সত্যের মহিমা জ্ঞাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। যুগ যুগ ধরে সারা বিশ্ব জুড়ে কত শত ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী মহাপুরুষ সত্যকে অনুসরণ করার জন্য কত কাহিনি, উপকাহিনি ও নীতিকথার অবতারণা করে আসছেন। এর মধ্যে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাহিত্য অবশ্যই পুরোভাগে থাকার ন্যায্য দাবী রাখে। সুপ্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে : সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ ২/১/৩) অর্থাৎ ব্রহ্ম হল সত্য। তিনি জ্ঞান ও অনন্ত। মুণ্ডকোপনিষদে বলা হয়েছে ''সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা''—(মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩/১/৫) অর্থাৎ এই আত্মাকে সত্যরূপ তপস্যা সহায়ে লাভ করা যায়। তাতে আরও বলা হয়েছে ''সত্যমেব জয়তে নানৃতম্''—মুণ্ডকোপনিষদ্, —৩/১/৬—একমাত্র সত্যই জয়লাভ করে, মিথ্যা নয়। মহাভারতেও গান্ধারী বলছেন—যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। দুর্যোধন নিজের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও গান্ধারী যুদ্ধে তাকে জয়ী হবার আশীর্বাদ প্রদান করছেন না। এক্ষেত্রে মায়ের দ্বিধাহীন অথচ সুস্পষ্ট ঘোষণা ''যেখানে ধর্ম সেখানে জয়''। আর মহাভারত যুদ্ধে সকলেই জানতেন ধর্ম দুর্যোধনের পক্ষে নেই, ধর্ম আছে পাণ্ডবদের পক্ষে। এস্থলে ধর্মের জয় মানে পাণ্ডবদের জয়, অধার্মিক দুর্যোধনের কখনও নয়। ইদানীংকালে একটি ইংরাজী বাক্যেও অনুরূপ কথাই দেখেছি : In a long war between truth and falsehood–falsehood wins the first battle–truth the final. (Wisdom, November-05, P-53) শাস্ত্র বলছেন এই ধর্মের উৎপত্তি হয় সত্য থেকে। দয়া এবং দান থেকে এর বৃদ্ধি, ক্ষমায় এর অবস্থান এবং ক্রোধে এর বিনাশ।

সত্যাদুৎপদ্যতে ধর্মো দয়া দানাত্ বিবর্দ্ধতে।
ক্ষময়া তিষ্ঠতে ধর্মঃ ক্রোধাদ্ধর্মো বিনশ্যতি।। (ব্যাখ্যানমালা—১৪৮)

মহাভারতে ভীষ্ম ও কর্ণের চরিত্রের সত্যনিষ্ঠা এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। 'ভীষ্ম' শব্দটির অর্থ হল যিনি ভীষণ কর্ম করেন। ভীষ্মের প্রকৃত নাম ছিল দেবব্রত। তিনি তাঁর পিতা শান্তনুর মনোভিলাষ পূর্ণ করতে ভীষণ এক প্রতিজ্ঞা করে ভীষ্ম অভিধায় ভূষিত হন। একসময় তিনি জানতে পারেন তাঁর পিতা রাজা শান্তনু ধীবররাজকন্যা সত্যবতীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী। কিন্তু ধীবররাজ এক শর্ত আরোপ করেছেন। শর্ত হল ধীবররাজ তখনই তাঁর কন্যা সত্যবতীকে রাজা শান্তনুর হাতে সমর্পণ করবেন যখন তিনি কথা দেবেন যে সত্যবতীর গর্ভজাত সন্তানই হবেন দেশের পরবর্তী রাজা। এদিকে জ্যেষ্ঠপুত্র হিসাবে সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী হলেন দেবব্রত। প্রাণাধিক স্নেহের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবব্রতকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করতে শান্তনুর মন কিছুতেই সায়

দিচ্ছে না। তাই তিনি বিমর্ষ হয়ে আছেন। বিষয়টি দেবব্রতের গোচরে এলে তিনি সোজা চলে গেলেন ধীবররাজের কাছে। তিনি ধীবররাজকে বললেন সত্যবতীর পুত্রের অনুকূলে তিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসনের উপর থেকে তাঁর দাবী ত্যাগ করবেন। এবারে ধীবররাজ বললেন দেবব্রত নিজে সিংহাসনের দাবী ত্যাগ করলেও তার সন্তানেরা তো সিংহাসনের উপর থেকে তাদের দাবী ত্যাগ না করতেও পারে। এতে দেবব্রত ভীষণ এক প্রতিজ্ঞা করে বসলেন। তিনি বললেন :

অপত্যহেতোরপি চ করিষ্যেহদ্য বিনিশ্চয়ম্।
অদ্য প্রভৃতি মে দাস! ব্রহ্মচর্যং ভবিষ্যতি।।

পুত্রলাভ না করার জন্য আমি আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলাম। আজ থেকেই আমি ব্রহ্মচর্যব্রত শুরু করলাম। আমি বিবাহও করব না। আর তাই সন্তানলাভ ও তাদের দ্বারা রাজ্যপ্রার্থনারও আর কোন অবকাশ রইল না। এই অভাবনীয় ও বিস্ময়কর প্রতিজ্ঞা থেকেই দেবব্রতের নাম হল ভীষ্ম। ভীষ্মের এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় সন্তুষ্ট হয়ে ধীবররাজ তার কন্যা সত্যবতীকে রাজা শান্তনুর হস্তে সমর্পণ করলেন। এর পরের কাহিনি হল সত্যবতী দুই পুত্রের জননী হলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রাঙ্গদ যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গেলেন। তাই শান্তনুর ছোট পুত্র বিচিত্রবীর্য রাজা হলেন। তিনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করে অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তাই রাজ্যের আর কোন উত্তরাধিকারী রইল না। এমতাবস্থায় সত্যবতী ভীষ্মকেই অনুরোধ করলেন তিনি যেন তার ভ্রাতৃবধূদের পাণিগ্রহণ করে সন্তানের জনক হন। কিন্তু ভীষ্ম বললেন তিনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোক এমনকি দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব ইত্যাদি অতি লোভনীয় পদও ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু কিছুতেই সত্যকে ত্যাগ করতে পারেন না। একবার যেহেতু তিনি ব্রহ্মচর্যব্রতপালনে সত্যবদ্ধ হয়েছেন সেহেতু কোন অবস্থাতেই তিনি আর এ সত্যকে ভঙ্গ করতে পারবেন না। এই হল ভারতীয় সত্যনিষ্ঠা। কর্ণ একসময় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কোন প্রার্থী এসে যা চাইবেন কর্ণ তাকে তাই দেবেন। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে সে সময় শ্রীকৃষ্ণ এসে বললেন তিনি ক্ষুধার্ত। তিনি কর্ণের পুত্র বৃষকেতুর শরীরের মাংস খাবেন। আর এজন্য কর্ণকেই নিজহাতে তার পুত্রকে হত্যা করতে হবে এবং তার স্ত্রীকে সে মাংস রান্না করে দিতে হবে। ব্রাহ্মণের এই নিষ্ঠুর রাক্ষুষে প্রার্থনায় কর্ণ নির্বাক হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি প্রার্থীকে ফিরালেন না। নিজ সন্তানকে হত্যা করে স্ত্রীকে দিয়ে সে মাংস রান্না করিয়ে ব্রাহ্মণকে নিবেদন করলেন। পরে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদে বৃষকেতু বেঁচে উঠলেন। কিন্তু সত্যরক্ষায় কর্ণের অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা সকলকে অবাক করে দেয়। এছাড়াও নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তিনি তাঁর কবচকুণ্ডল ছদ্মবেশী ইন্দ্রকে দিতে পরাঙ্মুখ হন নি একথাও মহাভারত পাঠকেরা অবগত আছেন।

আমাদের অপর অমর মহাকাব্য রামায়ণেরও শুরু সত্যরক্ষার অনন্য আকুতির মধ্য দিয়ে। বৃদ্ধ রাজা দশরথ তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী কৈকেয়ীকে দুটি বর দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। স্বার্থান্বেষী রানী সুযোগ বুঝে প্রথম বরে নিজ পুত্র ভরতকে রাজা করতে ও দ্বিতীয় বরে রামকে বনে পাঠাতে চাইলেন। রাজা দশরথ এই সত্য রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ দিলেন কিন্তু সত্যভঙ্গ করলেন না। দশরথ বললেন—

রঘুকুলরীতি সদা চলি আঈ।
প্রাণ জাহুঁ বরু বচনু ন জাঈ।।

তিনি আরও বলছেন :

ন হি অসত্য সম পাতকপুঞ্জা, গিরিসম হোহি কি কোটিক গুঞ্জা। অর্থাৎ অসত্যের সমান পাপ নাই। কোটি গুঞ্জা ফল কি আর কখনও পাহাড়ের সমান হতে পারে? এখানে বলা হচ্ছে মানুষের কোন সুকৃতিই সত্যের মত এত বড় বা উৎকৃষ্ট নয়। অপর একটি হিন্দী দোঁহাতে বলা হয়েছে—

সাঁচ বরাবর তপ নহী, ঝুঠ বরাবর পাপ।
জাকে হিরদৈ সাঁচ হৈ, তাকে হিরদৈ আপ॥

(শিক্ষামূলক কাহিনি—পৃ. ১০ গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর)

অপরদিকে ধর্মের লক্ষণ বলতে গিয়ে মনুসংহিতায় সত্যকেই অন্যতম লক্ষণ বলে বলা হয়েছে :

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোইস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ॥ (মনু, ব্যাখ্যানমালা—১৩০)

মহানির্বাণতন্ত্রেও অনুরূপ মত পোষণ করা হয়েছে :

অস্মিন্ ধর্মে মহেশি স্যাত্ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকারনিরতো নির্বিকারঃ সদাশ্রয়ঃ॥ (মহানির্বাণতন্ত্র)

ইদানীংকালে স্বামী বিবেকানন্দ তাই এই সত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলছেন—সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। তাঁর একটি কবিতাতেও তিনি লিখছেন :

হে সত্য! তোমার তরে হের
প্রতীক্ষায় আছে বিশ্বজন,
তব মৃত্যু নাহি কদাচন। (—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃ ৪৫৬)

একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতে গাওয়া হয় :

সত্যমঙ্গল প্রেমময় তুমি, ধ্রুবজ্যোতি তুমি অন্ধকারে। তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ, দুঃখ জ্বালা সেই পাসরে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় লিখছেন :

আপনারে দীপ করি জ্বালো/দুর্গম সংসার পথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো/ সত্য লক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন করি দূর/জীবনের বীণাতন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর। সত্য সম্বন্ধে নজরুলের অভিব্যক্তি হল : বল নাহি ভয় নাহি ভয়। বল মাভৈ! মাভৈ! জয় সত্যের জয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন সত্যানুশীলনের পরাকাষ্ঠা :

সত্য সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত সব কাহিনি, শাস্ত্রবাক্য, সুভাষিত, কবিতাবলী ও গল্প, তত্ব এবং সাহিত্য হিসাবে হৃদয়স্পর্শী ও গভীর ভাবব্যঞ্জক সন্দেহ নাই। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগ শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে যেভাবে রূপপরিগ্রহ করেছে তা সর্বকালের সর্বশ্রেণীর সত্যান্বেষী মানুষের বিস্ময়ের ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্ভবই হয়েছিল সত্যকে অবলম্বন করে। তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় হুগলী জেলার দেরে গ্রামে আদর্শ ব্রাহ্মণের জীবন যাপন করতেন। গীতায় আদর্শ ব্রাহ্মণের স্বভাবগত কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সংযম, তপস্যা, বাহ্যাভ্যন্তরের শুচিতা,

সহিষ্ণুতা, সরলতা, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বানুভূতি এবং শাস্ত্রবাক্যে স্থির বিশ্বাস এগুলি হল ব্রাহ্মণগণের স্বভাবগত কর্ম। আর এ সব কিছুরই মূল ভিত্তি হল সত্য। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম দেরে গ্রামে তাঁর দেড়শত বিঘা জমির উপার্জনে যথেষ্ট সচ্ছলতার মধ্যেই জীবন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু সেসময় তাঁর সেই সুন্দর-সুস্থির জীবনে এল এক ভীষণ অগ্নি পরীক্ষা। দেরে গ্রামের অত্যাচারী জমিদার রামানন্দ রায় তার জনৈক প্রতিবেশীর উপর বিরূপ হয়ে তাকে শাস্তি প্রদানের জন্য তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করলেন। এই মামলায় জয়লাভের জন্য প্রয়োজন হল উপযুক্ত সাক্ষীর। রামানন্দ সাক্ষী হিসাবে ক্ষুদিরামকেই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করলেন। কারণ তিনি জানতেন সদা সত্যবাদী ক্ষুদিরামের কথাই সকলের নিকট সহজে বিশ্বাসযোগ্য হবে। তাই তিনি ক্ষুদিরামকেই তার অনুকূলে সাক্ষ্য দেবার জন্য অনুরোধ জানালেন। সত্যনিষ্ঠ ক্ষুদিরামের পক্ষে এ অন্যায় অনুরোধ মান্য করা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। তিনি দৃঢ়ভাবে এ বিষয়ে তাঁর অপারগতার কথা ব্যক্ত করলে জমিদার তাঁকে ভিটে-মাটি ছাড়া করবার ভয় দেখালেন। কিন্তু ক্ষুদিরাম তাঁর সত্যনিষ্ঠায় অবিচল রইলেন। তিনি জানালেন তিনি সর্বহারা হলেও সত্যহারা হতে প্রস্তুত নন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে অল্পদিনের মধ্যেই ক্ষুদিরামকে বাস্তুচ্যুত হতে হল। অবশেষে তাঁর অন্যতম সুহৃদ ও বন্ধু কামারপুকুরের সুখলাল গোস্বামীর আমন্ত্রণে তিনি কামারপুকুরে চলে এলেন। সুখলাল ক্ষুদিরামকে নিজ বসতবাটীর কয়েকটি চালাঘর ও জীবিকানির্বাহের জন্য ১ বিঘা দশ ছটাক চাষযোগ্য জমি দান করে সমূহ বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করলেন।

ক্ষুদিরামের পত্নী চন্দ্রামণি দেবীও ছিলেন একান্তভাবেই স্বামীর অনুগতা ও ধর্মশীলা। তাই দেখি তাঁদের এই পূতচরিত্রকে অবলম্বন করেই পরবর্তীকালে সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান শ্রীরামকৃষ্ণরূপে তাঁদের গৃহে আবির্ভূত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে ক্ষুদিরাম গয়াধামে গিয়ে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন নবদূর্বাদল-শ্যাম এক জ্যোতির্মণ্ডিত পুরুষ তাঁকে বলছেন ''ক্ষুদিরাম তোমার ভক্তিতে পরম প্রসন্ন হইয়াছি, পুত্ররূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আমি তোমার সেবা গ্রহণ করিব।'' ক্ষুদিরাম জানালেন তিনি নিতান্তই দরিদ্র। এই দারিদ্র্যের কারণে তার পক্ষে ঈশ্বররূপী ভাবী পুত্রের যথাযথ সেবা-যত্ন করা অসম্ভব। এতে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন, ''ভয় নাই ক্ষুদিরাম, তুমি যাহা প্রদান করিবে তাহাই আমি তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিব; আমার অভিলাষ পূরণ করিতে আপত্তি করিও না।'' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-প্রথমভাগ-স্বামী সারদানন্দ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ সং-পৃ ৩০) এ সময়ে কামারপুকুরে অবস্থানরতা চন্দ্রাদেবীর জীবনেও অদ্ভুত এক দর্শন ও অনুভূতি হয়। তিনি যুগীদের শিবমন্দিরের সামনে ধনীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। সে সময়ে তিনি দেখলেন, তাঁর নিজের কথায় ''মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতি নির্গত হইয়া মন্দির পূর্ণ করিয়াছে এবং বায়ুর ন্যায় তরঙ্গাকারে উহা আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। আশ্চর্য হইয়া ধনীকে ঐ কথা বলিতে যাইতেছি, এমন সময় সহসা উহা নিকটে আসিয়া আমাকে যেন ছাইয়া ফেলিল এবং আমার ভিতরে প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল।'' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ-প্রথমভাগ-স্বামী সারদানন্দ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬ সং-পৃ. ৩৪) উপরোক্ত দুটি ঘটনা থেকেই প্রমাণ হয় সত্যস্বরূপ ভগবানই শ্রীরামকৃষ্ণরূপ পরিগ্রহ করে এ যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন। গয়ার গদাধর বিষ্ণু ও যুগীশিব মন্দিরের ভগবান মহাদেবের যুগ্ম আবির্ভাব ঘটেছে শ্রীরামকৃষ্ণ শরীরে। গয়াধামে গদাধর বিষ্ণুর আশীর্বাদপুত স্বপ্নদর্শনের কথা স্মরণে রেখে তাই পরবর্তীকালে পুত্রের জন্মের পর ক্ষুদিরাম তার নাম রেখেছিলেন

গদাধর। এস্থলে আমরা দেখলাম গদাধর বিষ্ণু ও দেবাদিদেব মহাদেবের মিলিতরূপ হলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। আর এই ভগবান কথাটির ব্যাখ্যায় শাস্ত্র বলছেন—

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।। (বিষ্ণুপুরাণ—৬/৫/৭৪)

অর্থাৎ যার মধ্যে সমগ্র ঐশ্বর্য, বীর্য, যশ, শ্রী, বৈরাগ্য ও মোক্ষ এই ছয়টি গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান তিনিই ভগবান। রামায়ণে আদর্শ চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে অন্য সব গুণের সঙ্গে সত্যকে অন্যতম বলে গণ্য করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ঃ

সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে ধৈর্যেণ হিমবান্ ইব।
বিষ্ণুণা সদৃশো বীর্যে সোমবত্ প্রিয়দর্শনঃ॥
কালাগ্নিসদৃশ ক্রোধে ক্ষময়া পৃথিবী সমঃ
ধনদেন সমস্ত্যাগে সত্যে ধর্ম ইবাপরঃ॥

মহর্ষি নারদ বর্ণিত এই আদর্শ চরিত্রের এক অনবদ্য কাব্যিক রূপ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি লিখছেন ঃ

কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সমপদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তার পুণ্য নাম।"
নারদ কহিলা ধীরে, "অযোধ্যার রঘুপতি রাম।"

(—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাষা ও ছন্দ, উদ্ধৃতি অভিধান—৫৫৬ পৃ.)

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন পর্যালোচনা করলে আমরা দেখব তাঁর চরিত্রে উপরের শাস্ত্রোল্লিখিত সব গুণগুলিই রূপ পরিগ্রহ করেছিল। কিন্তু উপরোক্ত গুণসমূহের মধ্যে শৈশব থেকে তাঁর সত্যানুরাগ ছিল বিশেষভাবে চোখে পড়ার মত। তিনি অতি শৈশবে ধনী কামারিণীকে কথা দিয়েছিলেন উপনয়নের পর তাঁকেই তিনি ভিক্ষা-মা বলে বরণ করে নেবেন। সকলেই মনে করেছিল এ-কথা শিশুর চপলতা মাত্র। কিন্তু যখন সময় উপস্থিত হল তখনও দেখা গেল তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতিতে অচল-অটল। সকলে একবাক্যে বললেন ব্রাহ্মণ সন্তানকে উপনয়নের সময় কেবল কোন সৎ ব্রাহ্মণীর নিকট থেকেই ভিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। এটিই শাস্ত্রীয় বিধান। ছোট্ট গদাই এতে সকলকে অবাক করে দিয়ে বললেন সত্যকে বিসর্জন দিয়ে কি কখনও ব্রাহ্মণ থাকা যায়? আমি যে ধনী-মাকে কথা দিয়েছি তাকে ভিক্ষা-মা করব বলে। এখন যদি সে কথা না রাখি তাহলে যে সত্যকে বিসর্জন

দিয়ে ব্রাহ্মণত্বকেই বিসর্জন দিতে হয়! এ অকাট্য যুক্তির কাছে শেষে সকলে নতি স্বীকার করলেন। সত্যের পূজারী গদাই ধনী মা-কেই ভিক্ষা-মা বলে বরণ করে নিলেন।

শৈশব থেকে আজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যকে অবলম্বন করে তাঁর সব কাজ করে গিয়েছেন। এ কাজ যে তিনি খুব পরিকল্পনা করে করেছেন তা নয়। কিন্তু এটি ছিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ও মজ্জাগত বিষয়। বহু ঘটনায় আমরা এর প্রমাণ পাই। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে বলে ফেলেছেন যদু মল্লিকের বাড়ি যাবেন। সারাদিনের নানা ব্যস্ততায় তিনি এ-কথা ভুলে গিয়েছেন। শেষে যখন এটি মনে পড়ল তখন অনেক রাত। কিন্তু তিনি কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারলেন না। মাঝরাতেই হৃদয়কে সঙ্গে নিয়ে চললেন যদু মল্লিকের বাগানবাড়িতে। সেখানে গিয়ে দেখেন গেট বন্ধ। তখন তিনি গেট ফাঁক করে একটি পা প্রবেশ করিয়ে বললেন —আমি এসেছি, এসেছি, এসেছি। এতটা করার পর তাঁর মন শান্ত হল। সত্য সম্বন্ধে এই যদু মল্লিকের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একদিনের কথোপকথন নিম্নরূপ ঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ—কই গো, চণ্ডীর গান?

যদু—নানান কাজ ছিল তাই এতদিন হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি! পুরুষ মানুষের এককথা!

"পুরুষ কি বাত, হাতি কি দাঁত।

"কেমন, পুরুষের এককথা, কি বল?"

যদু (সহাস্যে)-তা বটে। (—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, অখণ্ড—পৌষ-১৪১৬, ২৩৮ পৃ.)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজে যেমন সত্যকে মান্য করে চলতেন তেমনি চাইতেন অন্যরাও যেন সেরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে সত্যকে অবলম্বন করে চলেন। যদি তারা সেরূপ না চলতেন তাহলে তিনি বিরক্ত হতেন। ব্রাহ্ম নেতা শিবনাথকে তিনি খুবই ভালবাসতেন। তিনি তাঁর সম্বন্ধে বলতেন 'শিবনাথকে দেখলে আমার বড় আনন্দ হয়, যেন ভক্তিরসে ডুবে আছে।' কিন্তু পরক্ষণেই বলছেন 'তবে শিবনাথের একটা ভারী দোষ আছে— কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল যে একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালিবাড়িতে) যাবে কিন্তু যায় নাই, আর কোন খবরও পাঠায় নাই। ওটা ভাল নয়।' এরপরই বলছেন—এইরকম আছে যে 'সত্য কথাই কলির তপস্যা।' এ কথাটির মধ্যে মুণ্ডকোপনিষদের প্রতিধ্বনিই আমরা শুনতে পাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও শ্রীরামকৃষ্ণদেব যথেষ্ট ভালবাসতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্য সম্বন্ধে তাঁর নিষ্ঠার অভাবকে মেনে নিতে পারেননি। এসম্বন্ধে তাঁর মনোভাব নিচের উদ্ধৃতি থেকে সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় ঃ

"সত্যবচন, পরস্ত্রী মাতৃসমান। এই সে হরি না মিলে তুলসী ঝুটজবান।" সত্যতে থাকলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর সেদিন বললে, এখানে আসবে, কিন্তু এল না। (—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড-পৌষ-১৪১৬, ২৭৮ পৃ.)

সাধনার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সবকিছু মায়ের নিকট সমর্পণ করেছিলেন কিন্তু সত্য তাঁকে দিতে পারেননি। তাঁর নিজের কথায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—"বলেছিলাম, মা। এই নাও তোমার জ্ঞান, এই নাও তোমার অজ্ঞান,

আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার শুচি, এই নাও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও মা; এই নাও তোমার পুণ্য, এই নাও তোমার পাপ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। যখন এইসব বলছিলুম তখন একথা বলতে পারিনি, 'মা! এই নাও তোমার সত্য, এই নাও তোমার অসত্য।' সব মাকে দিতে পারলুম, সত্য মাকে দিতে পারলুম না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১/৮/১

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সত্যনিষ্ঠা কতটা আন্তরিক ছিল তা বুঝা যায় নীচের প্রসঙ্গ থেকে ঃ

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রাণকৃষ্ণাদি ভক্তের প্রতি)—আর সংসারে থাকতে গেলে সত্য কথার খুব আঁট চাই। সত্যতেই ভগবানকে লাভ করা যায়। আমার সত্য কথার আঁট এখন তবু একটু কমেছে, আগে ভারী আঁট ছিল। যদি বলতুম 'নাইব', গঙ্গায় নামা হল, মন্ত্রোচ্চারণ হল, মাথায় একটু জলও দিলুম, তবু সন্দেহ হল, বুঝি পুরো নাওয়া হল না! অমুক জায়গাতে হাগতে যাব, তা সেইখানেই যেতে হবে। রামের বাড়ি গেলুম, কলকাতায়। বলে ফেলেছি, লুচি খাব না। যখন খেতে দিলে, তখন আবার খিদে পেয়েছে। কিন্তু লুচি খাব না বলেছি, তখন মেঠাই দিয়ে পেট ভরাই। সকলের হাস্য) (—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড-পৌষ-১৪১৬, ৪১৭ পৃ.).....এখন তবু একটু আঁট কমেছে। বাহ্যে পায়নি, যাব বলে ফেলেছি, কি হবে? রামকে জিজ্ঞাসা কল্লুম। সে বললে, গিয়ে কাজ নাই। তখন বিচার কল্লুম; সব তো নারায়ণ। রামও নারায়ণ। ওর কথাটাই বা না শুনি কেন? হাতি নারায়ণ বটে, কিন্তু মাহুতও নারায়ণ। মাহুত যে কালে বলছে, হাতির কাছে এসো না, সেকালে মাহুতের কথা না শুনি কেন? এই রকম বিচার করে আগেকার চেয়ে একটু আঁট কমেছে। (—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড-পৌষ-১৪১৬, ৪১৭ পৃ.).....শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণের প্রতি) ''হ্যাঁগা, সত্য কথা কহিতে হবে বলে কি আমার শুচিবাই হল নাকি! যদি হঠাৎ বলে ফেলি, খাব না, তবে খিদে পেলেও আর খাবার যো নাই। যদি বলি ঝাউতলায় আমার গাড়ু নিয়ে অমুক লোকের যেতে হবে, —আর কেউ নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে বলতে হবে। একি হল বাপু। এর কি কোন উপায় নাই। (—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড-পৌষ-১৪১৬, ৬৮০ পৃ.)

শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যনিষ্ঠা তাঁর অস্থি-মজ্জা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে যেন একীভূত হয়ে গিয়েছিল। তিনি একবার শম্ভু মল্লিকের বাগানে গিয়েছেন। কথায় কথায় শম্ভু মল্লিক জানতে পারলেন শ্রীরামকৃষ্ণের পেটের অসুখ করেছে। তাতে শম্ভু বললেন : আপনি যাবার সময় আমার কাছ থেকে একটু আফিম নিয়ে যাবেন। আফিম খাবেন, আফিম খেলে পেটের অসুখ কমবে। ঠাকুরও বললেন : আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু এরপর তিনি আফিম না নিয়েই শম্ভুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছেন। হঠাৎ মনে পড়ল আফিম আনা হয়নি। তাই পুনরায় ফিরে গেলেন শম্ভুর বাড়ি। শম্ভু তখন অন্দরমহলে চলে গিয়েছেন। তাকে ডেকে আর কষ্ট দেওয়া ঠিক নয় ভেবে তিনি শম্ভুর জনৈক কাজের লোকের নিকট থেকে আফিম নিয়ে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দিকে রওনা দিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য! আফিম হাতে নিয়ে তিনি আর কিছুতেই সঠিক পথ দিয়ে এগুতে পারছেন না। পা চলে যাচ্ছে পাশের নর্দমার দিকে। চোখ যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তখন তাঁর মনে পড়ল শম্ভু তো কাজের লোকের কাছ থেকে আফিম নিতে বলেননি। তিনি বলেছিলেন তার নিজের কাছ থেকে আফিম নিতে। এক্ষেত্রে শম্ভুর পরিবর্তে কাজের লোকের কাছ থেকে আফিম নেওয়ায় মিথ্যাচার হয়েছে। তখন তিনি সেই আফিম জানলা দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। এবার

আর তাঁর পথ চলতে কোন অসুবিধা হল না। জগন্মাতা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভুল করেও মিথ্যার আশ্রয় নিতে দেবেন না। তাই তিনিই যেন ছল করে শ্রীরামকৃষ্ণের চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আসলে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে মা-কে যত না আঁকড়ে ধরেছিলেন তার চেয়ে বেশী জগন্মাতা নিজে শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরেছিলেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের আর পতন বা স্খলনের ভয় থাকেনি। আর এজন্যই কথা দিয়েও শম্ভুর নিকট থেকে আফিম না নিয়ে অন্যের নিকট থেকে নেওয়ায় তিনি পথে অন্ধকার দেখছিলেন। অনুরূপভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ এক সময় তাঁর অন্যতম মহিলা ভক্ত গোপালের মাকে বলেছিলেন : ওর হাতে আর কখনও ভাত খাব না। সকলে মনে করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের এ-কথাটি একটি কথার কথা মাত্র। কারণ গোপালের মায়ের প্রতি তাঁর যে শ্রদ্ধা-ভালবাসা তাতে তিনি তাঁর হাতে না খেয়ে এই বৃদ্ধাকে কখনও কষ্ট দিতে পারবেন না। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল এর পর শ্রীরামকৃষ্ণের গলার অসুখ এতটাই বেড়ে গেল যে তিনি আর ভাত খেতেই পারছিলেন না। আর একবার ভাবাবস্থায় বলেছিলেন : এর পরে আর কিচ্ছু খাব না—শুধু পায়েস খাব। বাস্তবেও তাই ঘটল। অসুস্থতার শেষের দিকে তিনি দুধ-ভাত বা সুজির পায়েস ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করতেই পারছিলেন না।

মহাভারতে আছে :

সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।
সত্যে বিধৃতং সর্বং সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥

অর্থাৎ সত্যযুক্ত বাক্য শ্রেষ্ঠ। সত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন বস্তু নেই। সত্যের দ্বারা সংসারের সব পথ বিধৃত ও সব কিছু সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাতে আরও বলা হয়েছে—

সত্যার্জব পর ধর্মমাহুর্ধর্মবিদো জনাঃ।
দুর্জ্ঞেয় শাশ্বতো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥

ধর্মবেত্তাগণ সত্য ও সরলতাকে পরম ধর্ম বলে অভিহিত করেন। কারণ শাশ্বত ধর্ম দুর্জ্ঞেয় তবে তা সত্যেতেই প্রতিষ্ঠিত।

স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে নবযুগধর্ম তথা সর্বধর্মের স্থাপয়িতা বলে উল্লেখ করেছেন। এই ধর্ম স্থাপন বলতে ঠিক কী বুঝানো হয় তা আমরা সকলে সম্যকরূপে অবহিত নই। কিন্তু তিনি যেভাবে সত্যের পরাকাষ্ঠা নিজ জীবনে দেখিয়েছেন তার থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি এই সত্যাবলম্বনই হল প্রকৃত ধর্ম প্রতিষ্ঠা বা ধর্ম স্থাপন। আর এ-জন্যই বহুযুগ পূর্বে মহাভারতে ধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এটিকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত একটি সত্ত্বা বলে নির্ধারিত করেছেন। মহাভারত বর্ণিত এই ধর্ম আমাদের দেশ থেকে লুপ্ত হতে বসেছিল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অনন্য অনবদ্য সাধন-জীবন সহায়ে এ ধর্মকে আবার পুনঃপ্রতিষ্ঠা দান করলেন। বর্তমান যুগে তাই যথার্থ ধর্মকে বুঝতে হলে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে আচরিত সত্যনিষ্ঠাকে উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। তাঁর কৃপায় আমাদের জীবন সত্যে মণ্ডিত হোক এই প্রার্থনা।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়ার বর্তমান সম্পাদক এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অছি পরিষদের সদস্য।

স্বাধীনতার রঙ

স্বামী শিবপ্রদানন্দ

হঠাৎ পল্টুর ঘুমটা ভেঙে গেল। তারপর থেকে আর পল্টুর চোখে ঘুম নেই। বিছানায় চুপ করে শুয়ে আছে। বাইরে অবিরল বৃষ্টি হচ্ছে। মাথার দিকের জানলাটা খোলা। ভিজে বাতাস ঝাপটা মারছে জানলার পর্দায়। সিলিং ফ্যানটা অনবরত ঘুরে চলেছে। ফুলে উঠছে মশারির মাথা। পল্টুর শীত করছিল। একটা চাদর হলে ভাল হত। পাশে শুয়ে আছে মা। একটা বড় চাদর গায়ে চাপা দিয়ে মা দিব্যি ঘুমোচ্ছে। পল্টু নিঃশব্দে মায়ের কাছে সরে এল। ঘুমের ঘোরেই মা পল্টুর প্রয়োজন টের পেলেন। চাদরের মধ্যে মায়ের বুকের কাছে সহজেই আশ্রয় হল তার। এই ওমটুকুই সে খুঁজছিল। বৃষ্টিটা আরো জোরে এল। তবে এসব ছাপিয়ে হৃদয়পুর স্টেশন ছাড়িয়ে লাস্ট লোকাল ট্রেনটা দ্রুত চলে গেল। আগামীকাল ১৫ আগস্ট। সকাল সাতটায় ইস্কুলে যেতে হবে। জাতীয় পতাকা তুলবেন হেডস্যার। এই সব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পল্টুর চোখের পাতা ভারী হয়ে গেল। চিন্তার খেই হারিয়ে যাচ্ছিল তার। জাতীয় পতাকা...ট্রেন...বৃষ্টি...অন্ধকার। একসময় গভীর ঘুমে ডুব দিল পল্টু।

কেউ যেন পল্টুকে পিছন থেকে ডাকল। পল্টু ক্লাস সেভেনে পড়ে। পল্টু পা চালিয়ে ইস্কুলের দিকে যাচ্ছিল। আবার পিছন থেকে ডাক, 'অ্যাই পল্টু! নাট-বল্টু!' পল্টু পিছনে না তাকিয়ে বুঝতে পারল, তারই বন্ধু সুজন ডাকছে। সুজন তার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ে। এমনিতে ভাল বন্ধুত্ব আছে কারণ ভেলপুরি, আইসক্রিমের ভাগ দেয় সে পল্টুকে। তবে মাঝেমধ্যে 'নাটবল্টু' বলে খ্যাপায়। এসব গায়ে মাখে না পল্টু। তবে খুব বেশি পিছনে লাগলে পল্টুও পাল্টা দেয়। সুজনকে 'দুর্জন' বলে ডাকে। এ নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি করে অন্য বন্ধুরা। এমনকী ব্যাপারটা ক্লাস টিচার দুর্গাশঙ্কর বাবুও জেনেছেন। রাশভারী শিক্ষক দুর্গাশঙ্কর মল্লিক না হেসে পারেননি।

সুজনের ডাকে পল্টু দাঁড়িয়ে যায়। পল্টুর একটা ভাল নাম অছে। অমলকান্তি। পুরো নাম অমলকান্তি মুখোপাধ্যায়। তবে বন্ধুমহলে সে নামের চল তেমন নেই। আসলে পল্টুর মা অভয়া দেবীর প্রিয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা থেকে 'অমলকান্তি' নামটা নিজের ছেলের জন্য বেছে নিয়েছেন। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা পল্টু পড়েনি, তবে ইস্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় তাঁর লেখা কবিতার আবৃত্তি শুনেছে। ক্লাস টেনের ছাত্র চিরন্তনদা, মানে চিরন্তন কুণ্ডু 'কলকাতার যীশু' কবিতা আবৃত্তি করে সবার তারিফ পেয়েছিল।

সুজন দূরত্ব কমিয়ে পল্টুর পাশে এসে পিঠে আলতো করে একটা চাপড় দিয়ে বলে, 'তোকে কখন থেকে ডাকছি—শুনতে পাসনি?' পল্টুর চোখে দুষ্টুমি খেলে গেল। মুচকি হেসে বলল, 'দুর্জনের ডাকে সাড়া দিতে নেই!' সাময়িক ভাবে অপ্রস্তুত সুজন অবস্থা সামাল দিয়ে বলল, 'ওসব ছাড়। ইস্কুলের দিক থেকে যে রাস্তাটা হৃদয়পুর স্টেশনের দিকে গেছে, তার প্রথম বাঁকে একটা নতুন দোকান হয়েছে। চমৎকার এগরোল বানায়।' পল্টুর উদাসী উত্তর, 'তাতে আমার কী?' সুজন রহস্যময় একটা হাসি দিয়ে পল্টুকে জানাল, 'সেভেন বি সেকশনের প্রান্তিক জানা, সেই ক্যাবলা ছেলেটা আমাদের খাওয়াবে বলেছে। ওর বাবার কারখানা আছে। বিস্তর টাকার মালিক। আমাদের জন্য দু-পাঁচশো টাকা খরচ করা ওর কাছে নস্যি!' পল্টুর খুব যে একটা ইচ্ছে

ছিল তা নয়। তবে এগরোলের স্বাদ তাকে টানছিল। সুজনের কথা শেষ হতে না হতে মুফ্‌তি, শিশির, সঞ্জয়, ঋজু আর বিশু এসে হাজির হল। বন্ধুদের মধ্যে বিশু ছড়া লেখে। তবে বিশুর ইচ্ছে, বড় হয়ে ভারী ভারী প্রবন্ধ লিখে সবার মাথা ঘুরিয়ে দেবে। এসব কথা বিশু একান্তে পল্টুকে বলেছিল। অবশেষে অবতীর্ণ হল ক্যাবলা প্রান্তিক। খুব মোটা, কুচকুচে কালো গায়ের রঙ। বন্ধুরা বলে, প্রান্তিক জানা যখন হাসে তখন মনে হয়, ভালুক সাদা মুলো খাচ্ছে। প্রান্তিক উপস্থিত হতেই সবাই মিলে প্রান্তিককে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। বিপক্ষ দলের গোলে বল জড়িয়ে দেওয়ার পর সতীর্থদের কাছে সেই প্লেয়ারের যেমন অবস্থা হয়, তেমন আর কী। টিভিতে দেখা সেই পরিস্থিতির অক্ষম অনুকরণে বন্ধুদের ঠেলায় প্রান্তিকের হাঁসফাঁস অবস্থা। প্রান্তিক 'ছাড়, ছাড়' বলে হাত-পা ছুড়তে লাগল। তার ফলে দু-এক জন রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ল। তবে উঠে দাঁড়াতে বেশি সময় লাগেনি। পথচারী, দোকানদাররা ছেলেগুলোর মস্করা উপভোগ করছিল পুরোদস্তুর।

কিন্তু একটু পরেই যেন সময়টা হঠাৎ থেমে গেল। পল্টু আর তার বন্ধুরা ততক্ষণে এগরোলের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। দোকানের মালিককে সাহায্য করছে তাদেরই বয়সি জনা তিনেক ছেলে। খালি গা, উসকোখুসকো একমাথা চুল, পরনে মলিন হাফপ্যান্ট। পল্টুর মন খারাপ হয়ে গেল। মনে হল যেন চারপাশের বাতাস কেমন ভারী হয়ে বুকের ওপর চেপে বসেছে। প্রান্তিক এগরোলের অর্ডার দিয়ে, কোল্ড ড্রিংকসের খোঁজে পাশের দোকানে পা বাড়াল। পল্টুর এসব ভাল লাগছে না। বন্ধুরা গল্প করছে। হাসছে। কিন্তু পল্টুর মনে হল, অনেক দূর থেকে সেই শব্দ ভেসে ভেসে আসছে। সে যেন নিঃস্তব্ধ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। একা। একটা অপ্রিয় প্রশ্ন তাকে তাড়া করছে। নাড়া দিচ্ছে ক্রমাগত। দোকানের এই ছেলেগুলো কেন তাদের মজার ভাগ পাবে না? পতাকার তিনটে রঙ। প্রান্তিক জানাদের একটা রঙ। পল্টু আর তার বন্ধুদের একটা। আর এই ভিখিরি মায়ের শিশুদের আর একটা রঙ। এই তেরঙ্গা পতাকা কাল ভারতের আকাশে উড়বে।

পল্টু শরীরে একটা ঝাঁকুনি অনুভব করল। ঘুম ভেঙে গেল তার। মা ডাকছে। 'পল্টু ওঠ! এখনও ঘুমোচ্ছিস? ইস্কুলে যাবি না?' দেওয়ালঘড়িতে তখন সকাল পৌনে ছ'টা। বৃষ্টি থেমে গেছে। আকাশে টুকরো মেঘের ভেলা। তার ফাঁক দিয়ে, জানলা গলে তীব্র বল্লমের মতো রোদ্দুর এসে পড়েছে বিছানায়, অমলকান্তির শরীরে।

১৯৭৬ হায়ার সেকেন্ডারী ব্যাচের প্রাক্তন ছাত্র। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়ার প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। উদ্বোধন পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক। রামকৃষ্ণ মঠ বরিষার অধ্যক্ষ।

নুনের পুতুল সাগর-জলে

'ব্রহ্ম বাক্য - মনের অতীত।'.... একটা লুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল।

সমুদ্রে যাই নেমেছে অমনি গলে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবেক?

—শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত

নচিকেতা ঃ ফিরে দেখা

স্বামী দিব্যসুখানন্দ

আজকের দিনে সমাজ জীবনে আমরা প্রায়ই মানসিক চাপজনিত সমস্যার কথা শুনে থাকি, নচিকেতা তাদের সামনে সেই চাপ অতিক্রমের একটি জীবন্ত উদাহরণ। বয়সে নবীন হলেও নচিকেতা উচ্চভাব বা আদর্শের প্রতি যে শ্রদ্ধার ভাব দেখিয়েছে তাই তা সকল প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তাকে মানসিক চাপমুক্ত তো করেছেই, বরং তাকে মানসিক স্থিতবস্থা ও উচ্চ আদর্শের পথে চলার শক্তি জুগিয়েছে।

উপনিষদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই দুর্লভ তত্ত্বকে কখনো কখনো কাহিনী বা ঘটনাবলম্বনে সহজ সরলরূপে বোধগম্য করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এর মধ্য দিয়েই উপনিষদ হয়ে উঠেছে হৃদয়গ্রাহী ও আধ্যাত্মিক জীবনযাপনের প্রেরণাস্বরূপ। এই রকমই একটি জীবন্ত উদাহরণ দেখতে পাই কঠোপনিষদের মধ্যে যম-নচিকেতা উপাখ্যানে। উপনিষদ অত্যন্ত গম্ভীরতার সঙ্গে ঘোষণা করে যে, একজন আন্তরসম্পদে ঋদ্ধ ব্যক্তিই আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করতে পারেন। নচিকেতা হল এমনই এক আন্তরজগতের শুদ্ধতায় পূর্ণ এক অসামান্য কিশোর। আর অন্যদিকে তত্ত্বজ্ঞানী যমরাজ যিনি জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে অজ্ঞেয় তত্ত্বকে উপলব্ধি করেছেন।

ঋগ্বেদেও আমরা যম-নচিকেতা উপাখ্যানের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ দেখতে পাই। তবে কঠোপনিষদেই এই উপাখ্যানের একটি পূর্ণাবয়বরূপ দেখতে পাই, যার চরিত্র আধ্যাত্মিক জীবনগঠনের মার্গদর্শনস্বরূপ। উপনিষদ সতত সচেষ্ট যাতে আমাদের বুদ্ধির শুদ্ধি হয়, যাতে আমরা সীমার মাঝ থেকে অসীমের পারে চলতে পারি, আত্মবিস্মৃতির অন্ধকার থেকে আত্মজ্ঞানের আলোতে যাতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারি, মৃত্যু থেকে আমরা যাতে অমৃতের পারে চলতে পারি।

কালের গতিতে প্রকৃতিতে শীতলতা আসে, কখনও বা দেখা দেয় উষ্ণতার তাপদগ্ধতা, এই পরিবর্তনের মধ্যে জীবন এগিয়ে চলে। বোধকরি প্রাচীন ঋষিরা পরিবর্তনশীল জীবনের মাঝে সুকুমার কৈশোরের মধ্যেই দেখতে চেয়েছিলেন কুঁড়ির প্রকৃত বিকাশোন্মুখ অবস্থা। তাই তাঁদের স্বপ্নের আদর্শ কিশোর নচিকেতাকে উত্তরকালের জন্য উপহার দিয়ে গেছেন; তাঁরা কিশোরের বাক্য ও ব্যবহারে বয়োজ্যেষ্ঠ পিতাকে শিক্ষাদানের চিত্রটি তুলে ধরতেও বিরত হননি। হয়তো তাঁরা চেয়েছিলেন শিক্ষাকে বয়সের গণ্ডি ছাড়িয়ে অনন্য সম্পদ বলে গ্রহণ করা হোক, আর জীবন গঠন শুরু হোক কৈশোরেই। স্বামী বিবেকানন্দের নচিকেতা-জীবনের প্রতি ছিল এক অত্যুচ্চ শ্রদ্ধা। তিনি বলছেন—'নচিকেতার মতো শ্রদ্ধা হৃদয়ে আন। নচিকেতার মতো যমলোকে চলে যা-আত্মতত্ত্ব জানবার জন্য।' (বাণী ও রচনা-৯/৩১)

নচিকেতা-কাহিনী

অতি পুরাকালে স্বর্গকামনা করে বাজশ্রবস বিশ্বজিৎ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্রতী হয়েছিলেন। এই যজ্ঞের বিধি অনুযায়ী যজ্ঞকর্তাকে সকল সম্পত্তি দান করতে হত। বাজশ্রবসের এক পুত্র ছিল নচিকেতা। সে লক্ষ্য করল যখন ব্রাহ্মণদের দান অনুষ্ঠান হচ্ছে তখন তার পিতা দান করছেন—'পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ' অর্থাৎ

শেষ-জল-খাওয়া, শেষ-তৃণ-খাওয়া, শেষ বারের মতো দোহন হয়ে যাওয়া, প্রজননে অসমর্থ গাভীগুলি দান করছেন। দানের মধ্যে এই দীনতা দেখতে দেখতে তখন নচিকেতার মধ্যে যেন শ্রদ্ধার অনুপ্রবেশ ঘটল। সে অনুভব করল যজ্ঞকর্তার এইরূপ দীনতাপূর্ণ দান যজ্ঞকর্তাকে নিরানন্দলোকে নিয়ে যাবে। তাই বাবার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললে, 'বাবা, তুমি আমাকে কাকে দান করছ?' বাবা এই প্রশ্নের উত্তর প্রথমে এড়িয়ে গেলেও পুনরায় তা নচিকেতা জিজ্ঞাসা করলে নচিকেতার বাবা বললেন, 'তোমায় যমকে দিলাম।' পিতার কথামতো নচিকেতা যমরাজের আলয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু সেখানে যমরাজ না থাকায় সে তিনদিন উপবাসে অতিবাহিত করল। যমরাজ ফিরে এসেই অতিথি সৎকারের দেরি হওয়ার জন্য মার্জনা চেয়ে নিলেন এবং তিনটি বর প্রদান করতে চাইলেন।

প্রথম বরে নচিকেতা চাইলেন, তার পিতা গৌতম যেন তার জন্য সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত হন, রাগমুক্ত হন এবং ফিরে যাওয়ার পরে যেন তাকে চিনতে পারেন ও তার সঙ্গে বার্তালাপ করেন।

দ্বিতীয় বরে নচিকেতা প্রার্থনা করল, যজ্ঞের সেই তত্ত্বকথা যার দ্বারা স্বর্গলাভ হয়। যমরাজ তৎক্ষণাৎ দুটি বরই প্রদান করলেন। শেষের বরে নচিকেতা প্রার্থনা করলেন আত্মজ্ঞান। যমরাজ প্রথমে সেই জ্ঞান প্রদানে ইচ্ছুক ছিলেন না, তাই নচিকেতাকে নানারকম জাগতিক ভোগ্যবস্তু দিতে চাইলেন। কিন্তু নচিকেতার দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি সেই জ্ঞান প্রদান করলেন। নচিকেতা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে সকল বাসনা ও অজ্ঞানতার পারে গিয়ে মুক্ত হয়ে গেল।

নচিকেতা-চরিত্রে অনন্য গুণাবলী দেখে আমরা মুগ্ধ হই। তার চরিত্র এ যুগের মানুষের জন্যও আদর্শস্থানীয়। সেই অতুচ্চ জীবনে শ্রদ্ধা, সত্যবাদিতা ও মানসিক চাপমুক্ত অবস্থান কেমন ছিল তা একবার ফিরে দেখবার চেষ্টা করব।

শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধা হল মনের এমন একটি ভাব যা সকল সত্য ও ন্যায়সম্মত বস্তু বা বিষয়ের প্রতি এক সুদৃঢ় আস্থা জ্ঞাপন করে। এই শ্রদ্ধাই হল নচিকেতা-জীবনের উজ্জ্বলতম দিক যা তাকে কিশোর বয়সেও সকলের কাছে সম্মানীয় করে তুলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবন কীরূপে অনুধ্যান করতে হয় আলোচনা করতে গিয়ে স্বামী ভূতেশানন্দজী বলেছেন, ''খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর কথা ভাবতে হবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছি কারণ, শ্রদ্ধা ছাড়া তো আলোচনার যে চরম ফল তা লাভ হবে না। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'-শ্রদ্ধাবান যে, তারই পক্ষে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। শ্রদ্ধা দ্বারাই মানুষ আদর্শের দিকে এগোতে পারে।'' (শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ, পৃঃ ১৭)।

আত্মশ্রদ্ধা

বাজশ্রবস রাগান্বিত হয়ে নচিকেতাকে যমের কাছে দিলেন বলাতে নচিকেতা অগাধ বিস্ময়ে ভাবল 'অনেক উত্তমদের মধ্যে আমি উত্তম স্থান লাভ করি এবং অনেক ক্ষেত্রে মধ্যম স্থান লাভ করে থাকি কিন্তু কখনও অধম স্থান লাভ করি না, তবে যমের এমন কি প্রয়োজন পড়ল যে বাবা আমাকে দিয়ে আজ সিদ্ধ করবেন?' এর থেকে অনুমিত হয় যে, নচিকেতার নিজের প্রতি গভীর আস্থা ছিল। আর এই আস্থাই তাকে যমরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সহায়ক হয়েছিল।

শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা

নচিকেতা যজ্ঞের দানানুষ্ঠান লক্ষ্য করছিল সেখানে তার আশা ছিল শাস্ত্রসম্মত দান অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু সে তা দেখতে না পেয়ে পিতাকে এসে প্রশ্ন নিবেদন করছে। এটি নচিকেতার শাস্ত্রজ্ঞান ও শাস্ত্রনিষ্ঠারই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে।

আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা

তৃতীয় বর প্রার্থনাকালে নচিকেতা যমকে বলল, ''কেউ কেউ বলে মত্যুর পর সব শেষ, আবার অনেকে বলে, মৃত্যুর পরেও তার অস্তিত্ব আছে। আপনি যমরাজ, মৃত্যুর দেবতা। আপনি সত্য জ্ঞাত আছেন। অনুগ্রহ করে এর মধ্যে নিহিত সত্য আমায় বলুন।'' প্রাজ্ঞ যমরাজ বললেন, ''দেবতাদেরও এই সম্পর্কে সন্দেহ আছে বিষয়ের সূক্ষ্মতা হেতু। তাই তুমি আমাকে এই জ্ঞান প্রদানের জন্য জোর কোর না, বরং অন্য বর প্রার্থনা কর।'' নচিকেতা এই কথা শুনে আচার্যের প্রতি প্রবল শ্রদ্ধাজ্ঞাপনপূর্বক বলে উঠল, ''বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরস্তুল্য এতস্য কশ্চিৎ।'' (কঠো. ১.১.২২)। অর্থাৎ এই আত্মতত্ত্বের বক্তা আপনার সদৃশ আর কাকেও পাওয়া সম্ভবপর নয়, এবং এই বরের সদৃশ অন্য বরও থাকতে পারে না।

নচিকেতার এই কথা প্রমাণ করে যে, সে যমরাজকে ব্রহ্মবিদ্যার আচার্যরূপে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। তাই পরিশেষে দেখা যায়, আচার্য যমরাজের কাছ থেকে সে আত্মজ্ঞান লাভ করে তত্ত্বজ্ঞানী নচিকেতাতে পরিণত হয়েছিল।

পূর্বপুরুষ ও সদাচরণের প্রতি শ্রদ্ধা

নচিকেতা যখন যমালয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত, তখন নচিকেতার পিতা অত্যন্ত মর্মাহত। এই কঠিন মুহূর্তেও নচিকেতা তার বাবাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তাদের পিতৃপুরুষরা সত্যের জন্য কেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন; তাই সেই বংশের হয়ে পিতার উচিত হবে সত্যরক্ষা করা।

উপনিষদ আমাদের সামনে তুলে ধরেছে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি এবং সদাচরণের প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা থাকা উচিত। আর এই শ্রদ্ধা মানুষকে যে-কোন দুর্বলতার মধ্যেও শক্তি জোগায়। বর্তমানে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে জেনে তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সদাচণের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের জীবনকে কতদূর উন্নত করতে পারে তা নচিকেতার চরিত্র আমাদের সামনে দৃষ্টান্তস্বরূপ।

সত্যবাদিতা

যমরাজের কাছে যাবার প্রাক্কালে নচিকেতা পিতার বিমর্ষতা দেখে পিতাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে তাঁর পূর্বপুরুষেরা সত্যকে রক্ষা করে এসেছে, তাই তাঁরও উচিত সত্যকে রক্ষা করা, এমনকি পুত্রবিচ্ছেদ হলেও কর্তব্য। মুণ্ডকোপনিষদে পাই, 'সত্যমেব জয়তে'। নচিকেতা যেন সেই মহাবাক্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। নচিকেতা যমরাজের আলয়ে পৌঁছে দেখল যমরাজ গৃহে অনুপস্থিত। নচিকেতা গৃহের বাহিরে তিন দিন-রাত অনশনে অতিবাহিত করল। বোধহয় নচিকেতা যমরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর গৃহে অতিথি হওয়াকে সত্যের অবমাননা বলে বোধ করেছে। তার কাছে সত্য জীবনের মূল ভিত্তিস্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে এবং তার জন্য সে পিতার আদেশ রক্ষার্থে যমরাজের আলয়ে আসতে পর্যন্ত দ্বিধা বোধ করেনি। পরে যমরাজের কাছে বর প্রার্থনা কালে যখন সে তৃতীয় বরে আত্মজ্ঞান লাভের কথা জানিয়েছে তখন

যমরাজ নানা প্রলোভনজনক বস্তু দান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেও নচিকেতা শুধুমাত্র আত্মজ্ঞানলাভের দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করে তার কায়মনোবাক্যে ঐক্যতানের সততার পরিচয় দিয়েছে। এবিষয়েরই প্রতিধ্বনি দেখি যখন ঠাকুর বলছেন, 'সত্যতে থাকবে, তাহলেই ঈশ্বর লাভ হবে।'

মানসিক চাপমুক্ত

নচিকেতা যখন তার বাবার মুখ থেকে শুনল যে, বাবা তাকে যমরাজকে প্রদান করলেন, নচিকেতা তখনও বিচলিত হয়নি। সমাজে যমালয় একটি বিভীষিকার স্থান বলে চিহ্নিত হলেও নচিকেতার সেই স্থান যেতে হবে শুনে তার মানসিক সাম্যের কোনও পরিবর্তন হয়নি। নচিকেতার এই মানসিক সাম্য তার সকল উচ্চ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা থেকে এসেছে। এমনকি পিতা নচিকেতার যমালয়ে যাবার প্রাক্কালে নচিকেতা না যাক—এমনই ইচ্ছা প্রকাশ করলে, নচিকেতা বরং পূর্বপুরুষদের সত্যরক্ষার আদর্শটি উত্থাপন করে তার যমালয়ে যাওয়া উচিত বলে তুলে ধরেছে এবং যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। যমালয়ে গিয়ে যমরাজকে না পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় বা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েনি, বরং অনাহারে তিন দিন গৃহদ্বারের বাইরেই অপেক্ষা করেছে। তৃতীয় বর প্রার্থনাকালে যমরাজ আত্মজ্ঞান দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও নচিকেতা তার মনের ভারসাম্য বা দৃঢ়তা বজায় রেখেছে।

যমরাজ নচিকেতাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করতে চাইলেও নচিকেতার মন প্রলোভনের জোয়ারে ভেসে যায়নি, বরং তার আত্মজ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা দৃঢ় হয়ে থেকেছে, এবং পরিশেষে সে আত্মজ্ঞান লাভ করেছে।

আজকের দিনে সমাজ জীবনে আমরা প্রায়ই মানসিক চাপজনিত সমস্যার কথা শুনে থাকি, নচিকেতা তাদের সামনে সেই চাপ অতিক্রমের একটি জীবন্ত উদাহরণ। বয়সে নবীন হলেও নচিকেতা উচ্চভাব বা আদর্শের প্রতি যে শ্রদ্ধার ভাব দেখিয়েছে তাই তা সকল প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তাকে মানসিক চাপমুক্ত তো করেছেই, বরং তাকে মানসিক স্থিতবস্থা ও উচ্চ আদর্শের পথে চলার শক্তি জুগিয়েছে। তাই বর্তমানে শিক্ষার্থী থেকে সমাজের যে-কোন অঙ্গনে বিরাজমান ব্যক্তি মানসিক চাপ অতিক্রমের জন্য নচিকেতার জীবনে সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান পাবেন।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়ার ১৯৮৩ সালের প্রাক্তন ছাত্র। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়ার প্রাক্তন উপপ্রধান শিক্ষক। বর্তমানে তিনি বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিস্টেন্স এডুকেশনে কর্মরত।

যে- দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত।

—স্বামী বিবেকানন্দ

Evolve Yourself to God

Swami Dhyeyananda

All of us being part of the creation want prosperity, peace and security in life. We have to accept that GOD is the sole powerful entity in the creation, God has become everything, God is doing everything, and only God exists. God is the only doer, rest is Maya, illusion, wrong perception/understanding. Hence to have prosperity, peace and security we have to depend only on GOD, we have to be truly religious, we must be true to the God dwelling within us. DO WE BELIEVE THAT GOD RESIDES WITHIN US? ARE WE AWARE OF THE PRESENCE OF GOD WITHIN US? DO WE RECOGNIZE (REMEMBER ALWAYS) THAT WE ARE GOD? This understanding/conviction on our inherent divinity is reflected in our personal as well as professional life. Swamiji said: "What else can make us miserable? The nature of the Soul is eternal bliss. What can make it sorrowful except ignorance, hallucination, delusion? All pain of the Soul is simply delusion… No life will be a failure; there is no such thing as failure in the universe. A hundred times man will hurt himself, a thousand times he will tumble, but in the end he will realise that he is God."

Most of the human beings have some divine qualities as well as animal instinct within them. Most of us have desire for worldly enjoyment, desire for name, fame and recognition, most of us are slave to anger, jealousy, hatred, worldly attachment, selfishness, etc. These are our human weaknesses/limitations because we are not aware of our inherent divinity. At the same time most of us have love, compassion, unselfishness, bliss, forgiveness, contentment within us, the qualities which come to the surface when the mind is in Swattik state. Our objective should be to manifest the divine qualities by transcending our human limitations, weaknesses. That is the only right aspiration, the only way to get peace. And the way to manifest the divine qualities within us is to do more good work, think more holy thoughts, love and serve others and pray whole heartedly for the wellbeing of others.

There are only two ways to get ceaseless bliss. One is MEDITATION and the other is UNSELFISHNESS, selfless love and service, love without any expectation or selfish motive, love for love's sake. We must worship GOD within us through meditation and outside through selfless love and service. OUR ENTIRE LIFE SHOULD BE DEDICATED TO THE WORSHIP OF GOD.

To be absorbed completely within is the traditional way to get peace. There is another way to get peace as prescribed by Swami Vivekananda is to give our entire

being completely for the welfare of the humanity. A combination is suggested for an average aspirant.

UNLESS WE COULD SEE GOD WITHIN EVERY HUMAN BEING AND ANIMAL, IT IS NEVER POSSIBLE TO SEE GOD IN THE TEMPLE. The same GOD dwells in every human being; hence the only way to get peace is through unselfish love and service. Anger, hatred, jealousy can never give us PEACE as those animal instincts result from the sense of multiplicity, when we fail to recognize the GOD dwelling within us also dwells in our enemy. Our slavery to the animal instincts within us will definitely result in mental agony and discomfort. Swamiji said: "Every being is the temple of the Most High; if you can see that, good, if not, spirituality has yet to come to you."

SELFISHNESS GIVES US PLEASURE, BUT UNSELFISHNESS GIVES US A HIGHER PLEASURE/BLISS. Selfishness gives us worldly pleasure and UNSELFISHNESS gives us divine bliss. If we are selfish we remain a limited human being, but unselfishness/expansion of heart helps us to transcend our human limitations and thus we evolve slowly to GOD. That is spirituality.

OUR PERSONALITY, OUR BEHAVIOR, OUR ATTITUDE, OUR INTERACTION WITH OTHERS, OUR TALK AND WORK DEPEND ONLY ON OUR INNER STATE OF MIND. Our mental purity is reflected in our personality, behavior and day-to-day work. Our sole objective is to be more and more pure mentally, to make our entire being more and more pure through continuous holy thoughts, noble deeds and also by becoming more prayerful/truly religious.

A leader or successful professional must always be full of ENERGY, full of INSPIRATION, full of BLISS, full of LOVE, full of RESILIENCE, full of SERENITY, full of SILENCE - WE SHOULD ALWAYS REMAIN FULL OF LIFE AND SPIRIT - that is religion, that is spirituality and that state of mind UNSHAKABLE SWEETNESS OF DISPOSITION results from manifestation of more and more divinity within us through meditation, self control, selfless love, prayer and service.

One of our major problems is our limitless worldly ambition which results from lack of clarity, wrong perception about the true purpose/aspiration of human life. Another problem is that we do not give much importance to meditation, contemplation, inwardness, self-introspection, and self-appraisal. To improve the quality of life, to be more successful in human life WE MUST HAVE REGULATED DISCIPLINED LIFE WITH MEDITATION, PRANAYAAM, RYTHMIC DEEP BREATHING, PHYSICAL EXERCISE, YOGASANA, READING HOLY BOOKS, CHANTING

HOLY NAMES, SINGING DEVOTIONAL SONGS along with our commitment to the workplace, family and society.

Meditation will help us to find out our limitations, meditation will help us to unfold the ocean of ENERGY, KNOWLEDGE, BLISS from the ATMAN within us. Meditation or Pranayaam is a must to have a life full of energy, inspiration and bliss. Swamiji said: "… call upon the sleeping soul and see how it awakes. Power will come, glory will come, goodness will come, purity will come, and everything that is excellent will come when this sleeping soul is roused to self-conscious activity."

We must have an attitude of service in our family and workplace. Our entire life must be dedicated to the love and service of GOD in the human body, worship of living GOD. Sister Nivedita wrote: "If the many and the One be indeed the same Reality, then it is not all modes of worship alone, but equally all modes of work, all modes of struggle, all modes of creation, which are paths of realisation. No distinction, henceforth, between sacred and secular. To labour is to pray. To conquer is to renounce. Life is itself religion."

WE MUST HAVE GOD/SPIRITUALITY AS FOUNDATION OF OUR PERSONAL LIFE, PROFESSIONAL LIFE AND FAMILY LIFE. That is the only way to have security in this ever changing worldly existence. We must put all our efforts to be pure every moment through holy words, holy thoughts and holy deeds and thus we must perceive, realize our identity with GOD, transcending our false identity as limited human being. That is the only way to attain perfect SECURITY and FREEDOM in human birth.

If we accept this ever changing existence to be true, then we must put all our efforts to please the Divine Mother, the sole cause of creation, sustenance and destruction of this ever changing universe. We must always remain connected to the Divine Mother, the eternal living consciousness realized in the pure heart of a Rishi, take the Divine Mother to our fold, establish a relationship with the Divine Mother as shown by Sri Ramakrishna. This is only possible when our identity as limited human being gets completely dissolved in the all-pervading consciousness, GOD, a state of perfect egolessness as shown by Sri Ramakrishna. Swami Vivekananda said, "… the Mother, is playing, and we are like dolls, Her helpers in this play. Here, She puts one now in the garb of a beggar, another moment in the garb of a king, the next moment in the garb of a saint, and again in the garb of a devil. We are putting on different garbs to help the Mother Spirit in Her play." We must seek help from the Divine Mother in all our efforts, initiatives, and enterprises. We must have a life of SURRENDER to the feet of Divine Mother and ACCEPTANCE of Her Divine Will.

It is better to put all our efforts to manifest our divinity, to evolve ourselves to GOD, otherwise we shall remain slave of our animal instincts. Hence the only practical solution is more meditation, more inwardness, more repetition of holy name, more pranayama & physical exercise and to remain always full of life and spirit. And if we continue to lead this disciplined spiritual life for many years we must grow to be the condensed fire of spirituality and we shall have the power to evolve the people associated with us to GOD through our spirituality. UNTIL AND UNLESS WE ARE ABLE TO SUCK POISON FROM THIS WORLD WE SHALL NOT BE EVOLVED TO SHIVA!!!

We are not truly religious till we can love everyone on Earth as our own. Our love in GOD is not complete, we are yet to attain perfection until we could embrace everyone on Earth as our own. Rationalize the ideal. Feel the ideal in the heart of your heart and then evolve yourself to the ideal to make the human birth successful. Dedicate yourself completely in the worship of living GOD within and without and thus realize the ideal - EVOLVE YOURSELF TO GOD.

Author is an Ex-student of 1985. Presently he is Principal, Ramakrishna Mission Shilpapith, Belghoria.

"Neither numbers nor powers nor wealth nor learning nor eloquence nor anything else will prevail, but purity, living the life, in one word, anubhuti, realisation. Let there be a dozen such lion-souls in each country, lions who have broken their own bonds, who have touched the Infinite, whose whole soul is gone to Brahman, who care neither for wealth nor power nor fame, and these will be enough to shake the world."

-- Swami Vivekananda

শিক্ষকের কলম

প্রিয় অভী

(বিদ্যাপীঠের জন্মকথা ও আরও কিছু)

শক্তিপ্রসাদ মিশ্র

বিদ্যাপীঠ
১৫.৯.১৫

প্রিয় অভী,

বেশ কিছুদিন ধরে লিখব লিখব করে লেখাটা থেমেছিল। তারপর পরপর পূজনীয় সেক্রেটারী মহারাজ ও হেডমাস্টার মহারাজের জোর তাড়ায়, ৪৮ ঘন্টার মধ্যেই জন্ম নিল 'বিদ্যাপীঠের জন্মকথা'। লেখাটা পাঠাচ্ছি, সঙ্গে আরও কিছু।

শ্মশানের বুকে

স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী তখন দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক। সেই আশ্রমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৫৬ সালের ১ আগস্ট। ১৯৫৭-র বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব ড. ডি. এম. সেনকে। ড. সেন তাঁর পূর্ব পরিচিত। তিনি যখন বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন এর সম্পাদক, তখন ড. সেন সপরিবারে আশ্রমের অতিথিনিবাসে এক রাত্রি কাটান। তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বড় আমলা। যাইহোক, পুরস্কার-বিতরণী সভা শেষে হিরন্ময়ানন্দজী ড. সেনকে দেওঘর বিদ্যাপীঠের আর্থিক সংকটের কথা বললেন। সরকারী অনুদান তখন প্রায় বন্ধ। সব শুনে ড. সেন বললেন, ''দেখুন, এই স্কুলকে আমরা কোনো অনুদান দিতে পারি না। এটি বেঙ্গল বোর্ডের আন্ডারে নয়। আমার প্রস্তাব, দেওঘর বিদ্যাপীঠ ফিডার ইনস্টিটিউশন হিসাবে থাকুক, আর আপনি IX, X ও XI কে নিয়ে পুরুলিয়াতে একটা ইনস্টিটিউশন করুন। আমরা যথেষ্ট টাকা দিতে পারব। যা চাইবেন তাই দেব।''

কেন পুরুলিয়া? ১৯৫৬ সালে মানভূম জেলার অনেকখানি অংশ বিহার থেকে চলে এলো পশ্চিমবাংলায়। গড়ে উঠল পুরুলিয়া জেলা। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের বিরাট স্বপ্ন পুরুলিয়াকে ঘিরে। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন পুরুলিয়াতে স্থাপিত হবে আবাসিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বি. টি. কলেজ, মহিলাদের জন্য ডিগ্রি কলেজ, পলিটেকনিক, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, মিনি স্টিল ও সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ইত্যাদি। স্বামী হিরন্ময়ানন্দজীর বহু চেষ্টায় বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ, পুরুলিয়ায় আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তুলতে রাজি হন। ড. ডি. এম. সেন, জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শ্রী গিরিজা মজুমদার প্রমুখের সঙ্গে হিরন্ময়ানন্দজী বেরোলেন উপযুক্ত স্থান নির্বাচনে। প্রায় ২৪টি জায়গা দেখার পর তিনি বেছে নিলেন বোঙাবাড়িতে বরাকর রোডের ধারে বর্তমান বিদ্যাপীঠের আদিভূমিকে। বরাকর রোডের ধারে ঈঙ্গ-মার্কিন মিলিটারি ব্যারাকের ভগ্নস্তূপ আর আম-অর্জুন গাছের বিপুল সমারোহ—এটাই ছিল রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের আদিরূপ। বোঙাবাড়ি মৌজার জমিটি বেছে নেওয়ার প্রধান কারণ বেশ কয়েকটি বাঁধানো কুয়োতে জল পাওয়া গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কুয়োগুলো তৈরি হয়েছিল ব্যারাকের সেনাদের জন্য।

এবার স্বপ্ন-রূপায়ণ। ভাড়া নেওয়া হল পুরুলিয়া স্টেশন থেকে মাইল দেড়েক দূরে নডিহা পাড়ায় চাইবাসা রোডের উপর একটি দোতলা বাড়ি। বাড়ির মালিক কৃষ্ণপদ রায়। ১৯৫৭ সালের ২০ মে ভাড়াবাড়িতে এলেন হিরন্ময়ানন্দজী। তখনও তিনি দেওঘর বিদ্যাপীঠের সম্পাদক। সঙ্গে এলেন স্বামী প্রমথানন্দজী, স্বামী অমূর্ত্তানন্দজী ও দেওঘর বিদ্যাপীঠের ছাত্র-গায়ক শ্রী সুনীল রক্ষিত।

পরদিন স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী সদলবলে বোঙাবাড়ির জমিটি দেখে এলেন। ভাড়া বাড়িটিই ছিল রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অস্থায়ী ঠিকানা। সারাদিন কাজকর্ম সেরে তাঁরা ফিরে আসতেন সন্ধ্যারতি, পাঠ ও রামনাম সংকীর্তনের জন্য। সরকারিভাবে বোঙাবাড়ির ৬৮ একর জমি বিদ্যাপীঠ তথা বেলুড় মঠের হাতে এল ১৯৫৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। ১৪ অক্টোবর ভূমিপূজা করলেন বেলুড় মঠের ট্রাস্টী ও ম্যানেজার শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ। এ দিনই বেলা ১২টা ২৪ মিনিটে তিনি এবং শিক্ষাসচিব ড. সেন বিদ্যাপীঠের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন বেলুড় মঠ ও দেওঘর বিদ্যাপীঠ থেকে আসা বহু সন্ন্যাসী। বিকালে একটি সভা অনুষ্ঠিত হল। বহু সরকারি অফিসার, শহরের বিশিষ্ট মানুষ ও গ্রামবাসীর উপস্থিতিতে পল্টন-পরিত্যক্ত রুক্ষ্ম প্রান্তর উৎসব-মুখর হল। সভাশেষে সবাইকে জিলাপী ও লাড্ডু বিতরণ করা হল।

যাত্রা শুরু

কর্মযজ্ঞের প্রাথমিক পর্বে সরকার থেকে সাড়ে চার লক্ষ টাকা পাওয়া গেল। মিলিটারি ব্যারাকের ধ্বংসপ্রায় দেওয়ালগুলি মেরামত করে টিনের চালা লাগিয়ে মোটামুটি বাসযোগ্য করা হল। সেই মিলিটারি নিবাসের এক অংশ হয়ে গেল সাধুনিবাস আর এক অংশ অর্থাৎ বর্তমান গেস্ট হাউসের একটু আগে শেষ হওয়া শেষ ঘরটি ঠাকুর ঘর। ১৯৫৮র ৮ ফেব্রুয়ারী নডিহার ভাড়াবাড়ি ছেড়ে স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী সন্ন্যাসী ও অসন্ন্যাসী সহ বর্তমান বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে প্রথম রাত্রিযাপন করলেন। রূপান্তরিত সাধুনিবাসের একটি ঘরে স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী আর অন্য রুমগুলিতে স্বামী প্রমথানন্দজী, স্বামী অতন্দ্রানন্দজী, স্বামী অমূর্ত্তানন্দজী, স্বামী মহাবীরানন্দজী প্রমুখ। গোপাল মহারাজ অর্থাৎ মহাবীরানন্দজী ছিলেন কনস্ট্রাকশন-ইন-চার্জ। ক্যাশ সামলাতেন অতন্দ্রানন্দজী আর ছেলেদের অ্যাকাউন্টস্ দেখতেন অমূর্ত্তানন্দজী। অবশ্য ছেলেরা আসার পর।

বিদ্যাপীঠের প্রথম ছাত্র হিসাবে ভর্তি হলেন শ্রী ধ্রুব মার্জিত। পড়তেন শান্তিনিকেতনে। সেন্ট্রাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির উপ-অধিকর্তারূপে অবসর নিয়েছেন বছর কয়েক আগে। যাইহোক, কিছুদিন বাদে ৬ এপ্রিল দেওঘর বিদ্যাপীঠের ক্লাস নাইনে সদ্য উত্তীর্ণ ৩০ জন ছাত্রকে নিয়ে স্বামী প্রমথানন্দজী (পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষক ও তৃতীয় সম্পাদক) ও শারীর শিক্ষক শ্রী সুশীল ঘোষদা রওনা দিলেন পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের উদ্দেশে। বাস ছাড়ল সকাল ৬ টায়। রাস্তায় বিপত্তি। বাসের হর্ন কাজ করছিল না। ইঞ্জিন ভয়ঙ্কর গরম। গিরিডিতে পৌঁছতেই দুপুর ১২টা। লাঞ্চ হল বিদ্যাপীঠের ছাত্র শ্রীরথীন সাহানার বাড়িতে। মাঝে ফটো শেসন, বিশ্রাম। বাসের মধ্যেই ছাত্র-সেবক মণ্ডলীর নির্বাচন হল। প্রধান সেবক-এর দায়িত্ব পেল শ্রী আশিস রায়। ভোটাভুটিতে সমাজসেবা, খেলাধূলা, ভজন হল, ডাইনিং হল, আইনশৃঙ্খলা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সেবক নির্বাচিত হল। মজার বিষয়, ছাত্রসহ বিদ্যাপীঠের আগেই জন্ম নিল বিদ্যাপীঠের সেবক মণ্ডলী (স্টুডেন্টস্ ক্যাবিনেট)। অবশেষে আমাদের বিদ্যাপীঠে বাস পৌঁছল সন্ধ্যে ৬ টায়। হাসিমুখে বরণ করলেন বিদ্যাপীঠ-স্বপ্নের রূপকার স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী। পরের দিন অর্থাৎ ৭ এপ্রিল ৩১ জন ছাত্রকে নিয়ে শুরু হল ক্লাস। এখন যেখানে সভাবেদী সেই উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে, খোলা মাঠে। আম-অর্জুন-শাল-

সেগুন-এর মাঝখানে। প্রথম ক্লাস নিলেন বিদ্যাপীঠের প্রথম প্রধান শিক্ষক ব্রহ্মচারী করুণাচৈতন্য (সাতকড়ি মহারাজ)। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাইপস্। পড়াতেন পদার্থ বিদ্যা ও ইংরেজী। ছিলেন মাত্র ৮ মাস। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন স্বামী প্রমথানন্দজী। ১৯৫৯ জানুয়ারী মাস থেকে ১৯৬২-র মে মাস অবধি।

এবার প্রশ্ন ঃ দেওঘর থেকে সদ্য আসা ছাত্ররা থাকত কোথায়? ভজন ও ভোজন-ই বা কোথায় হত? শিক্ষক-কর্মীদাদারা থাকতেন কোথায়? কোথায় ছিল স্কুল অফিস?

এখন যেখানে মন্দির তার সামনে গুরুপল্লীমুখী পিচরাস্তা বরাবর একটু হাঁটলেই ডান দিকে পড়বে একটি গোডাউন। ছিল মিলিটারি ব্যারাক। মেরামত করে সেটি হল হলঘর—ছাত্রদের ভজন হল। আর লাগোয়া রুমটি কর্মীদাদাদের সাময়িক আস্তানা। চলতি কথায় বল হত ১নং টিনশেড্। ওই ভজন হল থেকে বেরিয়ে পূর্ব দিকে খানিক হেঁটে ছেলেরা পৌঁছে যেত তাদের হস্টেলে। হস্টেলটি ছিল এখন যেখানে কাঠের কাজ হয় সেই ২নং টিনশেড্টিতে। আদতে এটিও ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেনা-ব্যারাক। ছেলেদের ওয়ার্ডেন শারীর শিক্ষক শ্রী সুশীল ঘোষদা থাকতেন হস্টেলে একটি রুমে। এছাড়া ছিলেন বাংলার শিক্ষক কালীপদ সেনশর্মা ও ইংরেজীর শ্রী উষারঞ্জন সেন। এখন যেটি টেলারিং সেকশন সেটি ছিল স্কুল অফিস। হেডমাস্টার মহারাজ ওখানেই বসতেন। আর একটু এগিয়ে নতুন সাধু নিবাসের পশ্চিমদিকের শেষ প্রান্তে ছিল তিন নম্বর টিনশেড্। ঘরটির ব্যবহার ছিল টেক্নিক্যাল বিভাগের ওয়ার্কশপ্ রূপে। ছেলেদের ডাইনিং হল, কিচেন-এর কোন চিহ্নই এখন নেই। সেইগুলি ছিল বর্তমান বাস্কেট বল গ্রাউন্ডের পাশে, পূর্বদিকে—সেনা পরিত্যক্ত ছাউনিতে। সামনেই টালির ছাউনি দেওয়া বিবেকানন্দ নগর পোস্ট অফিস।

এখন যেখানে ড্রাইভারস্ কোয়ার্টার্স তার কাছে বড় আম গাছের পাশে একটি তাঁবু খাটানো ছিল। তাঁবুর ভিতরে ছোট্ট একটি টিনের ফ্রেমের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ফটো ছিল। প্রথম দেখেছিলেন প্রমথানন্দজী। যখন হিরন্ময়ানন্দজীর সঙ্গে নডিহার ভাড়া বাড়ি থেকে বিদ্যাপীঠের আদি ভূমিতে তিনি আসতেন জমি অধিগ্রহণের কাজে। তাঁবুটিতে নাকি একজন সাধু থাকতেন। মহারাজেরা অবশ্য কেউই দেখেননি তাঁকে। আশ্চর্য ব্যাপার, যেদিন প্রমথানন্দজী তাঁবুটিকে আবিষ্কার করলেন তার পরদিনই তাঁবু সহ সাধু উধাও। প্রমথানন্দজী মন্তব্য করেছিলেন : 'ঠাকুর তাহলে এখানে আগেই বসেছেন।' প্রসঙ্গত, প্রমথানন্দজী বিদ্যাপীঠের প্রথম চীফ্ ওয়ার্ডেন।

যাইহোক, আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ছেলেরা স্নান করত দুটি বড় বড় কুয়ো থেকে জল তুলে। কুয়োগুলি ছিল বর্তমান ইন্ডোর হসপিটালের কাছে। ব্রহ্মানন্দ সদনের একপ্রান্তে এখনও তার নিদর্শন রয়েছে। একদিন ছেলেরা স্নান করছে। দেখতে পেল, রেল লাইনের উপর একটি মাল গাড়ি হঠাৎ থেমে গেল। একজন লোক রেলের বগি থেকে চাঁই চাঁই কয়লা লাইনের ধারে ফেলতে শুরু করল। পাশে দাঁড়িয়ে কিছু লোক লাঠিতে টাকা বা পয়সা বেঁধে উঁচুতে তাকে দিচ্ছে। ছেলেরা অবাক হল। ঠিক করল, কিছু করতে হবে। তখন বিদ্যাপীঠের সীমানা-প্রাচীর ছিল না। রেল লাইন বেশ কাছেই। ছেলেরা প্রায় ভেজা মাথা আর খালি গা নিয়েই জমির আল টপকে ছুটতে লাগল। চীৎকার করে বলছে : চুরি করছো কেন? সরকারী জিনিস চুরি করছো কেন? ছেলেরা লাইনের ধারে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ইঞ্জিনটা চলে গেল। জড়ো হওয়া লোকেরাও পিছুটান দিল। ছাত্রেরা কয়লার চাঙড়গুলো জড়ো করে এক জায়গায় রাখলো। চীফ ওয়ার্ডেন প্রমথানন্দজী এলেন। ছেলেদের কাজের খুব প্রশংসা করলেন। হিরন্ময়ানন্দজীও বাহবা দিলেন। রেলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে কয়লার ব্যবস্থা হল।

আর একটি ঘটনার উল্লেখ করি। সামান্য কিন্তু সুদূরপ্রসারী ঘটনা। বিদ্যাপীঠের কিছু দূরে শুরুলিয়া গ্রাম। সেই গ্রামে একবার ভয়াবহ আগুন লাগে। কয়েকটি বাড়ি পুড়ে যায়। আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ছে।

গ্রামবাসীদের চীৎকার শুনে প্রমথানন্দজীর নেতৃত্বে কিছু ছেলে ও কন্‌স্ট্রাকশন্‌ কর্মীরা ছুটে যায়। মহারাজের অনুরোধে সাড়া দিয়ে পুরুলিয়ার স্টেশন মাস্টার একটি জলভর্তি ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে দেন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। কিছুদিন বাদে বোঙাবাড়িতেও একই ঘটনা ঘটে। একই ভাবে বিদ্যাপীঠ সাহায্য করে। বিদ্যাপীঠের সাহায্যের কথা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, স্থানীয় গ্রামবাসীরা বিদ্যাপীঠ সম্পর্কে তাদের ধারণা পাল্টায় এবং আশ্রমের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

বিদ্যাপীঠের শিল্পায়ণ

ইতোমধ্যে কর্মযজ্ঞ পুরোদমে চলছে। একসঙ্গে অনেকগুলো বাড়ি উঠছে এখানে ওখানে। কী যে হচ্ছে ছাত্রদের বোঝার উপায় নেই। ফলে, ওদের কৌতূহল প্রবল। মাঝে মধ্যে হিরন্ময়ানন্দজী ছাত্রদের তাঁর প্ল্যান বোঝাতেন—এটা স্কুল, ওটা হস্টেল, ওদিকে লাইব্রেরী ইত্যাদি। নীরবে সাধক প্রখ্যাত ভাস্কর শ্রী সুনীল পাল মহারাজের স্বপ্ন রূপায়ণ করে চলেছেন। দেখতে দেখতে তিল তিল সৌন্দর্যে-ভরা তিলোত্তমার মতো আত্মপ্রকাশ করল সারদা মন্দির—বিস্ময়কর স্কুলবাড়ি। উদ্বোধনের দিন-ক্ষণ ঠিক হল। ১৯৫৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর। উদ্বোধক পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায়। সারদা মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে দেবী সরস্বতীর মূর্তির দিকে দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। মুগ্ধবিস্ময় তাঁর চোখেমুখে। উদ্বোধন পর্ব শেষে সভা বসল সভাবেদীর উন্মুক্ত প্রান্তরে। ডঃ রায় তাঁর ভাষণে অন্ততঃ তিনটি উল্লেখযোগ্য কথা বললেন। প্রথমটি আবেগধর্মীঃ এই স্কুলের ছাত্র হতে আমার ইচ্ছে করছে। এত সুন্দর স্কুল বাড়ী। দ্বিতীয়টি, রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মদক্ষতা ও 'কর্মই ধর্ম'র তারিফ করে ঃ পুরুলিয়ার শুষ্ক মরুপ্রান্তরে এইভাবে শিক্ষার আলো জ্বালা ভগীরথের গঙ্গাকে বয়ে নিয়ে আসার মতোই। তৃতীয়টি, রামকৃষ্ণ মিশনের আর্থিক স্বচ্ছতা ও সৌন্দর্যবোধের ভূয়সী প্রশংসা করে ঃ সীমিত অর্থে কীভাবে এত বড় প্রকল্প, এত সুন্দর ভাবে রূপায়িত হতে পারে তার দৃষ্টান্ত রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ।

সারদা মন্দির ছাড়াও কলামন্দির, দৃষ্টিনন্দন প্রধান ফটক, দেবযান (সেন্ট্রাল অফিস), অডিটোরিয়াম, মূল মন্দির ইত্যাদির সমারোহে বিদ্যাপীঠকে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের এক নিখুঁত সংগ্রহশালা মনে হয়। বর্তমানের মতো ভবিষ্যৎ প্রজন্মও সুন্দরের দুই পূজারী স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী ও শ্রী সুনীল পালকে সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানাবে। মনে পড়ছে, বিদ্যাপীঠের সবচেয়ে দীর্ঘকালীন সম্পাদক স্বামী উমানন্দজীর একটি মন্তব্য। সুনীলদার কিছু ছাত্র-অনুরাগী মহারাজকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন বিদ্যাপীঠে তাদের স্যরের যে কীর্ত্তি-সম্ভার রয়েছে তা দেওয়ার জন্য, যা দিয়ে তারা কলকাতায় একটি প্রদর্শনী করতে চান। মহারাজের তাৎক্ষণিক উত্তর ঃ সুনীলবাবুর কীর্ত্তি সম্ভার? তাহলে তো ভাই গোটা বিদ্যাপীঠটাকেই তুলে নিয়ে যেতে হবে। স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী একবার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন ঃ 'সুনীলবাবু করেছেন, আর interpretation টা আমি করেছি'। অবশ্য, কোন কোন ক্ষেত্রে হিরন্ময়ানন্দজীর ভাব-ভাবনার শৈল্পিক প্রকাশ করেছেন সুনীলদা। যেমন দেবযান বা সেন্ট্রাল অফিস। হিরন্ময়ানন্দজীর নিজের কথায় ঃ ''আপিসটা আমি বলেছিলাম যে এরকম হলে ভাল হয়। সুনীলবাবু সেইরকম করেছেন। ওটা দেখতে রথের মতো, একটা গতি রয়েছে। ওটার কারণ হচ্ছে যে, দুরকম ভাবে কাজ করা যায়। একটা কাজ হচ্ছে সকাম কর্ম, আর একটা নিষ্কাম কর্ম। আমরা নিষ্কাম কর্ম করছি, তাই তার গতি ব্রহ্মলোকের দিকে।''

শুরু থেকে আজ অবধি অনেকেই বিস্মিত হন বিদ্যাপীঠের মূল মন্দির দেখে। এককথায় অনন্য। এই অবাক করা স্থাপত্যের কী ব্যাখ্যা? হিরন্ময়ানন্দজীর উত্তর ঃ 'ঠাকুরের জীবনে কোনো বাঁকা চোরা নেই। সব straight. তাই তাঁর মন্দিরও straight লাইন এ, সব সোজা। কোনো বাঁকা চোরা নেই।'

কিছুক্ষণ আগে সারদা-মন্দিরের উদ্বোধন প্রসঙ্গ হচ্ছিল। আর বিবেক মন্দির? বিবেক মন্দির অর্থাৎ জুনিয়র সেকশনের স্কুল বাড়ির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন রাজ্যের তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ। ১৯৬৪ সালের ২১ শে নভেম্বর। অবশ্য, বিদ্যাপীঠে চতুর্থ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু হয় বছরের গোড়াতেই অর্থাৎ ১৯৬৪-র জানুয়ারী মাস থেকেই। নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণিতো জন্মলগ্ন থেকেই ছিল। বিবেক মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দশম সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ১৯৬৬ সালের ১১ এপ্রিল। উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ট্রাস্টী এবং বেলুড় মঠের ম্যানেজার স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ (ভরত মহারাজ) ও অন্যতম ট্রাস্টী স্বামী দয়ানন্দজী মহারাজ। বিবেক মন্দির প্রতিষ্ঠার অল্পকাল পরেই অর্থাৎ ১৯৬৬র ২৩শে জুলাই বিদ্যাপীঠের রূপকার স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী বিদ্যাপীঠ ত্যাগ করে রওনা হন বোম্বাই রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশে। মনে পড়ছে, মহারাজ একটি কথা প্রায়ই বলতেন ঃ If I have created Vidyapith, it will perish. If Sri Ramakrishna has created Vidyapith, it will flourish. তাঁর গভীর বিশ্বাস ছিল, বিদ্যাপীঠের সৃষ্টি ঈশ্বরের ইচ্ছায়।

ম্যানমেকিং এডুকেশন

এবার আলোচনা করা যাক বিদ্যাপীঠের বৈশিষ্ট্য ও রীতিনীতি নিয়ে। দেখ অভী, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্য ও রীতিনীতির স্বতন্ত্রতা রয়েছে, যদিও মূল লক্ষ্য ও আদর্শের বুনিয়াদ এক। নরেন্দ্রপুর নরেন্দ্রপুরের ধারা বজায় রেখে সাফল্য পেয়েছে, আর পুরুলিয়া পুরুলিয়ার। আর ডে স্কুল ও আবাসিক বিদ্যালয়ের আঙ্গিক ও আভ্যন্তরীণ পার্থক্য তো অনেকটাই। নিজের উপলব্ধির কথা না বলে, বরং স্বামী হিরন্ময়ানন্দজীর একটি চিঠির অংশ তুলে ধরি। কোন এক ভদ্রলোকের চিঠির উত্তরে ১৯৭৩ সালে পূজনীয় মহারাজ লিখছেন ঃ ''আবাসিক কেন্দ্র হবে গুরুগৃহের মতো—যেখানে কেন্দ্রের প্রধান আদর্শ জীবন যাপন করবেন এবং সেখানকার কর্মী ও ছাত্ররা তাঁকে দেখে অনুপ্রেরণা পাবে। এই কারণেই বিদ্যাপীঠ সম্পাদক দ্বারা পরিচালনার কেন্দ্র। যদি ব্যবস্থাতে গোলমাল দেখা যায়, তবে তা প্রধানত মানুষের ভুলের জন্যই হবে।''

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যাপীঠ কক্ষনো কঠোর, পোষাকী আইনকানুন ও শাসন-নীতি নির্ভর নয়। বিদ্যাপীঠের সাফল্যের চাবিকাঠি পারস্পরিক ভালোবাসা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা। ছাত্রদের দৃষ্টিতে ও সম্বোধনে শিক্ষকরা দাদা। পূজনীয় প্রমথানন্দজী, চন্দ্রানন্দজী, পূতানন্দজী কিংবা আরও পরে আত্মপ্রভানন্দজী, শিবপ্রদানন্দজী—সবাই ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের কাছেই ধীরেনদা, চন্দনদা, কালিপদদা, শুভঙ্করদা, সৈকতেশদা। ভালবাসা-অস্ত্র দিয়ে শাসন পদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী। নিখাদ খাঁটি ভালবাসাই হল শ্রেষ্ঠ শাসন। তিনি বলতেন ঃ 'ছেলেরা তাদের বাবা মাকে ছেড়ে কতদূরে তোমাদের কাছে এসেছে। তোমরা সবাই মিলে যদি তাদের বকো, তাদের কত কষ্ট!'' তিনি ছাত্রদের শিশু-চারাগাছের সঙ্গে তুলনা করতেন। শিক্ষক, ওয়ার্ডেন—সবাই মালী। তাদের কাজ শিশু-চারাগাছের পরিচর্যা করা, চাবুক মেরে ডাল-পালা ভেঙে দেওয়া নয়। ডাল-পালাগুলো যেদিকে ইচ্ছা শাখা মেলেই তো ছুটতে চায়, আত্মপ্রকাশ করে। হিরন্ময়ানন্দজীর স্বপ্ন ছিল বিদ্যাপীঠ থেকে অভী মন্ত্র ছড়িয়ে দিতে হবে দিকে দিকে।

আর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। দেখ অভী, ক্লাসে পড়ানো তো কম-বেশী সব স্কুলেই হয় বিদ্যাপীঠের বৈশিষ্ট্য এটি ১০-৫ টার স্কুল নয় যেখানে শিক্ষক ছাত্রকে কেবল নীরস তথ্য সরবরাহ করেন। আমাদের বিদ্যাপীঠে, আনন্দের উৎস সন্ধানে বিশেষ প্রচেষ্টা রয়েছে। সচেতন ভাবে শিক্ষার্থীর জন্য সেই শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে যে শিক্ষা পেলে বৌদ্ধিক ও মানসিক ক্লান্তি আসে না, সমগ্র জীবন সুখময় হয়, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভূত হয়, দৃঢ় চরিত্র, নিঃস্বার্থপর ও সেবাপরায়ণ হতে পারা যায়। এটি কিন্তু কথার কথা নয়। এখানে ছাত্রেরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বহুমুখী প্রশিক্ষণে নিয়োজিত থাকে। ছবি আঁকা, গান গাওয়া, অভিনয়, বক্তৃতা, বিতর্ক ইত্যাদির গুরুত্ব আর পাঁচটা বিদ্যালয় থেকে এখানে অনেক অনেক বেশী। তাছাড়া, ছাত্রাবাসে ইন্টার ব্লক কালচারাল কম্‌পিটিশন, ছোট-বড় নানা অনুষ্ঠান তো আছেই। আর একটি বিষয় তুমি লক্ষ্য করবে, প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা ও নান্দনিক চেতনার উদ্বোধন যাতে ছাত্রদের মধ্যে হয় তার জন্য বিদ্যাপীঠ উষালগ্ন থেকেই বিশেষ সচেতন। বিদ্যাপীঠের খোলামেলা পরিবেশ, দেওয়ালে দেওয়ালে প্রাচীর চিত্র, রিলিফ, মিনিয়েচার থেকে শুরু করে বিদ্যাপীঠের বিভিন্ন প্রান্তে ভাস্কর্যমূর্তি, মিউজিয়ামে সুরক্ষিত বহুমূল্য শিল্পসম্পদ, স্কুলের সময়ের বাইরেও খোলা থাকা গ্রন্থাগার, বুধবারের হবি ক্লাস, ছাত্রাবাসে নানা অনুষ্ঠান সেই প্রয়াসেরই অঙ্গ। আর কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তুমি দেখতে পাবে ডজন, ডজন ময়ূর-এর নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ানো, এত হরিণ, রঙীন পাখির উপস্থিতি, শুনতে পাবে হাজারো পাখির কলতান? আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় তা হল এখানে শারীর শিক্ষা, বৃত্তিমুখী শিক্ষা বা কর্মশিক্ষার চমৎকার মিশেল, যা পুঁথিগত শিক্ষাকেও সমৃদ্ধ করে।

বিদ্যাপীঠ সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর একটি কারণে। এখানে জাত-পাত, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি ভেদাভেদের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি। দশম-দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রেরা ডাইনিং হল কর্মী বা সাফাই কর্মী দাদাদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে—এ দৃশ্য বিদ্যাপীঠ-আবাসিকদের বিন্দুমাত্র বিস্মিত করে না। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও, বিহার, ঝাড়খণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশ থেকে আসা ছাত্রদের একটিই পরিচয় 'বিদ্যাপীঠের ছাত্র'। ভারতীয় সংস্কৃতির 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য' রূপটির এক ঝলক বিদ্যাপীঠে বর্তমান।

আর একটি বৈশিষ্ট্য যা বিদ্যাপীঠের একান্ত নিজস্ব তা হল ছাত্রাবাসে সকাল ও সন্ধ্যের পড়াশোনা শুরু হয় স্টাডিহলে 'চ্যান্টিং' এর মধ্য দিয়ে। সপ্তাহে সাতদিন সংস্কৃতের নানা স্তোত্র সুর করে আবৃত্তি করে ছাত্রেরা। আশির দশকের শেষের দিকে শুরু এই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে বিদ্যাপীঠে। বিদ্যাপীঠ ছেড়ে যাওয়ার বহু বছর পরও ছাত্রেরা বিশেষ ভাবে স্মরণ করে 'নির্বাণষট্‌কম্' (মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার চিত্তানি না) ও 'শ্রীশারদাস্তোত্রম্ (শ্রুতি নাম গম্যে সুবেদাগমজ্ঞা)। স্তোত্রের স্ক্রিপ্ট পাঠানোর অনুরোধ করে। স্তোত্রগুলি ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ব্যবহার করে। বলাই বাহুল্য সংস্কৃত গানের মধ্য দিয়ে পড়াশোনার অনুকূল পরিবেশ তৈরী হয়। ছাত্রদের চঞ্চল মন সহজে শান্ত হয়। সারদা মন্দিরে ও বিবেক মন্দিরে একাধিক সাধু ও শিক্ষক ক্লাস শুরু করেন গায়ত্রী মন্ত্র বা শান্তি মন্ত্রের সমবেত আবৃত্তির পর। ছাত্রদের দেখা যাবে চোখ বন্ধ করে মন সংযম করতে। এসবের উদ্দেশ্য জো-সো করে চঞ্চল মনকে নিয়ন্ত্রিত করা। স্বামী বিবেকানন্দ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার কঠোর সমালোচক ছিলেন। তিনি বলতেন, চলতি শিক্ষাপদ্ধতিতে চিন্তা করতে শিখবার আগেই কতকগুলি ঘটনা দ্বারা মন ভরে দেওয়া হয়। "প্রথম শিক্ষা হওয়া উচিত—মনকে বশে আনা। মন সংযত করতে পারে না বলেই শিখতে অত সময় লাগে। মেকলের ইংল্যান্ডের ইতিহাস আমি তিনবার পরে মুখস্থ করি। কিন্তু আমার মা যে কোন ধর্মগ্রন্থ ইচ্ছামতো একবার পড়েই মুখস্থ করতে পারতেন।" লেট নাইট স্টাডির শুরুতে

বা শেষে স্বামীজীর বাণী থেকে পাঠ ও ধ্যানের ধারা বিদ্যাপীঠে আজও অব্যাহত। বহু ছাত্রকে দেখা যায়, স্নানের পর ঠাকুর ঘরে পুণ্যত্রয়ীর কাছে নীরব প্রার্থনা করতে। এগুলি বিদ্যাপীঠের বিশেষত্ব। এছাড়াও, ছাত্রবাসে 'বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কল' এর সাপ্তাহিক আসরে সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ের চর্চা বিদ্যাপীঠের নিজস্ব।

এবার দু-চার কথা বিদ্যাপীঠের সাফল্য নিয়ে। প্রথমে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকে আমাদের সাফল্য তুলে ধরি। বিদ্যাপীঠের প্রথম হায়ার সেকেন্ডারী ব্যাচ বেরোয় ১৯৬১-তে। তখন ইলেভেন ক্লাস হায়ার সেকেন্ডারী। প্রথম বছর পরীক্ষার ফলাফল আহামরি ছিল না। ১৯৬৩-তে টেক্‌নিক্যাল বিভাগের শ্রী তপোময় সান্যাল রাজ্য মেধা তালিকায় ৬ষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। সেই শুরু, তারপর থেকে ১৯৭৯ আর ১৯৮০ বাদ দিলে বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা ১৯৯৭ সাল অবধি লাগাতার মেধা তালিকাভুক্ত হয়েছে। তবে, ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৬ সাল অবধি টেক্‌নিক্যাল বিভাগের ছাত্ররাই সর্বাধিক ২১টি স্থান দখল করে। এরপর কৃষি বিভাগের ১৩ জন ও ফাইন আর্টস্ শাখার ৫ জন রাজ্য মেধা তালিকায় স্থান করে নেয়। সব বিভাগ মিলিয়ে বিজ্ঞানের ছাত্র শ্রী কালীপ্রসন্ন ধাড়া সারা পশ্চিমবঙ্গে চতুর্থ স্থান দখল করেন। ১৯৭৬ সাল অবধি বিজ্ঞান বিভাগে বিদ্যাপীঠের ওটিই একমাত্র বড় সাফল্য। হিউম্যানিটিস বিভাগে প্রথম সাফল্যের মুখ দেখে ১৯৭৬ সালেই। শ্রী অম্বরনাথ ঘোষ তৃতীয় ও শ্রীসোমেশলাল মুখার্জী দশম স্থান অর্জন করেন। ঐ বছরেই পুরোন পদ্ধতির পরিবর্তে পশ্চিমবঙ্গে 10 + 2 সিস্টেম চালু হয়। নূতন মাধ্যমিকের দ্বিতীয় ব্যাচ ১৯৭৭ বিদ্যাপীঠকে ৬ষ্ঠ স্থান উপহার দেয়। পরের বছর ৪টি। মাধ্যমিকে প্রথম সবচেয়ে বড় সাফল্য ১৯৮৫-তে। ৬ জন ছাত্র রাজ্য মেধাতালিকাভুক্ত হওয়া ছাড়াও, ৯৯ জনের প্রত্যেকেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয় এবং গড় নম্বর ৮০ শতাংশ যা ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। উল্লেখযোগ্য, ১৯৮৪, ১৯৯০, ১৯৯১, ১৯৯২তে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষায় বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা প্রথম স্থান অধিকার করে। দ্বিতীয় স্থান দখল করে পাঁচ বার। ১৯৯০ ও ১৯৯৩-তে মেধা তালিকায় প্রথম ২০ জনের মধ্যে বিদ্যাপীঠেরই ছিল ৯ জন। উভয় ব্যাচেই প্রথম ১০-এ ৬ জনই বিদ্যাপীঠের। বিশেষ উল্লেখ্য ১৯৯০-র ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, দশম, একাদশ, দ্বাদশ এবং দ্বাদশ স্থান অর্জন। ১৯৯৩-র মেধা তালিকায় দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও সপ্তদশ স্থানাধিকারী বিদ্যাপীঠের ছাত্র। সেই বছর গড় নম্বর ৮৪ শতাংশ। ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৬ অবধি পুরোন H.S. ৪২ জন আর ১৯৭৭ থেকে ২০১৪ অবধি মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮৫ জন রাজ্য মেধা তালিকাভুক্ত হয়। নূতন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম বছরেই অর্থাৎ ২০০২-তে ষোড়শ স্থান অধিকার করে অবন চৌধুরী। সে মাধ্যমিকেও ৮ম স্থান দখল করেছিল। তাছাড়া, সর্বভারতীয় আই. আই. টি, আই. এস. আই, সি এম আই, ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স-এ ভর্তি পরীক্ষায় বিদ্যাপীঠের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। ২০০৫ ও ২০১৫র ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল জয়েন্ট এন্ট্রান্স-এ বিদ্যাপীঠের বড় সাফল্য ২১তম স্থান অর্জন।

সর্বভারতীয় বিজ্ঞান সেমিনারে, প্রবন্ধ রচনায়, বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় এবং রাজ্যভিত্তিক বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করেছে। খেলাধূলোয় বিদ্যাপীঠের সাফল্য বলার মতো। ১৯৮৮ সালে ফুটবলে জুনিয়র মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করা বিদ্যাপীঠের বড় সাফল্য। দু-বছর পর ১৯৯০-তে বিদ্যাপীঠের কাছে CAB-র জুনিয়র ক্রিকেট টিমের পরাজয় রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। প্রসঙ্গতঃ, CAB-র ওই টিমের বেশ কয়েকজন পরবর্তীকালে রাজ্যের রঞ্জি ক্রিকেট দলে স্থান করে নিয়েছিলো।

শিশুকল্যাণে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯২-'৯৩ এর রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করে বিদ্যাপীঠ। ১৯৮০ ও ২০০২-তে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছেন যথাক্রমে দেবকুমারদা [ডঃ দেবকুমার চক্রবর্তী (ইতিহাস

বিভাগ] ও শ্রী হরিশঙ্কর মল্লিকদা (গণিত বিভাগ)। এছাড়াও, ১৯৮৯ সালে উপরাষ্ট্রপতির কাছ থেকে 'শিক্ষক পুরস্কার' ও ২একাদশ শতাব্দীর প্রথম বছরে দশম উপরাষ্ট্রপতির হাত থেকে 'সাক্ষরতা' সংক্রান্ত রচনায় প্রথম পুরস্কার লাভ করেছেন বিদ্যাপীঠের ইংরাজী বিভাগের জনৈক শিক্ষক। স্বভাব-লাজুক তিনি তার নাম অনুল্লেখের অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিদ্যাপীঠের বিশেষ গর্ব প্রাক্তনীদের নিয়ে। তারা নিজের নিজের কর্মক্ষেত্রে আদর্শ স্থানীয়। প্রলোভন ও ভয়কে জয় করা, তাদের ভদ্র মূল্যবোধ, সততা, কর্মনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থপরতা ও সেবাপরায়ণতার বহু ঘটনা কানে আসে। গর্ব হয়। বেশ কিছু প্রাক্তন ছাত্র NGO-র মাধ্যমে সমাজ সেবায় যুক্ত। সম্পূর্ণ ত্যাগের জীবন বেছে নিয়ে পবিত্র রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগ দিয়েছেন ১১ জন প্রাক্তন ছাত্র। তাঁরা ও আমরা—উভয়ই ধন্য। বেশ কিছু প্রাক্তনী দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের সফল শিক্ষক। কৃতী বৈজ্ঞানিক, প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ইঞ্জীনিয়ার, সাংবাদিক-এর সংখ্যা প্রচুর। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সফল আই. এ. এস, আই. এফ. এস ও আই. পি. এস অফিসারও রয়েছে। হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি (অস্থায়ী) ও বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রী পিনাকী ঘোষ বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র। ১৯৮০-র মৃগাঙ্ক মাহাতো পুরুলিয়ার সাংসদ। ১৯৮৭-র মাধ্যমিকে ষষ্ঠ স্থানাধিকারী শ্রী সোমনাথ ঘোষ মঙ্গোলিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত। ১৯৮৮-র ডঃ সন্দীপ বসু ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার লাভ করেছে। বিদ্যাপীঠের আর এক প্রাক্তনী ১৯৭৮-র মাধ্যমিকে চতুর্থ স্থানাধিকারী শ্রী সঞ্জয় পাল আমেরিকার বিখ্যাত টমাস আলভা এডিসন পুরস্কার পেয়েছে ২০১৩ সালে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে আরও বহু প্রাক্তন ছাত্র রয়েছে যাদের বিশেষ কৃতিত্বের সঠিক খবর এই লেখা শেষ হওয়া অবধি অজানা।

চিঠিটা বড্ড বড় হয়ে যাচ্ছে। এবার থামতেই হবে। ভাতৃপ্রতিম দেবাশিসের email debasisghosh@live.com.-এ পাঠাচ্ছি। ভবিষ্যতে বিদ্যাপীঠের আদি কথা ও বেড়ে ওঠা নিয়ে লেখা যেতে পারে। আজ এখানেই। ২১শে নভেম্বর দেখা হবে তো? ভালো থেকো। ভাল রেখো।

অনেক অনেক ভালবাসাসহ—

ইতি

শক্তিদা

* কৃতজ্ঞতা জানাই যাদের স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার, ডায়েরী প্রদত্ত তথ্য ও নানা সহায়তার ভিত্তিতে লেখাটি রচিত হয়েছে ঃ

শ্রীমৎ স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী প্রমথানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী সুহিতানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী পূতানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী উমানন্দজী মহারাজ, শ্রী সুশীল ঘোষদা, শ্রী কৃষ্ণপদ বেরাদা, শ্রী সুব্রত মুখার্জীদা, ডঃ ধ্রুব মার্জিত, শ্রী নিমাই চাঁদ দে, শ্রী সঞ্জয় চ্যাটার্জী, শ্রী মানস সরকার ও স্বামী হৃষীকেষানন্দজী মহারাজ।

লেখক বিদ্যাপীঠের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক। দূরভাষ : 9153058066 /9933465366

Dr. A. P. J Abdul Kalam : The Ratna of Mother India

Md. Anwarul Haque

"You have to dream before your dreams become true." but he believed that.....

"A dream is not that which you see while sleeping,
dream is that which does not allow one to sleep."

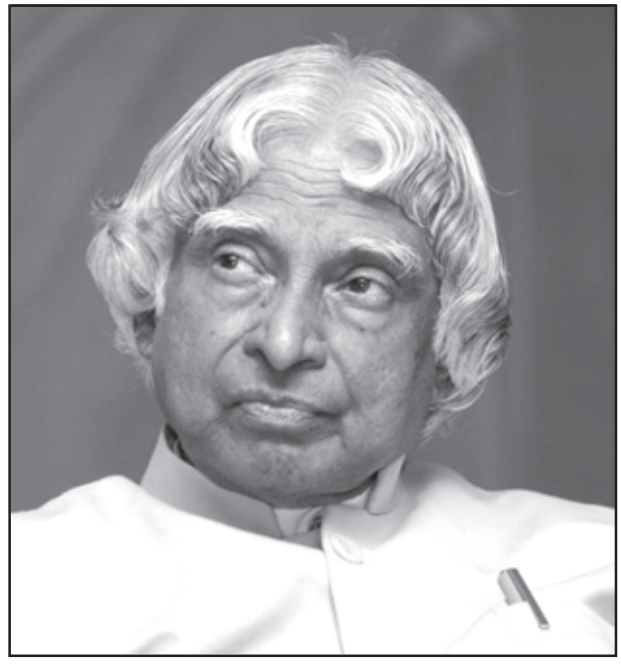

These are the lofty ideas and visions of Dr. Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam. He was born on 15th Oct. 1931 in Rameswaram, Tamil Nadu into a middle-class family. His father, Jainulabdeen was an Imam (priest in mosque). He owned boats and rented them out to fishermen. His mother, Ashima, was a noble and holy house-wife. Kalam, in his childhood, worked as a newspaper seller to contribute to his father's meagre income. He was admitted to Schwartz Matriculation School in Ramanathapuram and graduated in Physics from Saint Joseph's College, Tiruchirappalli, in 1954 and later attended Madras Institute of Technology (MIT) to study acrospace engineering in 1955.

He started his career by joining the Defence Research and Development Organisation (DRDO) as a scientist in 1960. He disclosed his hidden ability by designing a small helicopter for the Army. In 1969, he was transferred to the Indian Space

Research Organisation (ISRO). By the dint of hard labour, he became the project directer of India's first Satellite Launch Vehicle, which later put the Rohini Satellite in near-earth orbit in July 1980. His involvement as the head of the Integrated Guided Missile Development Program (IGMDP) made the country security with the impressive portfolio of missiles developed as part of the programme, which earned him the sobriquet 'missile man of India'. He was determined that ''unless India stands up to the World, no one will respect us, strength respects strength.'' Meanwhile, he also worked on the Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), SLV-III projects and developed weapons likke Agni and Prithvi.

All his toil and self-less labour earned him the prestigions awards like the Padma Bhushan in 1981, the Padma Vibhushan in 1990 and the Bharat Ratna in 1997. It was his effort that made India the member of the nuclear possessor by conducting Pokhran-II nuclear test in 1998. Later he was made the Chief Scientific Adviser to the Prime Minister and DRDO Secretary from 1992 to 1999.

In 2002, he became the President of India. He was the first scientist and bachelor to occupy Rashtrapati Bhavan. His interaction with common people earned him the title of 'People's President'. His long cherished dream was fulfilled when he became the first President and the oldest Indian to fly in the Sukhoi-30 MKI. He was the only President of India who visited Slachen. He visited almost all the states of India and met millions of people and students community.

He founded the scheme of the urban Amenities in Rural Area (PURA) and gave away all his life savings to fund for this scheme.

To honour and to pay tribute, his 79th birthday was recognised as 'World Students' Day' by the United Nations. After leaving Rashtrapati Bhavan in 2007, he became a visiting professor at IIM Shillong, IIM Ahmedabad and IIM Indore. There are thirty-one (31) books in his credit as author. He regarded children as the future of India. He always motivated students community to ask questions, to dream big, to journey the unexplored path, to discover the impossible mission and to conquer the difficulties and succeed as he said once ''Difficulties in your life do not come to destroy you, but to help you realise your hidden potential and power. Let difficulties know that you too are difficult.''

Alas! the 83-year old scientist and the best human-being in recent times, collapsed addressing students at the IIM Shillong on 27th July 2015. Though aged, he was always young and energetic and that is why we feel that he died young. With his demise, we lost the rarest RATNA OF MOTHER INDIA.

The Author is a teacher in History of Vidyapith

স্মরণ

সে দিন গেছে চলে

অজন্তা দত্ত

মানুষের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক বন্ধনহীন গ্রন্থিতে সংযুক্ত পথ যে পথের কোথাও বন্ধুরতা কোথাও মসৃণতা। সুখ-দুঃখ, ওঠা-পড়া এর মধ্য দিয়েই মানবজীবন শুরু থেকে শেষের দিকে এগিয়ে যায়।

আমার প্রয়াত স্বামী শ্রী পাঁচুগোপাল দত্ত জীবনের ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়েই পরিণত বয়সে রামকৃষ্ণলোকে স্থান পান। তিনি ছিলেন পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের একজন শিল্প শিক্ষক। তাঁর প্রিয় বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্রদের অনুরোধে তাঁর সম্বন্ধে কিছু কথা লিখছি। প্রথমতঃ তিনি খুবই অন্তর্মুখী স্বভাবের, আত্মাভিমানী ও আবেগপ্রবণ ছিলেন। তাঁর কৈশোর, তার পরবর্ত্তী জীবনের কিছু পর্যায় তাঁর কাছ থেকেই শোনা। সেই শোনাটুকু সম্বল করেই লিখছি। অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিং শহরে তাঁর জন্ম হলেও আদিবাড়ী ঢাকার বিক্রমপুর। তাঁর পিতা রেলওয়ের কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত কারণে চাকরী পরিত্যাগ করে ময়মনসিং শহরে চলে আসেন। হয়ত সেটাই ছিল তাঁদের দুর্ভাগ্যের সূচনা। এরপর কিশোর বয়সেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার পরবর্তী অভিভাবকেরা তাঁকে তাঁদের চায়ের ব্যবসায় নানারকম কাজ করতে বাধ্য করেন। তিনি খেলাধূলা ভালবাসতেন। ঐ সময় হকি, ফুটবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলাধূলা করতেন কিন্তু বাড়ী ফিরে প্রচণ্ড শাসনের সম্মুখীন হতেন। এই সময় তিনি চিত্র আঁকার চেষ্টা করতেন কিন্তু অভিভাবকেরা এই বিষয়ে কোন উৎসাহ বা প্রেরণা দিতেন না। কৈশোরের এই ব্যথা ভরা ঘটনাগুলি তাঁর মনে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল তা পরিণত বয়সেও তাঁকে দুঃখ দিত। কিন্তু ঈশ্বর প্রদত্ত শিল্পচেতনার বীজ তাঁর অন্তরে প্রোথিত ছিল। তাই অন্তরে শিল্পকলা শিক্ষার প্রবল তাগিদে আর্থিক অসহায়তাকে উপেক্ষা করে তিনি শিল্পকলা শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করেছিলেন। নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রামে মাতৃসমা এক আত্মীয়ার প্রেরণায় ও নিজ প্রচেষ্টায় তাঁর কাছে থেকে সরকারী বৃত্তি নিয়ে ফুলিয়া পলিটেকনিকে এক বৎসরের কমার্শিয়াল আর্টের কোর্সে শিক্ষালাভ করেন। চাকদহে থাকার সময় একজন প্রতিমা শিল্পীর সহকারী হয়ে প্রতিমা নির্মাণ শিক্ষা করেন। তাঁর কথায় ফুলিয়ায় পড়ার সময় ''গৌরের পদরেণু যেন আমার মস্তকে আশীর্বাদরূপে ঝরে পড়েছে।'' ফুলিয়ায় পড়ার সময় শিক্ষক হিসাবে শিল্পী শ্রী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সঙ্গে পরিচয়। তাঁর প্রেরণায় ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে ফাইন আর্টসের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী প্রস্তুত করে কলেজের খরচ চালাতে হয়। দুই বৎসর পর পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে চলে আসেন। তখন বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজের পরিকল্পনায় শিল্পী শ্রী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত শিল্পী শ্রী সুনীল পাল মহাশয়ের প্রচেষ্টায় বিদ্যাপীঠ শিল্পকলায় সমৃদ্ধ হয়ে গড়ে উঠছিল। ওনাদের সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষালাভের ইচ্ছায় ও পূজনীয় অধ্যক্ষ মহারাজের অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে বিদ্যাপীঠে থাকতে শুরু করেন। এই সময় থেকেই বিদ্যাপীঠের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি বিদ্যাপীঠে (১৯৬২-১৯৬৪) আর্ট অ্যাসিস্ট্যান্টরূপে

কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীকালে (১৯৬৬) ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে ফাইন আর্টসে ডিপ্লোমা লাভ করেন। বার্নপুরের হীরাপুরে মানিকচাঁদ ঠাকুর ইন্সটিটিউশনে চার বৎসর শিক্ষকতার পর (১৯৭২) পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে শিল্পশিক্ষকরূপে যোগ দেন। বার্নপুরে তিনি শিল্পী স্যার নামে পরিচিত হন। ওই সময়ে বার্নপুরে অনেক প্রতিমা নির্মাণ করেন। তিনি (১৯৯৯) অবসর গ্রহণ করলেও আরও দশ বৎসর বিদ্যাপীঠে শিক্ষকরূপে কর্মরত ছিলেন। শ্রী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাধ্যমে তাঁর শান্তিনিকেতন ও শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে (কোলকাতা) যোগাযোগ হয়। শান্তিনিকেতনে শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রী রামকিঙ্কর বেজ, শ্রী প্রশান্ত রায় ইত্যাদি প্রখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি বেদান্ত মঠের শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজের বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বিদ্যাপীঠে প্রতিমা নির্মাণের সময় স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজ তাঁকে দেবীর রঙ-রূপের বর্ণনা শোনাতেন। বেদান্ত মঠে ও বিদ্যাপীঠে প্রখ্যাত ব্যক্তিদের বক্তৃতা—আলোচনাও তাঁর অন্তরকে নানা বিষয়ের জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছিল। আধ্যাত্মিক বিষয়ে জ্ঞান তাঁর পরবর্তীকালে সৃষ্টিতে সাহায্য করেছিল। তাঁর মতে প্রখ্যাত শিল্পী ও মহারাজগণের সান্নিধ্য, আশীর্বাদ ও উপদেশ তাঁর জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সর্বভারতীয় বার্ষিক প্রদর্শনীতে (১৯৬৩-১৯৯১) পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর অংশগ্রহণ করেন। অ্যাকাডেমিতে নিজস্ব প্রদর্শনী (১৯৭৪, ১৯৭৬, ১৯৭৮, ১৯৯১) অনুষ্ঠিত হয়। (২০০৭, ২০০৮) মিলিতভাবে দুটি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নৃত্য, নাটক, সঙ্গীত ও চিত্রকলা অ্যাকাডেমি থেকে (১৯৭৮) চিত্রকলা বিভাগে পুরস্কৃত হন। পুরস্কৃত চিত্রটি বিদ্যাপীঠ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। অঙ্কিত চিত্র সংগৃহীত—পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠ স্কুল ও মিউজিয়াম, দেওঘর বিদ্যাপীঠ, ললিতকলা, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ (কোলকাতা)। ব্যক্তিগত সংগ্রহেও তাঁর অঙ্কিত চিত্র আছে। তাঁর কথায়—

''মাষ্টারমশাই-এর (শ্রী রামানন্দ বন্দ্যোপাধায়) প্রেরণা আমার অন্তরে শিল্পের সোপান তৈরী করে দিয়েছে আর বিদ্যাপীঠের পরিবেশ আমার অন্তরকে স্বপ্নের আলোকে আলোকিত করে তুলেছে।''

বিদ্যাপীঠে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের মত কলাভবনও ছিল তাঁর কাছে মন্দিরতুল্য। তাই সেখানে যখন কর্মে মগ্ন হতেন আর কোনো কিছুই তাঁর কাছে প্রাধান্য পেত না। বিদ্যাপীঠ ও তাঁর ছাত্ররা তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। বিদ্যাপীঠের কোনো কাজ যেমন তিনি মনপ্রাণ দিয়ে করতেন তেমন ছাত্ররাও আঁকার কাজে অবহেলা করুক তাও সহ্য করতে পারতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন শিল্পকলা শিক্ষা যে কোন ছাত্রকে মনোযোগী ও অধ্যবসায়ী করে, তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে তোলে।

যে কোনো সৃষ্টিশীল ব্যক্তি তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে জীবিত থাকেন। তাই তাঁর প্রিয় ছাত্ররা, পরিচিত জন যাঁরা তাঁকে ও তাঁর সৃষ্টিকে চিনতেন, তাঁদের অন্তরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা অটুট থাকুক এই প্রার্থনা।

তাঁর অন্তরের আধ্যাত্মিক চেতনা যেমন তাঁর পৌরাণিক চিত্র অঙ্কনে প্রেরণা যোগাত তেমনই জীবনের শেষ পর্য্যন্ত শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণদেবকেই জীবনতরীর কাণ্ডারী ভেবে জীবনপ্রবাহ অতিক্রম করেন।

লেখিকা প্রয়াত অঙ্কন শিল্পী শ্রী পাঁচুগোপাল দত্তের স্ত্রী।

প্রিয় মিতসিজা

শুভ্রকান্তি চক্রবর্তী

মাধ্যমিক, ২০০৬

তুমি যখন সাদা সালয়ার কামিজের ওপর লাল ওড়না কাঁধ থেকে ঘুরিয়ে এনে কোমরের কাছে বেঁধে "গহন কুসুম কুঞ্জ-মাঝে"-র তালে তালে নাচো, তখন সেই তালে তালে আমি হারিয়ে যাই আমার কৈশোরে।

স্কুলের রাস্তার বাঁক থেকে হস্টেলে আসার পথে এক "মৃদুল মধুর বংশীধারী" কে মনে পড়ে। দেখতে পাই টুক টুক করে সেই পথে সে লাঠি ঠুকে ঠুকে আসছে। পরনে তার ঘননীল জামা। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। এত দূর থেকেও ব্যাগ থেকে উঁকি দেওয়া বাঁশিটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বৈশাখী দুপুরে শুনশান আশ্রম। মর্নিং স্কুল হয়ে গেছে লু-বাতাসের ভয়ে। তাই অখণ্ড অবসর। বোতলের ঢাকনা নিয়ে দুজন পেনাল্টি খেলছিল করিডোরে। খেলা থামিয়ে কাছাকাছি দু-চারটে ঘরে "বুধুদা এসেছে" বলে হাঁক দিয়েই তারা ছুটে যায়। বুধুদা আসছে কত যুগ পার করে, কংক্রিটের রাস্তায় বুধুদার লাঠি আঘাত করে করে যেন জরিপ করে নিতে চায় ফেলে যাওয়া সাম্রাজ্য। হস্টেলে ঢুকে সিঁড়ির তলাটায় বুধুদা বসে। ছেলেরা আবদার করে—"বুধুদা, মহব্বতে-র গান তুলেছ তো?" বুধুদা কথা কয় না, হাসে। তারপর বাঁশি বের করে গান ধরে। বুধুদার বাঁশিতে "হামকো হামিসে চুরা লো" শুনতে শুনতে ছেলেদের মুখে অদ্ভুত আলো খেলা করতে থাকে। বুধুদা একমনে বাজিয়ে যায়। শেষে জিজ্ঞেস করে—"ঠিক ছিল তো?" আমরা আনমনা হয়ে ঘাড় হেলাই। আমাদের ঘাড় হেলানো বুধুদার অগোচরে থেকে যায়। মাথা নিচু করে, চোখ পিটপিট করে ফের জিজ্ঞেস করলে আমরা সমস্বরে বলি—দারুণ হয়েছে গো...দারুণ।

এই সময়টা সবার ছুটি। পাখি ডাকে না, রাস্তায় কুকুর চরে না, বাথরুমে জলের শব্দ নেই। রুক্ষ ভূমিতে আশ্রম। গ্রীষ্মের দুপুরে জল শেষ হয়ে যেত মাঝে মাঝেই। বুধুদা অমলিন হেসে বলে—কেউ সুর করে গাও না কোনও গান। আমি বাজাই। আমি গেয়ে উঠি, "আমার পথে পথে পাথর ছড়ানো/তাই তো তোমার বাণী বাজে ঝর্না ঝরানো/আমার বাঁশি তোমার হাতে, ফুটোর পরে ফুটো তাতে/তাই শুনি সুর এমন মধুর পরান-ভরানো।" বুধুদা আমার গানের সুরে সুরে বাজায়।

করিডোরের কুঁজো থেকে ঠান্ডা জল আর কারো স্টক বাক্স থেকে বিস্কুট, বাদাম বুধুদাকে এগিয়ে দেয় ছেলেরা। মুড়ি চানাচুরে অবিশ্যি বেশি খুশি হত। বুধুদা মুড়ি চিবুতে চিবুতে গল্প করে। আমাদের কার কোথায় বাড়ি, ঐ ছেলেটা...যে আগেরদিন "আমার মুক্তি আলোয় আলোয়" বাজাতে বলেছিল, কিংবা সেই ছেলেটা..."এক পলকা জিনা"...সে আজ নেই কেন, স্কুলবাড়ির পাশে কি একটা ফুল হয়েছে, বেশ গন্ধ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বুধুদার গল্পে কোনও রঙের কথা থাকে না। কেমন করে বোঝাই তোমাকে...এই নীল জামা আর বাঁশি—আহা! তুমি যখন বাঁশি বাজাও, মনে হয় বলি—"কানাই রে, তোর শিখি পাখা কই রে কানাই...।" মলিন, শতচ্ছিন্ন জামা...তবু তো নীল। তাপ্পি দেওয়া ঝোলা ব্যাগ। তবু তাতে বাঁশি আছে...সুর।

বুধুদা যখন আবার ফিরে যায়—আমরা আবদারে ঝুলি ভর্তি করে দিই। বেলা পড়ে আসে। লাঠি ঠুকে ঠুকে স্কুল বাড়ির রাস্তার বাঁকে বুধুদা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হতে থাকে। বুধুদার পাথর ছড়ানো পথ। সে সব পাথর ডিঙ্গিয়ে, পা গুনে গুনে নীলবসন বুধুদা পেরিয়ে যাচ্ছে দ্বাপর...নদিয়া...মৈথিলী সুর।

এই দেখো, তোমায় বলতে বলতে আমার গলায় আর চোখে স্মৃতি চেপে বসেছে। তোমায় বুধুদার ছবি দেখাবো, মনে করিয়ো।

ইতি

অনন্তনীল

লেখক I.I.T. খড়গপুরে গণিতশাস্ত্রের গবেষক। দূরভাষ : 9874012306

বুধদা ও তার বাঁশি

মনে রেখো

সুভাষ চন্দ্র চৌধুরী

হায়ার সেকেন্ডারী, ১৯৬৬

২৭.৭.২০১৪ তারিখে সকালে সমর দে (১৯৬৬ ব্যাচের বিদ্যাপীঠ প্রাক্তনী) আমার সহপাঠী ফোনে জানাল রঞ্জিত মুখার্জী (১৯৬৮ ব্যাচ) আজ ক'লকাতাস্থিত K.P.C. Medical Hospital-এ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে। খবরটা শোনার পর মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। আরো খারাপ হল ঐদিন প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে ওর শেষ যাত্রায় নিজেকে সামিল করতে না পেরে।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রাক্তন ছাত্র-সমিতির জন্ম যার হাত ধরে সেই অন্যতম কাণ্ডারী রঞ্জিত মুখার্জ্জীর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আজ কিছু কথা মনে পড়ায় তারই উল্লেখ করছি।

শ্রী শিব কুমার হাজরা (১৯৬৫ ব্যাচ এবং বর্তমানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম Trustee এবং বেলুড় রামকৃষ্ণ সারদাপীঠের বর্তমান অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজের দাদা) এবং রঞ্জিত-এর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও ইচ্ছায় এই প্রাক্তন ছাত্র-সমিতির জন্মলগ্ন শুরু। পরবর্তী সময়ে তাতে ডঃ ধ্রুব মার্জিত (১৯৬১), সমীর কুমার পাইন (১৯৬৬), সঞ্জীব মুখার্জী (১৯৬৮) প্রমুখকে সামিল করে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের রূপকার শ্রীমৎ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজীর ঐকান্তিক প্রয়াসে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রাক্তন ছাত্র সমিতির জন্ম।

রঞ্জিত মুখার্জ্জী নিজের বসত বাটীতে পর্য্যন্ত Association-এর অফিস করে যাতে প্রাক্তনীরা সমিতির কর্মযজ্ঞে সবাই সামিল হতে পারে। রঞ্জিত ১৯৮২ থেকে ১৯৯১ পর্য্যন্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সমিতির গুরুদায়িত্ব পালন করেছে।

ডাঃ তপেন্দ্র কুমার মল্লিক (১৯৭৩ ব্যাচ)-এর দেওয়া ক'লকাতাস্থিত 7B, KIRAN SANKAR ROY ROAD এর একটি ঘরে প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় অফিস ছুটীর পরে আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন মিলিত হতাম। সেই ঘরে আর কেউ প্রতি বুধবার উপস্থিত না থাকলে রঞ্জিত-এর হাজিরা ছিল নিয়মিত। অধীর আগ্রহে একাকীও অপেক্ষা করত যাতে কোন প্রাক্তনী এসে ফিরে না যায়। তার সেই ধৈর্য্য ও ব্যাকুলতা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এমনকি পরবর্তী জীবনে চাকুরীর সুবাদে ক'লকাতা ছাড়তে হলেও রঞ্জিত আমাকে ফোনে এমনকি অন্যের মাধ্যমে খবর পাঠাত সুভাষদা ক'লকাতার অফিসটি যেন সচল থাকে যেকোন প্রয়োজনে আমাকে সবসময়েই আপনারা পাবেন। পুরুলিয়ায় চাকুরী করার সময়ও রঞ্জিত সেখানে প্রাক্তনীদের সংগঠিত করে বিভিন্ন গঠনমূলক সেবাকার্য্য পরিচালনা করত।

পুরুলিয়ায় প্রতিটি পুনর্মিলন উৎসবে নিজে উপস্থিত থেকে সেই কর্মযজ্ঞে সামিল হোত এবং Senior ও Junior নির্বিশেষে সকল প্রাক্তনীদের সঙ্গে সহজেই মিশে সেই কর্মযজ্ঞে সামিল হতে অনুপ্রেরণা যোগাত।

ক'লকাতায় স্থায়ী অফিস ঘরের জন্য তার আন্তরিক উৎসাহ ও ব্যাকুলতা আজও আমাকে বিশেষ-ভাবে উৎসাহিত করে। বিশেষ করে অর্থাভাবের জন্য নিজে ব্যক্তিগত উদ্যোগে Personal Loan নিয়ে পর্য্যন্ত

এগিয়ে এসে তাকে বাস্তবায়িত করে। শুধু তাই নয় প্রাক্তনীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে পর্য্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করে নিজে এবং তার এই কর্মযজ্ঞে সমীর কুমার পাইন, সঞ্জয় কুমার চট্টোপাধ্যায়কে ও আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে।

তার ব্যক্তিগত অনাড়ম্বর সহজ-সরল জীবনযাত্রা, প্রাক্তনীদের বিপদে আপদে সাহায্যের হাত প্রসারিত করা, শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও পুনর্মিলন উৎসবে উপস্থিত থাকা, Association-এর যেকোনো শুভ কাজে সর্বাগ্রে এগিয়ে এসে তাকে বাস্তবায়িত করার শত প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আজ রঞ্জিত সশরীরে আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তার পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ প্রাক্তন ছাত্র সমিতির প্রতি আজীবন অকৃত্রিম ভালবাসা, যেকোন শুভ কাজে নিজে সামিল হওয়া ও অন্যকে সামিল করা এবং তাকে বাঁচিয়ে রেখে আরো আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার অদম্য ইচ্ছা আমাদের মধ্যে সদা জাগ্রত থাকার মধ্যেই রঞ্জিতকে মনে রাখা।

লেখক প্রাক্তনী সমিতির দীর্ঘদিনের কোষাধ্যক্ষ। Phone : 2533 4960

যখন যা কিছু খাবে, তাঁকে নিবেদন করে প্রসাদ রূপে খাবে। তাহলে রক্ত শুদ্ধ হবে, মনও শুদ্ধ হবে।

—শ্রীশ্রীমা

রঞ্জিতদা

অনির্বাণ নাগ

মাধ্যমিক, ১৯৮৮

জন্ম ও প্রয়াণের সালতামামি এবং দুই মিনিট নীরবতা পালন। শোক সভা ও স্মৃতিচারণের ক্ষুদ্রতম প্রথান পালনেই বন্ধুকৃত্য সমাপ্ত হয়ে যায়। হয়ত কখনো শুধুমাত্র পরিবারটি একটা স্বাভাবিকতায় চাপা পাথর হৃদয়ে বয়ে চলে। রঞ্জিতদার অকালপ্রয়াণটাও এই নিয়মে আটকে থাকত যদি না পরিবারের সংজ্ঞাটা তিনি বদলে দিয়ে যেতেন নিজের জীবনে।

পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রাক্তনীদের (এবং অনাগত সদস্যদের) পক্ষে এই পারিবারিক ক্ষতিটি অপূরণীয়। তাই এই সবাক তর্পণ। নীরব প্রার্থনা তো আমরা শ্রীশ্রী ঠাকুরের চরণে আমরা নিয়ত রাখি—একাকী বা ভূমাতে। ১৯৬৮-র শ্রী রঞ্জিত মুখার্জী আবালবৃদ্ধের রঞ্জিতদা হয়ে ওঠাটা একটি বহতা নদীর গল্প। শুরু ছিল কিন্তু শেষ হয় নাই।

জন্ম ১লা নভেম্বর ১৯৪৯, বিদ্যাপীঠে আসা ১৯৬৪, উচ্চ মাধ্যমিক ১৯৬৮, Alumni Association এর গোড়াপত্তন ১৯৮২, অকালপ্রয়াণ ২৭জুলাই, ২০১৪। কিন্তু সময় সারণীতেও কয়েকটি দাগই কি জীবন? আমার বিদ্যাপীঠে জ্ঞানাবধি reunion মানে রঞ্জিতদা, অক্রুর দত্ত লেন এ alumnia association এর বাড়ি কেনার জন্য নিজের প্রভিডেন্ট ভান্ড থেকে টাকা তুলতে যাওয়া মানুষটি রঞ্জিতদা, রাত্রি নটার সময়ে বাড়ি ফেরার পথে দেখা একটি ঠিকানা না জানা ex-student এর বাড়ি খোঁজা পথিকের নাম রঞ্জিতদা। না কামানো দাড়ি, সিগারেটের মতো করে বিড়ি খাওয়া দাদাটার নাম রঞ্জিতদা। সদ্য পাশ করে কলকাতা আসা ছাত্রের মুশকিল আসান অভিভাবক রঞ্জিতদাত

সাধারণত যেকোনো মানুষই চলে যাওয়ার পরে তাঁর নিজেরই অজানা সব গুণ বন্ধুদের মুখে আর নিন্দুকের মুখে বিচিত্র সমালোচনা শুনে ওপর থেকে তাঁরও হয়তো মজা লাগে। কিন্তু রঞ্জিতদা আমাদের মতই কাছে ছিলেন, অভ্যাসের মতো, গুণ বা দোষ দেখার অবকাশ হয়নি। চোখের খুব কাছে ধরলে বইয়ের অক্ষর যেমন পড়া যায় না।

একটি কয়েক লাইনের ইংরেজি কাহিনী—A story is told about a rabbi who died at the age of fifty. When the family returned from the funeral, the eldest son said, ‘‘Our father had a long life.’’ Everyone was aghast. ‘‘How can you say that of a man who died so young?’’ They saked. ‘‘Because his life was full; he wrote many important boks and touched many lives.

That is consolation.

রঞ্জিতদা কত হৃদয় যে ছুঁয়ে গেছেন শিশুর সরলতায় তা উল্লেখ করার চেষ্টা বাতুলতার নামান্তর। স্মৃতিচারণা করতে করতে থামা মানে লেখার শেষ নয় তা পাঠকেরা নিশ্চয় বুঝবেন। কথার বহমানতা ছেদ করা মাত্র। শ্রীশ্রী ঠাকুরের পাদপদ্মে আমাদের সমবেত প্রার্থনা রইল রঞ্জিতদার যেন তাঁহার কাছেই ঠাঁই হয়।

লেখক বর্তমানে আফগানিস্তানের কাবুলে Financial Management Advisor, Phoenix IT.

পাঁচুদা

বিশ্বজিৎ রায়

মাধ্যমিক, ১৯৯৩

সেইস্কুলে কোনও কোনও জায়গা ছিল যেখানে দৌড় যেত থেমে। রোদ খেলত বেশি, হাওয়া অলস ভঙ্গিতে চলাচল করত আর অদ্ভুত একরকম মনকেমনের সুর ছেয়ে ফেলত শরীর। তেমনই একটা বাড়ির, জায়গার নাম ছিল 'নিবেদিতা কলামন্দির'। একদিকে তাদের ইস্কুল ঘোরতর সফল—প্রত্যেক বছর মাধ্যমিকের রেজাল্ট 'সাংঘাতিক'। এক থেকে কুড়ির মধ্যে বেশ কয়েকজন আর স্টার ফার্স্ট-ডিভিসন তো পথে পথে ধুলো-বালির মতো পড়ে আছে। সে সবের জন্য সারা বছর কত ঘষা-মাজা। রেজাল্টের জন্য ইস্কুলের নাম প্রত্যেক বছর বড়ো বড়ো করে কাগজের পাতায় ছাপা হয়। তাই সে ইস্কুলে সাফল্যমুখী, রেজাল্টমুখী একটা ঝোড়ো কেজো হাওয়া বাঁই বাঁই করে পাক খেত—বনবনিয়ে চলত। এই হাওয়ার মধ্যে কয়েকজন ছিলেন অন্যরকম—তাঁরা ঘোড়দৌড়ের বাইরের লোক অন্য রঙের অন্য রেখার লোক। তাঁরা থাকতেন ওই নিবেদিতা কলামন্দিরে। গানের ঘরে সব্যসাচী গুপ্ত, সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আঁকার ঘরে পাঁচুগোপাল দত্ত। এই ইস্কুল যখন শুরু হয়েছিল তখন পাঠ্যসূচি ছিল অন্যরকম। পুরনো হিসেবে, যখন ওল্ড হায়ার-সেকেন্ডারি ছিল, তখন উঁচু ক্লাশের পড়ুয়াদের ফাইন আর্টস পড়ার উপায় ছিল। মাধ্যমিক স্কুলে আঁকা-গান সিক্স-সেভেনে থেমে যেত।

তাই নিবেদিতা কলা মন্দিরের মাস্টারমশাইদের ঘোড়-দৌড়ে প্রত্যক্ষ অবদান ছিল না। তাঁরা দৌড়-দৌড়ের বাইরে তাঁদের সময় ও সৃষ্টি নিয়ে থাকতেন। পাঁচুদা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন সাদা ক্যানভাসের সামনে। তাঁর চোখে ছিল হাই পাওয়ারের চশমা। চুল অবিন্যস্ত। পরতেন ধুতি-পাঞ্জাবী। সেই ধুতি-পাঞ্জাবী মটমটে নয়—ভাঁজে ভাঁজে উদাসীন। পাঞ্জাবী সাদা নয়—হালকা একরঙা। চশমার ভেতরে দুটি বড়ো বড়ো চোখ—কী যেন খুঁজছে দেখছে। সে দেখায় মায়া আছে, মনোযোগ আছে, উদাসীনতাও মিশছে কিন্তু সে চোখে কোনও লোভ নেই। ধরে বেঁধে রাখতে চায় না—রঙ, রূপ সৃজন করে কিন্তু সেই রঙ-রূপকে দাসানুদাস করে রাখে না। নিবেদিতা কলামন্দিরে ছবি আঁকার ঘর-বাড়িটি তাঁর। তিনি ছবি আঁকেন, মূর্তি গড়েন আর সুসফল মাধ্যমিক স্কুলের ছেলেদের ক্লাস সিক্স পর্যন্ত আঁকা শেখান। আঁকা কি আর শেখান! তিনি আঁকেন ছেলেরা দেখে—দেখাটাই তো শেখা। রঙ চেনান, রঙ লাগাবার কায়দা শেখান কিন্তু হাতে ধরে আঁকা শেখান না। তিনি বিশ্বাস করেন ওরকম হাতে ধরে আঁকার মাস্টারি করা যায় না। হাতে ধরে ঘষে-মেজে আঁকায় স্টার পাইয়ে দেওয়া যায় না। এটা বোঝেন বলেই ইস্কুল যখন বাঁই বাঁই করে ছেলেদের নিয়ে রেজাল্টের পেছনে ধাওয়া করে তখন তাঁর সাদা ক্যানভাসে ফুটে ওঠে পুরুলিয়ার নানা ছাপ ও ছবি। ছেলেদের কাছে পাঁচুগোপাল দত্ত বড়ো রহস্যময়। কখন যে কাকে বেশি দেবেন কেউ জানে না—যে বেশি পেল সে ছেলেদের মহলে শিল্পী হিসেবে খ্যাত নয়। কে একজন কালো দিয়ে ছবি আঁকল—চাঁদ, নৌকো জল রাত্রির ছবি। পাঁচুদা বললেন কী সাহস দেখেছ—কালো রঙ ব্যবহার করেছে। অমনি তাকেই বেশি দিয়ে দিলেন। ছেলেরা তো হেসে খুন—রসিকতা করত তারা, বলত পাঁচুদা 'ইনার মিনিং' খুঁজে পেয়েছেন। পাঁচুদার কে ছিল ছেলেরা তা জানত না। তবে পাঁচুদার অঘোরদা ছিল। কালো মানুষ, ভালো মানুষ অঘোরদা। বেঁটে খাটো অঘোরদা পরত সাদা-ধুতি পাঞ্জাবী। পুরুলিয়ার গ্রামের মানুষ। পাঁচুদা তাকে নিজে হাতে গড়ে-পিটে নিয়েছিলেন। শরৎকাল শেষ হত, সময় শীতের দিকে এগোত। স্কুল খুলেই কালীপুজো। কালী ঠাকুরের মূর্তি বানাতেন নন্দলাল বসুর ছাত্র পাঁচুগোপাল দত্ত। সেই মূর্তির মাটি তৈরি করতেন অঘোরদা। কীভাবে মূর্তির মাটি ছেনে মায়ের শরীরের জন্য মাটি নির্মাণ করতে হয় পাঁচুদা তা অঘোরদাকে শিখিয়েছিলেন। সেই মাটিতে প্রত্যেক বছর কালী মূর্তি বানাতেন। পাঁচুদার পুজো ছিল না তবে নির্মাণ আর নিরঞ্জন ছিল। মূর্তি বানানোর পর সেই মূর্তিখানি মন্দিরে যাবে, পুজো হবে। সেই পুজোয় পাঁচুদা খুব একটা প্রবেশ করতেন না। তবে নিরঞ্জনের আগে সেই মূর্তির দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতেন। ভেতরের পুকুরে জলে ভেসে যেত অঘোরদার মাটি থেকে গড়ে তোলা পাঁচুদার মূর্তি। সেই সময়টুকু পাঁচুদার নিজস্ব, একান্ত। যেমন মূর্তি গড়ার সময়টুকুতে কোনও আওয়াজ সইতে পারতেন না। পুজোর পরে খুলে পরীক্ষা—সফলতার দৌড়। এসবের অনেক বাইরে পাঁচুদা আর তাঁর ছবি আঁকার ঘর-বাড়ি। কালী ডুবে গেলেন জলে, বিকেল শীতশীতে সন্ধের দিকে এগোয়। পাঁচুদার অবিন্যস্ত চুল আর চশমার ভেতরের বড়ো বড়ো চোখে মনকেমন করা সময়। সফলতার বাইরে কখনও কখনও ভাসান বড়ো মায়াময়—সফলতার থেকেও বড়ো। সফলতাকে ভাসানের কাছে তখন ফালতু লোক বেঁটে লোক বলে মনে হয়।

লেখক বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক।

চরৈবেতি

চন্দন সেন, *হায়ার সেকেন্ডারী ১৯৬৬*

সুদীর্ঘ জীবনের চলার এ পথ মাঝে,
কখনও পেয়েছি কাঁটা, কখনও বা প্রেমফুলদল,
কিছু তার স্মৃতি হয়ে বয়েছে অন্তরে
বাকি গেছে তলিয়ে অতলে।
কখনও ফুটেছে কাঁটা, অসহ্য যন্ত্রণায়
হয়েছি অস্থির
কখনও বা ফুলদল, আপন সুগন্ধ দিয়ে প্রাণ
মোরে করেছে সুস্থির
কিন্তু এগিয়ে গিয়েছি,
পিছন পথের, মন থেকে, সব কিছু ধুয়ে মুছে দিয়ে
জেনেছি যে শুধু, এই দুই মিলনেই এ মহাজীবন।

কবি এম. এন. দত্তর কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত বাস্তুকার।

কল্পনার কথা

সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়, *মাধ্যমিক, ১৯৭৬*

প্রথম চিঠিটা পেয়েছিলাম লাইব্রেরির মাঠে
বসে, সুনীলের কবিতার বইয়ে চারভাঁজ
গোলাপী কাগজে। দ্বিতীয়টা? তৃতীয়টা? তার
পরের বত্রিশটা? অত কী আর মনে আছে,
আজ এই এত দিন পরে? কথা দিয়ে রাখতে
পারিনি, চিঠিতে চিঠিতে এঁকে তোলা অন্য
সেই জীবনের খোঁজে বেরোনো হয়নি আজও।।
শুনেছি তুমি কানাডায়। আমি তো
বাংলাদেশেই গত একুশ বছর ধরে সাজানো
সংসারে, একা। চিঠিগুলো জমিয়ে রাখিনি।
অথচ আজও শেষরাতে ঘুমভাঙা চোখের
সামনে সবকটা শব্দ খেলা করে। খেলা করে
যাবে চিরদিন।

[কবি ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের First Secretary (Press, Culture & Information) দূরভাষ : + 880 1730-372744]

বোঙাবাড়ি

মনীষী মুখোপাধ্যায়, *মাধ্যমিক, ১৯৮৫*

বহুদিন আগের কথা,
তবু অভীকের মনে আছে সব।
বোঙাবাড়ি-
কি মিষ্টি নাম ছিল গ্রামটার।
শীত গেলে, যখন শালের গাছে ফুল আসত,
তখন জ্যোৎস্না মাখা রাতে দখিনা বাতাস ভারী হত মহুয়ার গন্ধে।
সাঁওতালি মাদল বাজত গুম-গুম গুম-গুম।
সেই শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠত সারা শরীর-মন।
পরবের লাচ হত তখন,
গান হত সত্যিকারের জীবনমুখী।
তারপর, রাত আরো গাঢ় হলে,
নাচের তাল যেত লড়বড়িয়ে।
গলায় সুর আসত নিঃঝুম হয়ে।
নিবুনিবু তারাগুলো হাই তুলত আকাশের গায়ে বসে।
তাই দেখে ঘুমের মাসী পিসীরা আদর করে ছড়া কাটত-
আয় ঘুম, যায় ঘুম।

অভীক তখন ছোট।
হস্টেলের আড়াই বাই সাড়ে চার তক্তপোষে দিব্য এঁটে যেত সে।
ইস্কুলের বড় বড় দালানওয়ালা বাড়ি ঘর,
আর জানলার বাইরেই মস্ত খেলার মাঠ।
মাঠ আগলিয়ে উঁচু পাঁচিল।
পাঁচিলের ওধারে জংলাগাছের ঝোপঝাড়।
ঝোপ পেরোলেই ঘুমন্ত সরীসৃপের মত রেললাইন—
যন্ত্রশকটের গর্জনে নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটলে
তার অস্তিত্ব টের পাওয়া যেত মাঝেমধ্যে, নচেৎ নয়।
রেল লাইন টপকালে, নির্জলা নদী—
সারা বছর হ্যাংলার মত তাকিয়ে থাকত ফোঁটাকয় জলের আশায়।
নদী পেরোলেই শালের বন।

আর ঐ বন কে বেড়েই গ্রাম—
যেখানে মাদল বাজত।
রাতে খুব ভয় করত অভীকের।
ঘুম আসত না মোটে।
চোখ বন্ধ করে
কেবল মায়ের কথা ভাবত সে।
কখনো বাড়ির কথা মনে আসত তার।
সুজয়ের কুকুরটা একবার খুব তাড়া করেছিল তাকে।
ভয় পেয়ে কি কান্না কেঁদেছিল সেদিন।
দৌড়ে গিয়ে উঠেছিল বাবার কোলে।
বাবা বলেছিল, কান্না গিলে ফেল্,
ছেলেরা আবার কাঁদে নাকি, বোকা!

ভাবতে ভাবতে চোখ আসত জলে ভরে।
প্রাণপনে কান্না গিলত অভীক,
কিছুতেই সে বোকা সাজবে না আর।
ঠিক তখনই, যেন কোন মায়াবী কাঠির ছোঁয়ায়
হঠাৎ জেগে উঠত বোঙাবাড়ি।
আর আচমকাই, যেন কোন পাগল,
অভীক কে কাঁধে করে,
মাথায় তুলে,
দৌড়ে বেড়াত-এ গাছ থেকে ঐ গাছ,
লাফিয়ে যেত নদী, পেরিয়ে যেত বন,
চড়ত গিয়ে টিলার ওপর।
মুঠো মুঠো জোনাকি ছড়িয়ে দিত আকাশের গায়ে।
মাদলের তালে তালে কি ফূর্তি সেখানে।
এরই মধ্যে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ত অভীক,
টেরই পেত না সে নিজেই।

ঢং ঢঙিয়ে ঘুম ভাঙাত সকাল।
তারপরে—সংগীতময় প্রার্থনা।

আরো কত অভ্যস্ত ব্যস্ততায়—
কেমন করে
দিন থেকে হপ্তা, কেটে যেত মাস থেকে বছর।
যেমন ঋতু তেমন রঙ লাগত আকাশের গায়।
তারপর, সব রঙ জড়ো করে,
কে যেন রামধনু টাঙাত—
ফলাও করে শালবনের মাথার উপর।
অভীক লক্ষ করত সব।
ততদিনে মনখারাপের ব্যামো গেছে সেরে।
কেবল তক্তপোষে আর এঁটে উঠছেনা সে।

তবু হে তক্তপোষ,
তব আপোষহীন আনুগত্যে,
অগণিত নিদ্রাহারা নিশি তে,
ভীরু এক উৎকণ্ঠ কিশোরের
স্বপ্নময় জগতের
কত গাথা গাঁথা আছে জানি।
তুমি মোর ময়ূর আসন, বৈভবের স্থল,
চারিপার্শ্বে দীপ্তিময় খদ্যোতের দল,
শালবৃক্ষ সারি সারি
স্বপ্নমোহময়। বোঙাবাড়ি—
ক্রমোত্তীর্ণ মাদল যেথা প্রচণ্ড আঘোষে করে গুম গুম,
হে পেলব শয্যা মোর, তব ক্রোড়ে,
আছে মম নিশ্চিন্ত নির্বিকল্প ঘুম।

শিক্ষকেরা এ কবিতার প্রশংসা করলেন বটে,
তবে যে শব্দের ওপর অভীকের ভরসা ছিল বেশী,
সেই খদ্যোত কে করে দিলেন জোনাকি।

তারপর একদিন,
আজ থেকে তিরিশ বছর আগে,
বাক্স গুছিয়ে ফেলল অভীক।

পরে রইল দালানওয়ালা স্কুলের ঘর,
খেলার মাঠ, মাঠে পাঁচিল, আগাছার ঝোপ,
রেলের লাইন,
মরানদীর গাঙ,
শালের বন,
গানের সুর, নাচের তাল
আর মাদলের বাজন।
অভিমানে মুখ ভার করে রইল বোঙাবাড়ি।
রিক্সা করে বাইরে এল অভীক,
পিছন ফিরে তাকাতে পারলনা সে।
এমন সময় কে যেন গুনগুনিয়ে গেল কানের কাছে—
জীবনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হও, ওঠ, জাগো, নির্ভয় হও, এগিয়ে চল।
অভীক মনে মনে বলল, আসি, আসব আবার।
অতি কষ্টে কান্না গিলতে হল তাকে।
নিথর দাঁড়িয়ে রইল বোঙাবাড়ির শালবন-একটি পাতাও বুঝি নড়ল না সেই দিন।

কবি কলকাতা নিবাসী, অ্যানাসিস্ সলিউসনের প্রতিষ্ঠাতা কর্ণধার।

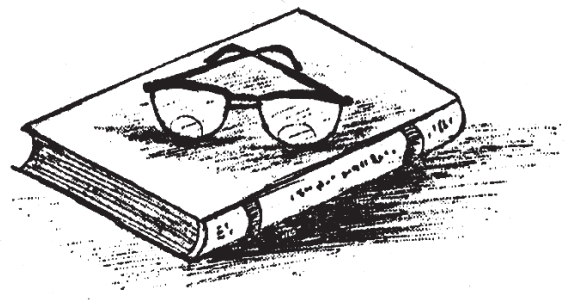

আমি, আমার বন্ধু যারা

দেবব্রত গুহ

মাধ্যমিক ১৯৮৫

তখন আমরা সবাই ছোট
ন'দশ বছর, মাথায় খাটো,
দাখিল হলাম বোর্ডিং স্কুলে
ভবিষ্যৎটি গড়ব বলে।

নিয়ম করে ভোরে ওঠা,
ঘুম চোখেতে প্রার্থনাটা
সেরেই শুরু ড্রিল ও পি টি,
দৌড়ে গিয়ে মাখন রুটি।

পড়ার ক্লাসে লাগছে না মন,
কেবল ভাবি খেলব কখন,
স্কুলের শেষে চুটিয়ে খেলা
সেই আমাদের ছোট্টবেলা।

সন্ধে হলে খেলার শেষে
ভজন ঘরে ঘুমের দেশে,
ফিরে এসে পড়া আবার,
তারপরেতে রাতের খাবার।

খেয়ে দেয়ে মশারি বেধে
অনেক গল্প করার সাধে
হতাম সবাই লাগাম ছাড়া
আমি আমার বন্ধু তারা।

একটু যখন বড় হলাম
গান বাজনার তালিম পেলাম
নাটক করা ছবি আঁকা
হরেক রকম খেলা ও শেখা।

শিক্ষকেরা ধীরে ধীরে
আদর দিয়ে শাসন করে
বুঝিয়ে দিতেন কেমন ভাবে
সঠিক পড়া করতে হবে।

শিক্ষা তখন বইয়ের ভাঁজে,
সিলেবাসে কে আর খোঁজে?
শিক্ষা হল বাধনহারা
আমার, সঙ্গে বন্ধু যারা।

ফল বেরোলে মাধ্যমিকের,
সবাই সফল, বিদ্যাপীঠের
এমন শিক্ষা পেল যারা,
আমার সবাই বন্ধু তারা।

তারপরে সব ছড়িয়ে গেলাম
যে যার মত এগিয়ে গেলাম,
নিজের কাজে সবাই নামী
বিদ্যাপীঠের শিক্ষা দামি।

আজ আমরা কেউ বিদেশে
কেউ বা আছি ঘরের পাশে
কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার
কেউ বা উকিল কেউ প্রফেসর।
কেউ প্রকাশক কেউ ব্যবসায়ী
কারোর আবার চাকরী লেখাই।

কিন্তু সবার মনের ভিতর
একটি ইচ্ছে প্রবল প্রখর,
সমাজ হিতে ব্রতী মোরা
আমি আর আমার বন্ধু যারা।

কবি কলকাতা নিবাসী, কলকাতা ট্রাম কোম্পানীর সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার।

গানের পাখি

উদ্দালক ভরদ্বাজ
মাধ্যমিক, ১৯৮৭

আমার ভ্রান্ত বীণা রইল তোমার পায়ে
এই স্তব্ধ গানে।
আমার শব্দ যত, উড়তে যদি চায়
আমি তাদের কানে—

তোমার মন্ত্র দিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে যাব
যদি, তাই বলে দাও।
দূরে, তাকিয়ে যেমন উদাস হল আজ
তাকে স্বপ্নে হারাও—

আমি, আমার মনে ফুরিয়ে যাব একা
চোখে জলের ফাঁকি,
তুমি একলা ঘরে হঠাৎ উড়ে এসো
আমার গানের পাখি।

কবি পরিচিতি :
Uddalak Bharadwaj, Ph.D.
Assistant Professor
Department of Infectious Diseases, Infection Control and Employee Health
UT MD Anderson Cancer Center
S7.8316, Basic Science Research Bldg,
6767 Bertner St, Houston, TX 77030-2603
(713) 885-6770 (Cell)
Email : UBharadwaj@mdanderson.org

ঘরে ফেরা

সঞ্জয় মুখার্জী, *মাধ্যমিক, ১৯৯৩*

অনেক দূরে নৌকা আমার হারিয়ে গেছে
কোন সে বাঁকের অচিনপুরে,
ঘর থেকে আজ অনেকদূরে মিশে আছি বিশ্বমাঝে,
হ্যার আলোর নিয়ন রাতে—
ভেসে চলি কালের ভেলায়
হঠাৎ শুনি ওই যে ডাকে
আমার ঘরের উঠান হতে
আসবি তোরা? আসবি কবে?

ঘরের কোনে ভাবি বসে
নিত্যদিনের ব্যস্ততাটাই,
বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় এসে
বলে আমায় সময় কোথায়!
দৌড় তোমার হয়নি শেষ
ফিনিশ করো, রিলে রেস।

তবুও যেন হঠাৎ করেই একসকালে
স্মৃতির ঝাঁপি সঙ্গে নিয়ে
ফিরে আসে আমার ঘরে।
উচ্ছ্বাস আর কোলাহলে,
একঝলকের চেনা বাতাস
ফিরিয়ে দিলো সেই আমাকে।

গাছে, গাছে ছায়ায় ছায়ায়
দাঁড়াই এসে মাঠের ধারে।
সুখ স্মৃতির ঝরাপাতা
নিমেষে মোরে আকুল করে
লুকিয়ে আছে বছর সাতেক
মাঠেরই এই সকল বাঁকে
ফিরে আসে নানা রঙে
তারাই আজি আমার মনে।।

কবি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক।

আঁকার ক্লাস-এ ছুটি

(শ্রদ্ধেয় পাঁচুদা, শ্রী পাঁচুগোপাল দত্তকে স্মরণ করে)

কৌশিকীশরণ মিশ্র, *মাধ্যমিক, ১৯৯৩*

মানুষটার চোখ দুটোই সব—
পুরু কাঁচের ফ্রেম-এ ঘেরা
অবাক চোখ দু'টো
রং দেখে মন দেখে,
জেগে থাকে, চেয়ে শোয়।
রং জ্বালে ক্যানভাস-এ
তুলি লিখে টেনে তোলে ছবি।
এই লোকটাই
সব তাতে সাদা মেখে খেলে—
শুদ্ধির রং দুধ সাদা।

যত প্রাণ যত অনুভূতি
ওর চোখে ক্যানভাস বদল।
কালির দোয়াত ভাঙে ক্লাসে
ড্যাবড্যাবে চোখ দ্যাখে ডানা মেলা পাখি।
সুলেখার নীলকালি মেঝেতে চুঁইয়ে যায় হেসে।

সেই চোখ বন্ধ হলো
মরণ আঁকে শিল্পী—
কোবাল্ট ব্লু থেকে ভার্মিলিওন ছুঁয়ে
ইয়েলো-অকার
সটাসট আইভরি ব্ল্যাক
সাহসী লাইন টানে—কয়মুঠো চারকোল—
...কাঁডায় চড়ে চির শিশু
মাথায় তালপাতার ছাতা
পেরিয়ে চলে
শ্বেত উপত্যকা।

কবি ওড়িশার রায়গড়া নিবাসী, Aluminium Refinery (Utkal Alumina International Ltd.) কর্মরত।

এপার ওপার

বিশ্বরূপ যশ

মাধ্যমিক ২০০৭, উচ্চ মাধ্যমিক ২০০৯

প্রাণচঞ্চল সচল সরব রাজধানী আলোমাখা
সূর্য কখন তলায় কোথায় হ্যালোজেনে পড়ে ঢাকা
সকাল-দুপুর-বিকেল গড়িয়ে নিওন-জ্বালানো সাঁঝে
পথে হর্ন বাড়ে আর মিডনাইট পার্টিতে গান বাজে

দূরে কোনোখানে ঝাউয়ের মাথায় শান্ত সন্ধ্যা নামে
আকাশের তারা চিঠি পোস্ট করে কালো রাত্রির খামে
রাস্তার ধারে ম্লান ল্যাম্পপোস্ট জ্বলে সারারাত ধরে
শীতের শিউলি শিশির ঝরায় কুয়াশা জড়ানো ভোরে

প্রায় সাড়ে ন'টা—দেখা দরকার কী টরেন্ট এলো ভালো
আঙুলের চাপে সশব্দে জাগে ইউপিএসের আলো
হাতমুখ ধুয়ে বাথরুম সেরে ব্রেকফাস্ট চাউমিন
রাইট ক্লিক টিপে রিফ্রেশ করে আরম্ভ হল দিন

অস্ফুটে জাগে পাখিডাকা ভোর সমবেত সঙ্গীতে
প্রথম রোদের আগুন ছড়ায় ডালিয়ার পাপড়িতে
মোজা-ভেজা মাঠে হাফপ্যান্টেরা ঘন্টার আশা ক'রে
পোড়া পাঁউরুটি, জমাট মাখন, ধোঁয়া-চা গেলাস ভ'রে।

তাকভরা বইয়ে বুকমার্ক গোঁজা ব্যর্থ প্রতিশ্রুতি
নিরালোক চোখে জাল বুনে চলে ডায়োডের নীল দ্যুতি
হাতের নাগালে মাইক্রোএসডি পোষমানা গানে ঠাসা
হাইকোয়ালিটি আবহে হারায় গানের মুখের ভাষা

লাল-কালো-সাদা সুতোর নক্সা ভারী মণিপুরী শাল
ফার্স্ট পিরিয়ডে টাস্ক বাকি ভুলে শারদীয়া মায়াজাল

পাতাঝরা নাগলিঙ্গমতলা গানের স্যারের ঘর
অশোকের গায়ে কাঠবিড়ালীর ছোটাছুটি দিনভর

পাড়ার ক্লাবের স্বাস্থ্যশিবির নাগরিক উদ্যোগ
মাইক ও মঞ্চ মেলবন্ধনে দেশসেবা উপভোগ
লম্বা কবিতা পড়ার এক ফাঁকে দেখে নেওয়া আপডেট
কী কমেন্ট এলো আর অ্যামাজনে কত রে-ব্যানের রেট

জানলার ধারে রোদ এসে পড়ে বিকেলে বাংলা ক্লাসে
অলস হাওয়ায় শিমুলের বীচি দিক ভুল করে ভাসে
বকুলের ডালে সন্ধ্যাঘোষণা পাখিদের কোলাহল
মাঠেতে ছড়ানো নির্জন চাঁদ মাঝরাতে নিশ্চল।

চটা ওঠা ব্যাট ঝুল-ধুলো খায় সিঁড়ির ঘরের পাশে
সিল্ড প্যাকে ভরা গেমপ্যাড দরজায় ডেলিভারী আসে
ডিনার পেরিয়ে প্রহরে প্রহরে চ্যাটথ্রেড বেড়ে চলে
রাতজাগা ঘরে একা বন্ধুরা ফেসবুকে কথা বলে

বর্তমানে জার্মানীর WWU Muenster বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নে গবেষণারত। দূরভাষ: + 4917683400922

“Thank You Sir”

Smarajit DasGupta
Madhyamik 1988

I wanted to be a writer
When I was just a young teen
But I was so incredibly shy
And kids can be so mean.

Then a new teacher came along.
He had such a different view.
I no longer felt embarrassed
By the writing that I'd do.

He made me feel I had a gift
And that it should be shared.
To him I admitted my hopes
And I felt that he really cared.

Sir encouraged extra work,
To write about whatever we wanted.
So I wrote and wrote and wrote some more.
The words just flew, undaunted.

My grade Ten English teacher
Read my work out loud
And winked when the class applauded,
For the first time I felt proud.

I never signed my real name.
The class didn't know it was me
But my work garnered admiration,
On display for all to see.

That was the year I learned that
What I wrote was pretty good.
I just needed time for confidence to grow
And that, Sir understood.

He made us see the written word
In a way that made us aware.
So I would like to thank him,

[The English teacher who really did inspire me to write was our very own English teacher, Suchendranath Roy, (Sushil Royda.)]

Author is an Academician, pedagogue, presently working as Principal with Podar Education Group, Mumbai and posted at Vapi, Gujarat. Mobile : +91 7574807023 / 8155066170.

অ নু গ ল্প

অস্বাভাবিক

দেবাশিস ঘোষ-২

মাধ্যমিক, ১৯৮৫

পড়াতাম। যদিও পড়ানোর কাজ আমার ছিল না। পাঁড়েজীর অনুরোধে গ্রামের দশ-কুড়িটা ছেলে-মেয়েকে হিন্দি অক্ষর চেনাতাম আর দু-অক্ষর এবং তিন-অক্ষর-যুক্ত কিছু শব্দ শেখাতাম। প্রায় সবাই আট-দশ বছর বয়সের। হতদরিদ্র নিরক্ষর বাড়ির ছেলে-মেয়ে তারা। অধিকাংশই অনাগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী। দু-একজন অবশ্য শিখছিল। তারই মধ্যে একটি মেয়ের আগ্রহ ছিল সুতীব্র। তবে তা অক্ষরজ্ঞান বা শব্দ শেখার প্রতি ছিল না। ছিল ছবি আঁকার প্রতি। পাতার পর পাতা, খাতার পর খাতা ছবি আঁকতো রুকুয়া অর্থাৎ রুক্মিণী রায়। এই গল্প বিহারের মধুপুর সংলগ্ন এক প্রত্যন্ত গ্রামের; আমার প্রথম চাকরিস্থলের। এক এনজিওর কর্মী হিসেবে থাকতাম সেখানে।

ছেলে-মেয়েগুলোর মধ্যে রুকুয়া আমার নজর কেড়েছিল ছবি আঁকার কারণে। অসামান্য ফুলের ছবি, পাখির ছবি ফুটে উঠত তার শীর্ণ আঙুলের আঁচড়ে। 'দারুণ' 'বাঃ' 'ভীষণ ভাল' এই রকম কিছু শুষ্ক প্রশস্তি-সূচক শব্দ বলতাম তার ছবি দেখে, আর সে সব শুনে ক্লিন্ন মেয়েটির মুখ ভরে উঠত এক গভীর উদ্ভাসে। ভারি মিষ্টি দেখাত তখন তাকে। পরে দেখতাম বিকেলে যে রাস্তা দিয়ে আমি চাপাকলে জল আনতে যাই সেই রাস্তার উপর ধুলোতে ছবি এঁকেছে রুকুয়া। প্রায় রোজই। আমি দাঁড়াতাম, দেখতাম, প্রশংসা করতাম। আর তাতেই শীর্ণ বালিকার মুখে ফুটে উঠত সাফল্যের উচ্ছ্বাস। একদিন তো তার ধুলোতে আঁকা পেখম-তোলা ময়ূরের ছবি দেখে আমি শিহরিত হয়ে গেলাম। অবিশ্বাস্য রকমের ভাল সেই ছবি। ভাবলাম মেয়েটি যাতে বড় হয়ে আঁকা চালিয়ে যেতে পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

কয়েক দিন ধরে দেখছিলাম যে রুকুয়া পড়তে আসছে না। রাস্তায় ছবিও আঁকছে না। পড়তে-আসা রুকুয়ার দিদির কাছে জানতে চাইলে সে বলে রুকুয়ার শরীর খারাপ। একদিন বিকেলে জল আনতে যাবার পথে রুকুয়ার বাড়ি গেলাম। রুকুয়ার মা নিয়ে গেল রুকুয়ার কাছে। উঠোনে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে আছে রুকুয়া। আমাকে দেখে 'মাস্টারজী' বলে উঠে বসার চেষ্টা করল। আমি উঠতে বারণ করলাম। ওর মা বলল ভুখার ভাল হচ্ছে না। ঝরিয়ার কয়লা-খাদানে-কাজ-করা বাবা গ্রামে ফিরলে মধুপুর হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবে। নিকটতম হাসপাতাল মধুপুরেই, যা সেখান থেকে ২৫ কিমি দূরে। রুকুয়ার অনুরোধে তার মা আমাকে আঁকার খাতা, যা আমিই দিয়েছিলাম রুকুয়াকে, দেখতে দেয়। অসাধারণ কিছু কচি হাতের আঁকা।

কী একটা কাজে লোকাল হেড-কোয়ার্টার্স পাটনা যেতে হয়েছিল। ফিরলাম দশদিন পরে। সেই সময় সেই জায়গায় শেষ অগ্রহায়ণে কনকনে ঠান্ডা পড়ত। সেদিনও তীব্র ঠান্ডা ছিল। রাত আটটায় বাড়ি ফিরে আমার-সাহায্যকারী ছেলেটাকে বললাম মিহিরকে ডাকতে। ছেলেটি বলল মিহিরের আসতে দেরী হবে। শ্মশানে গেছে মিহির। জানতে চাইলাম কে মারা গেল। বলল রুকুয়াকে দাহ করতে গেছে মিহিররা। নিমেষে এক গভীর শৈত্য সেই কনকনে ঠান্ডার রাতে ছেয়ে গেল আমার সমগ্র সত্তা। রুকুয়া নেই? চলে গেল হঠাৎ। জীবনে প্রথম এবং হয়ত বা শেষবার কোন অনাত্মীয়র মৃত্যুতে সারারাত ছটফট করেছি; চোখের জল সারাক্ষণ কোন বাধা মানেনি।

পরের দিন সকালে দেখলাম রুকুয়ার মা স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে রসিকতা করতে-করতে কাজে গেল অথচ গতকালই তার মেয়ে বিনা চিকিৎসায় ঘরে শুয়ে-শুয়ে মারা গেছে। দেখলাম গোটা গ্রাম স্বাভাবিক। আমি শুধু অস্বাভাবিক। ছেড়ে দিলাম সেই গ্রাম, ছেড়ে দিলাম সেই চাকরি। তবুও ক্যালেন্ডারে যখনই শেষ অগ্রহায়ণের সেই তারিখটি এসেছে তখনই আমি এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় কাতর হয়েছি, নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়েছে, আর এক না-ফোটা বালিকা উপস্থিত হয়েছে আমার ভাবনায়।

লেখক WBLS আধিকারিক। বর্তমানে প.বঃ সরকারের Sr. Law Officer & Ex-officio Asst. Secretary

সম্পর্ক চিরকালীন

গ ল্প

চিন্ময় দাস

মাধ্যমিক, ১৯৮৫

বছর কয়েক আগের ঘটনা, ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী। আমাদের পাঁচুদা, স্বর্গত শ্রী পাঁচুগোপাল দত্ত রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি। আমাদের এ্যালামনির ছেলেরা সঞ্জয়ের নেতৃত্বে লড়ে যাচ্ছে। একটু সুস্থ হওয়ার পরের দিন পনেরোর জন্য ওঁকে কোলকাতায় কোথাও রাখার দরকার হল, ফাইনাল চেক আপ করে পুরুলিয়ায় ফিরবেন। বালিগঞ্জ ষ্টেশনের খুব কাছেই সঞ্জয়রা ঘর ভাড়া করল। হাসপাতাল থেকে ফিরে দুর্বলতার কারণে পাঁচুদার তো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠার শক্তি নেই, ওঁকে চেয়ারে বসিয়ে ২০০৫ ব্যাচের শুভঙ্কর মাইতিরা সেই চেয়ার টেনে তুললো দোতলায়। আত্মিক সম্পর্ক না থাকলে এমন কাজ অসম্ভব। কোলকাতা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে থাকি আমি, কোন কাজেই লাগতে পারলাম না। তবে একটা কাজ করতাম। অজয়দার ছেলে অর্ঘ্য তখন সেবা প্রতিষ্ঠানে ডাক্তারি করে। ওর কাছ থেকে প্রতিদিনকার খবর নিয়ে আমাদের ৮৫ ব্যাচের ছেলেদের মেল করতাম, তারাও খুব উৎকণ্ঠায় থাকতো। মেলের উত্তর আসত অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া সহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা বন্ধুদের থেকে। শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের এহেন সম্পর্ক দেশকালের সীমানা পেরিয়ে এমনই অমলিন ছিল এবং আছে আজও। এটাই বিদ্যাপীঠ থেকে বড় পাওনা।

ঠিক এই সময়েরই আর একটি ঘটনা। সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ শঙ্খর ফোন। আমাদের ব্যাচের শঙ্খ হাজরা কোলকাতার এক নামী বেসরকারী হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের কথোপকথনটা অনেকটা এই রকম।

শঙ্খ বলল—"জানিস, আজ একটা কাণ্ড হয়েছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কী হল আবার?"

—"সকালে রাউন্ডে পেশেন্ট ভিসিট করছি। হঠাৎ নার্স এসে বলল, নিচে একজন পেশেন্ট এসে বলছেন তিনি না-কি আপনার বাবা। তিনি আপনার নাম ধরে হাঁকাহাঁকি শুরু করেছেন।"

—"তারপর?"

—"আমার বাবা সদ্য প্রয়াত হয়েছেন, সেটা নার্সও জানে। আমি বললাম, বয়স্ক অসুস্থ মানুষ ওরকম বলে থাকেন। আপাততঃ এমারজেন্সিতে শুইয়ে রাখুন, আমি একটু পরেই যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে এসে দেখি, আমাদের কালিদা, শ্রী কালিদাস গুহঠাকুরতা। আমাকে দেখেই কালিদার সে কি উচ্ছ্বাস! আরে ডঃ হাজরা, আমি জানতাম তুমি এখানে আছো, তাই ঝাড়গ্রাম থেকে চলে এলাম। আমি প্রণাম করে বললাম—কেমন আছেন? কালিদার উত্তর—শরীরটা একটু trouble দিচ্ছে। তবে তোমাকে দেখে সুস্থ বোধ করছি।"

—"সে কী রে? উনি তোকে আগে ফোন করেননি? ওঁর কষ্টটা কি?"

—"না, উনি আমাকে আগে ফোন করেননি। আমার নম্বরও ওঁর কাছে ছিল না। ওঁর কাছ থেকে তাঁর কষ্টটা ঠিক কী সেটাও জানতে পারছিলাম না। উনি বিদ্যাপীঠের কথা, আমাদের ব্যাচের ছেলেদের কথা নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলেন। আমি আর কি করি! পাশে বৌদি ছিলেন; ওঁকে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরোলাম কালিদা-র সমস্যা জানার জন্য। হঠাৎ সেই নার্স ওঁর সামান্য অসংলগ্ন কথাবার্তার জন্য বললেন, উনি বলছিলেন, উনি আপনার বাবা, সঙ্গে একটু বাঁকা হাসি। আমার মাথা গেল ঘুরে; বললাম—Yes, he's my father. Without him I would not have been a doctor. Admit him immediately and treat him as my father. আমার পুরনো দিনগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল। কী ক্লাস রুমে, কী ল্যাবে, কালিদা-র সেই দাপাদাপি, সেই আন্তরিকতা। বায়োলজি সাবজেক্টটার প্রতি আমার আগ্রহ ওঁর কারণেই। আমরা যে যা কিছু হয়েছি তার মূলে কালিদাদের মতো শিক্ষকরা।"

—"ঠিক বলেছিস, এঁরা father-এর থেকে কম কী-সে? যাই হোক, চিকিৎসাটা তো শুরু হোক।"

জানলাম কালিদা-র অবস্থা ভালো নয়; শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার ফলে পরিস্থিতি জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। দুশ্চিন্তা আর শঙ্খর ওপর ভরসা রেখেই বাক্যালাপ শেষ করলাম।

রাত্রি দশটা নাগাদ আবার শঙ্খর ফোন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কী হল আবার? কালিদা কেমন আছেন?"

শঙ্খ খুব ধরা গলায় "চিন্ময় নার্সরা বারবার হাসপাতাল থেকে ফোন করছে। কালিদা প্রায় অচৈতন্য; কিন্তু থেকে থেকে কিছু ছেলের নাম ধরে চিৎকার করছেন।"

—"তারা কারা?"

—"নার্সরা যাদের নাম বলল তাদের মধ্যে তিনজন আমাদের ক্লাসমেট। শ্বেতোৎপল, সৌমেন, পিনাকী। এদের আমি কোথায় পাই; কারোর সঙ্গেই তো আমার যোগাযোগ নেই। আমি এখন কী করব, চিন্ময়?"

শঙ্খর প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা, মানসিকভাবে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। আমি ওকে সাহস দিয়ে বললাম, "আমার কাছে পিনাকী-র নম্বর আছে। দাঁড়া ওকে ফোন করি।"

শঙ্খর ফোন কেটে বম্বেতে পিনাকীকে ফোন ভয়ে ভয়ে। ও আবার যা ব্যস্ত থাকে। যাই হোক পিনাকীকে পাওয়া গেল।

—"কীরে, তুই কোথায়?"

পিনাকী বলল—"বোম্বেতে, এয়ারপোর্ট থেকে ঘরে ফিরছি। কেন কী হল? তোকে কেমন যেন চিন্তিত লাগছে।"

—"আর বলিস না!"

তারপর সমস্ত ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিলাম।

—"সে কী-রে? আমি এখন তাহলে কী করব? এয়ারপোর্টে ফিরে কলকাতার প্লেন ধরব? শ্বেত বা সৌমেনের ফোন নম্বরও তো নেই।"

—"এত রাতে তুই কোলকাতায় আসবি? পাগল হলি নাকি?"

—"চিন্ময়, তুই বুঝছিস না; কালিদা-র ঐ অবস্থা। আমার নাম ধরে ডাকছেন। যদি ভালমন্দ কিছু একটা হয়ে যায় আমি সারাজীবন নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না। ওঁরা আমাদের জন্য এত করেছেন।"

—"সেটা ঠিকই। তবে সিদ্ধান্তটা না-হয় কাল সকালেই নিস। তুই বরং এখনই একবার শঙ্খকে ফোন কর; নম্বরটা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

এরপর রাত্রিটুকু আমরা সবাই চরম উৎকণ্ঠায় কাটালাম। শঙ্খ ঘনঘন হাসপাতালে ফোন করতে লাগল; সকাল হতে না হতেই ছুটল হাসপাতালে। রাতেই আসতে চেয়েছিল; ওষুধের পরিবর্তনে অবস্থার সামান্য উন্নতি ঘটায় নার্সদের পরামর্শমত উৎকণ্ঠা চেপে বাড়িতেই রয়ে গিয়েছিল। কালিদা ১২ ফেব্রুয়ারী—১৯ শে ফেব্রুয়ারী হাসপাতালে ছিলেন। শিক্ষাগুরুর দাবী নিয়ে শারীরিক কষ্ট প্রশমনের আশায় কালিদা ছাত্রের কাছে এসেছিলেন। কোনো আর্থিক সাশ্রয়ের কথা তিনি কল্পনাও করেন নি; যেটুকু বাড়তি সুবিধা তিনি চেয়েছিলেন তা একান্তই ব্যক্তিগত—হাসপাতালে কাজের ফাঁকে শঙ্খ যেন মাঝে মধ্যে ওঁর কাছে আসে। যাই হোক, ডঃ কল্যাণ সরকারের সুচিকিৎসায় আর শঙ্খর আন্তরিকতায় কালিদা সুস্থ হয়ে ঝাড়গ্রামে ফিরে গেলেন ১৯ তারিখেই।

বর্তমানে আমি কালিদা-র মতো অতো ভালো স্কুলে না হলেও সাধারণ একটা স্কুলে শিক্ষকতা করি। বার্ধক্যে উপনীত হতে আর খুব দেরী নেই। জগতের নিয়মে শারীরিক কারণে আমাকেও হয়তো একদিন হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে হবে। আমার ভাবনা হয়, যদি কখনো বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়ার মতো পরিস্থিতি হয়, তখন আমার মুখ দিয়ে আমার একমাত্র সন্তান-এর নাম ছাড়া প্রিয় ছাত্র-ছাত্রী গৌরব, পার্থ, শুভ, সন্তু বা প্রিয়া মুখার্জী-দের নাম কি বেরোবে? যদি বেরোয় তবে বুঝি পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে প্রবাদ প্রতিম শিক্ষকদের সান্নিধ্যে আসা সার্থক হয়েছে।

(লেখক মেমারী, পাহাড়হাটি গোলাপমণি উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজির শিক্ষক)

পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায়।
ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়
আয় আর-একটিবার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয়।
মোরা সুখের দুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায়।

—রবীন্দ্রনাথ

গ্রন্থচর্চা

পুস্তক সমালোচনার সার্বিক মূল্যায়ণ

পৃথু হালদার

ছাত্র, দ্বাদশ শ্রেণি

দে'জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে শংকরের লেখা বিবেকানন্দ পরিক্রমার চতুর্থ গ্রন্থ 'আশ্চর্য বিবেকানন্দ।' গ্রন্থটি সুস্বাদু হলেও সুপাচ্য হয়েছে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকে। যেমন সব ভোজনপটু ভোজনরসিক আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয় তেমনিই সব পাঠক বিবেচক নন। পাঠকদের মধ্যেও প্রকারান্তর থাকে। 'আশ্চর্য বিবেকানন্দ' গ্রন্থটি সব অর্থেই আশ্চর্য। বইটি রসিক পাঠকের পছন্দের হলেও বোদ্ধা পাঠকের হওয়া উচিত নয়। বইটির বেশ কয়েকটি স্থানে সমালোচনার অবকাশ নিঃসন্দেহে থেকে যায়।

প্রথমত, বইটির বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠা অমূলক নয়। বইটিতে একটি অধ্যায় আছে—'ব্র্যান্ড বিবেকানন্দের মাধ্যমেই কী ব্র্যান্ড রামকৃষ্ণের জয়যাত্রা?' অনুরূপেই প্রশ্ন করা যায়—'ব্র্যান্ড বিবেকানন্দের মাধ্যমেই ব্র্যান্ড শংকরের জয়যাত্রা নয় কী?' সত্যি কথা বলতে, একপ্রকার আলোড়ন ফেলেছেন তিনি। এক বছরেই বইয়ের ষষ্ঠ সংস্করণ নিঃশেষিত! সাধারণ বাঙালি পাঠক সমাজ বিবেকানন্দকে হাতে তুলে নিয়েছে শংকরেরই হাত ধরে। একারণে সাধুবাদ অবশ্যই প্রাপ্য তাঁর, তাঁর অনবদ্য সাবলীল ভাষার ছন্দময়তা আকর্ষণ করে সব ধরনের বাঙালি পাঠককে। আবার এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে উপস্থাপন-শৈলীর চটকদারী এবং মার্কেটিং শিল্পের অনন্য দক্ষতা। বাংলা ভাষায় এককালে রমরমা প্রচলিত উপন্যাস 'চৌরঙ্গী'-এর লেখক স্বভাবতই চেয়েছেন তার উপাদানসমূহ বিবেকানন্দ পরিক্রমাতেও অন্তর্ভুক্ত করতে। কিছু কিছু স্থানে ফল হয়েছে মারাত্মক বিপজ্জনক। বরং বলা যায়, তাঁর লেখা বিবেকানন্দ সিরিজের অন্যান্য বইগুলি অনেক বেশী 'অথেনটিক্'। যেখানে 'আমি বিবেকানন্দ বলছি' বইটি তাঁর নিজের জবানিতে—'জিরো অ্যাডেড সুগার' অর্থাৎ কোনো খাদ মেশানো নেই। সকল স্থানের 'রেফারেন্স টপ' অকাট্য আকর নির্দেশ করেছে। কিন্তু এই সিরিজের চতুর্থ গ্রন্থ 'আশ্চর্য বিবেকানন্দ' বইটিতে সব জায়গার রেফারেন্স 100 শতাংশই উৎস অনুসারী নয়। তথ্যপঞ্জীর অভাবে তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে খটকা লাগতে বাধ্য। সুতরাং ডায়াবেটিস রুগীরা সাবধান!!

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না যে শংকরের প্রতিটি বইই অসামান্য পরিশ্রমের ফল। সাধারণ পাঠক স্বামীজীর পাশ্চাত্য জীবন সম্পর্কে জানতে যেমন মেরী লুইজ বার্কের ছয় খণ্ডের 'Swami Vivekananda in the West; New discoveries' অথবা Asim Chowdhuri-র 'Vivekananda in America : New findings' পড়বেন না ঠিক তেমনিই তাঁদের হাতে এসে পৌঁছবে না স্বল্প পঠিত বাংলা আকর গ্রন্থাবলী—যেমন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজীর সম্পাদনায় 'স্মৃতির আলোয় স্বামীজী' কিংবা 'স্বামী বিবেকানন্দ : বিপ্লবীদের চোখে'-এবং তাঁর নিজের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা মূল্যবান স্মৃতিচারণাগুলি। এই বইগুলি সুলভে পাওয়া গেলেও খোঁজ জানেন না অনেক পাঠকই। আবার সুপ্রসিদ্ধ প্রামাণ্য জীবনী স্বামী গম্ভীরানন্দের 'যুগনায়ক বিবেকানন্দে'র ভাষার কাঠিন্যের জন্য অনেকে ছায়া মাড়ান না। ফলে যখন তাঁরা বিবেকানন্দ জীবনীর সুধারস পান থেকে বঞ্চিত তখনই আবির্ভাব শংকরের 'বিবেকানন্দ ব্যান্ডের'। এ কারণে লেখককে ধন্যবাদ। তাঁর লেখা পৌঁছেছে সাধারণ পাঠকের ঘরে ঘরে।

অপর দিকে যেটা না বললেই নয়, তা হল তাঁর তথ্যের প্রাচুর্য। তথ্য যেখানে মত্ত করে পাঠককে, সর্ষের মধ্যে ভূত থাকার সম্ভাবনা সেখানেই হয় বেশী। কিছু কিছু স্থান বেশ প্ররোচনামূলক, বিভ্রান্তির জন্ম দেয়। যদিও

সেইসকল স্থানকে তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে—'যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ' বলে নিশ্চিন্তে সাত্ত্বিকের আবরণ টানতে পারেন, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। অথচ নবপ্রজন্মের লঘু মননশীল পাঠকদের কাছে সেগুলোই জন্ম দেবে বিভ্রান্তির। পাড়ার রক বা কলেজের আড্ডায় ঘটবে তথ্যের বিকৃতি। যেমন—প্রথম বিবেকানন্দ ট্রিলজির একটিতে মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের ছবির নীচে ট্যাগলাইন—''শিষ্যা না বান্ধবী?'' এই ('?') প্রশ্নচিহ্নটিই বিপজ্জনক!

তবে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা উচিত তথাকথিত ছিদ্রান্বেষী লেখকদের সঙ্গে শংকরের তুলনা চলে না। তিনি স্বামীজীর ইমেজকে কলুষিত না করে '*সন্ন্যাসী*'-র প্রতি তাঁর সহানুভূতি আগাগোড়া বজায় রেখেছেন। কিন্তু একথাও ঠিক, বারংবার 'সন্ন্যাসী' কিংবা ওই জাতীয় শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে সন্ন্যাসী ও গৃহীর চিরাচরিত বিভেদরেখাকে প্রতীয়মান করে তুলেছেন সুস্পষ্টভাবে। নিজেকে দ্রষ্টা কিংবা বিচারকের ভূমিকায় বসিয়ে 'সন্ন্যাসীর কাজ'কে বিচার করেছেন তাঁর দৃষ্টিতে। নিজেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন 'বিশ্লেষক' হিসেবে, শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতো 'ভক্ত গবেষক' হিসেবে নয়।

এই স্থানে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ' অনুরাগী নন যারা তাদের উদ্দেশ্যে বলে রাখি বিবেকানন্দের উপর কিছু লিখতে গেলে কেন 'ভক্ত গবেষক' হওয়া উচিত, আর কেনই বা শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সঙ্গে তাঁর তুলনা করলাম। এক্ষেত্রে USA এর সর্বকালের সেরা লেখক Lauren Destefano-এর উক্তি উল্লেখ না করে পারলাম না—'The only characters I even don't like are ones that leave no impression on me. And I don't write characters that leave no impression on me.

বিশ্বসাহিত্যে কিংবা বাংলা সাহিত্যে সব মহান চরিত্রই দেখতে পাই লেখক মনের প্রতিফলন। অনেক জায়গায় সৃষ্টি এবং স্রষ্টা মিলে মিশে এক হয়ে যায়। এখানে যেহেতু চরিত্রটি বাস্তব পৃথিবীর রক্তমাংসের একজন মানুষ, তাই স্বামী বিবেকানন্দকে আর নতুন করে বিনির্মানের সুযোগ নেই। কাজেই এক্ষেত্রে লেখককেই অবগাহন করতে হবে বিবেকানন্দ ভাবসমুদ্রে, ফলে তাঁকে ভক্ত গবেষক হতেই হবে।

অপরদিকে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর নাম উল্লেখ করলাম কারণ তিনি এই বিবেকানন্দ গবেষণায় শংকরের অগ্রদূত। সফল লেখক হিসেবে লিখেছেন—''বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ'' নামের সাত খণ্ডের সুবৃহৎ গ্রন্থাবলী। তিনি সত্যনিষ্ঠ ও পরিশ্রমী ভক্তগবেষক।

শংকরের লেখনী প্রজ্ঞা অপেক্ষা পাটোয়ারি বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়েছে বেশী। বাঙালিরা যেমন 'উর্বশী' শব্দটি নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে পড়েন বলে লেখক স্বীকার করেছেন, ঠিক তেমনিই অস্বস্তিতে পড়েন যখন (অ)প্রয়োজনে(?) 68 পৃষ্ঠা লেখা এবং 16 পৃষ্ঠা কবি নিয়ে সর্বসাকুল্যে 84 পৃষ্ঠা ব্যয়িত হয় 'সন্ন্যাসী ও পঞ্চমায়াবিনী' অধ্যায়ে। এর মধ্যে সারা বার্নহার্ড ও মাদাম এমা কালভের ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে 'ধান ভানতে শিবের গীত' গেয়েছেন বললে অত্যুক্তি হবে না। লেখকের বোঝা উচিত ছিল এতে অস্বস্তি বাড়বে বই কমবে না।

তবে ভরসার কথা এই, স্বামীজীর সম্মান এত ঠুনকো নয়। তিনি তাঁর চরিত্রের তেজে এতটাই ভাস্বর এবং নিষ্কলঙ্ক যে, কোনো লেখকের কলমের মসী এখনো তাঁর গায়ে দাগ ফেলতে অক্ষম। শংকরের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, পরিশ্রম করেছেন সাধ্যমত, অনেক অনালোকিত স্থানে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে অলোকপাত করেছেন। এসবের জন্য অবশ্যই সাধুবাদ প্রাপ্য তাঁর। তবে প্রধান আক্ষেপ এই যে—নানা রঙের চরিত্রের বিচিত্র সমাবেশে এবং তথ্যের জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলে পাঠক যখন স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী পাঠের উপকারিতার সঙ্গে এই বইয়ের উদ্দেশ্যটিকে মূল্যায়ন করবেন, তখন মনে হতেই পারে 'ভাবের বড়ই অভাব বোধ হল।'

Rowlingverse

Manash Sarkar

Madhyamik 2007, H.S. 2009

There is a certain fond feeling that we associate with the word Home. Home is that which gives us peace and rest, where we go to find solace and strength, and which gives us our unique identities. Where can we find Home? Home is where the heart resides. This is, in a way, the precise reason we call Vidyapith a Home away from home. In this world, we come across some rare things that attach themselves to us forever, nourishing and nurturing us throughout our lives. We become so familiar with them, so indebted to them, and so bonded with them that they become for us the equivalent of Home. It's the same with Vidyapith. A visit to Vidyapith can be a balm that soothes, calms, and guides us - the old boys who are insiders no more. We all know how we feel about our Alma Mater.

This article is on one of the most well-known characters in the whole world, and his universe. The Rowlingverse is something that readers of Harry Potter often associate with Home. For this article, I reached out to some of my friends and asked them a few key questions about their experiences with Harry Potter. They responded happily. To this feedback, I added a short account of how I had met Harry when I was a student at Vidyapith (after all, to me, the ideas of Vidyapith and Hogwarts are inseparable). The responses recorded here are a testimony to the immense positive influence that Harry Potter has had on many, many readers. There is no alternative to reading the books if one wants to know what it is all about; here, we merely try to say how important all of it is to us.

Harry Potter came to me in an odd way.

I was a student at a residential school. Once, I was ill and admitted in the on-campus hospital, and there I saw an older student reading 'Harry Potter and the Goblet of Fire'. It was the year 'Sorcerer's Stone' came out. 'Anandamela', a Bangla children's magazine, had covered the film in that month's number. I read about it, but I knew nothing, frankly. I borrowed the book from the older boy and read it for some time. It was nice, I made a mental note to read it properly in the future.

When I got home for the holidays, I saw the film in a cinema. That was the beginning.

Back at the hostel, I remember chasing around classmates who owned the books, - asking them to lend it to me for a few days... there were so many of us in line! I read 'The Philosopher's Stone' when I was in class 6. That book with the big Scarlet Engine on the front, and the Headmaster Albus Dumbledore on the back, clicking his deluminator mischievously.

Then, like a storm of dreams, came 'The Chamber of Secrets', and 'The Prisoner of Azkaban'. So many furtive hours in the classroom, hiding the book under the desk; so many sleepless minutes in the night, reading by torchlight, hidden from the warden's strict vigil. I can't ever stop missing those days. We shot the meagre spells we memorized at each other, - we longed for the Great Hall's laden tables on our way to lunch, we wanted to study Transfiguration and Herbology and - yes! - even Potions so, so much! We were confident we would be AWESOME students at Hogwarts; a chance, why did we never get a chance!

Quidditch. Hogsmeade. Butterbeer and ever-new magic on our minds. Then came 'The Goblet of Fire', - I was a boy of fourteen. I can't remember details at this moment. I can just say it was even better than chocolate.

It was class 9 and we were hard-pressed about our big exams. I read 'The Order of the Phoenix' at this time. It was like nothing I had ever witnessed before. I was watching a dream come true. All these guys, all these terrific guys at last getting together. The students, - Fred and George, everyone - finally shaking up and turning into these heroes. And in the end - Dumbledore alone, facing off against Voldemort. - - - My favourite subject was Biology. I noted every word the teacher said in every single class. That one day I couldn't. Beneath my notebook I had the storybook opened, - and just so that sir doesn't catch me, - my pen-hand moving in a zigzag like a wave-pattern along the notebook, lines after lines. Later when I looked at the two-page-long scribble, I could tell by the intensity of the zigzag exactly where Dumbledore had stepped in, and exactly when Sirius had died.

It was a long time afterwards that I could get hold of 'The Half-Blood Prince.' I was a class 11 student now. The growing shadow mingled with demons of my own, and the last song of Fawkes left me bereft with myself. I was growing into an adult - the book whispered in my ears.

'The Deathly Hallows' was lent to me by Srinjay Dutta when I was in college. I stuck with Harry till the very end, and I parted with him in joy and tears. But Harry did not leave me.

To this day, Hogwarts remains with me, all its endless present and unfathomable past resonating in silence, lending me sustenance. And, I for my part, remain with Hogwarts forever.

'The Road goes ever on and on
Down from the door where it began.
Now far ahead the Road has gone,
And I must follow, if I can,
Pursuing it with eager feet,
Until it joins some larger way,
Where many paths and errands meet.
And whither then? I cannot say.'

.....

● **Supratim Dhar (Student, Civil Engg. , Hooghly Engg. & Technological College)**

1. How did you become a reader of Harry Potter?

When I was in the eleventh standard I pretty much hated Harry Potter because I knew him only through the films. But one day, one of my elder brothers gave me the first book of the HP series. And I can remember that the next month was the best month of my life so far. That's how I became a reader of the most amazing magical story of all time.

2. How has Harry Potter become a cherished part of your life?

As Harry potter is the first fictional book I ever read, it has taken up a huge place in my heart. I can remember how sad I was when I completed the series. I wanted J. K. Rowling to write another series on Harry, Ron and Hermione's successors at Hogwarts. And now it has become such an important part of me that I read it whenever I feel downcast, and it always cheers me up.

3. Does Harry Potter, a fantasy tale, have any bearing on our ruthless, real-world lives?

Harry and Ron's friendship in the story has told me that it is possible in real life to be brothers even when we are not related, and the story has brought out that your parents, as well as your loved ones, do not leave your side, no matter how tough the situation is. They will always be there for you.

4. Would you say that you are indebted to the Harry Potter books? Tell us about some of the life lessons you learnt from them.

I will surely remain indebted to Harry Potter till the last day of my life. Not only did it make my childhood, it also made me believe that miracles happen in the most unexpected situations. It taught me that in the strongest storms of your life, if someone is out there to hold your hand, you will get through it no matter what as long as you are thinking of the well-being of everybody.

———————

● **Ridhima Gandhi (Student, Allahabad University)**

1. How did you become a reader of Harry Potter?

It was like...totally random.

I had just started reading a year or two before and I was totally into the books written by Enid Blyton... and this super-rich friend of mine got the HP series as a gift from her uncle. She hated and still hates reading...but her uncle wanted her opinion on the books...so she asked me to read the first one for her...and I did it... And I've loved HP since then.

2. How has Harry Potter become a cherished part of your life?

It is just....this huge part of me that I love.. and I can't unlove.. you know. No matter when....or how I return...my home is always there to welcome me back. I love

going back whenever I feel a rush of emotions...or indecision, sadness...anything. I have a motto "When in doubt, return to Hogwarts," because Hogwarts always has the answers.

3. Does Harry Potter, a fantasy tale, have any bearing on our ruthless, real-world lives?

Of course it does! God...it is as obvious as me being alive or the sun being a ball of hot gas. No other series is like this in which reality is brightened up by a touch of magic. Every quote, every character, every emotion in these books is something we encounter in our lives. As they say, just because it is all in our heads does not mean it is not real!

4. Would you say that you are indebted to the Harry Potter books? Tell us about some of the life lessons you learnt from them.

Yes, I am indebted to them. And in more ways than one.

They have saved me time and again, and every moment I spend with Harry, Ron and Hermione has been one of the best in my life.

If there is one literary reason that I am sane, then it is J.K. Rowling's masterpiece that has and is continuously changing my life for the better.

5. Do you feel that the Harry Potter books have contributed significantly to your identity? Could you elaborate?

Yes, it has. Till date, there hasn't been one day when I haven't thought of or quoted HP (even if it is just in my head). What I am today, is because of this series. There is a reason why I can't leave these books even after I have read them countless times over the nine years of my knowing them; they are a part of me, and I of them.

6. Why do you think Harry Potter has a role to play in today's world, when we are clearly witnessing a crisis of civilization?

Read the major quotes in the series again... If you don't find that even one of them is applicable in our lives, I will eat my hand. And speaking of civilization crisis, look at this quote: "It is our choices that show us who we truly are, far more than our abilities."

At first glance, it just seems to be something that the Sorting Hat told Harry, regarding a personal matter of his. But think more deeply, and you'll see what it means.

For example, do you know about Osama Bin Laden? Who am I kidding - you do... everyone does... But does everyone know that he was a gold medal winning engineering graduate from the MIT and worked for the Pentagon before becoming one of the most hated men in the world? I think not. He had the ability to be the

world's best engineer, the best inventor... he could've done who knows what? He could've prevented accidents, losses.. but what did he choose to do? He chose to be the most hated and hunted terrorist in the world.

And his choice showed us what we can become if we make the wrong choices.

So my dear friend, the answer... the help... it is all there between spells and potions and quidditch and noseless guys. All we have to do is to think of things in a different way like the twins and break the barriers and fly to freedom.

● **Srujana Kamath (Student, Information Technology, Birla College of Arts, Science and Commerce)**

1. How did you become a reader of Harry Potter?

I believe I was 9 years old when my neighbour, Pradnya di, first introduced me to the magical world of Harry Potter. I remember quite vividly her telling me the stories, but I don't remember the story as a 9-year-old at all. What I do remember, is her eyes sparkling bright when she mentioned how the friendship between Harry, Ron and Hermione is portrayed or how the Headmaster of Hogwarts is quirky and hilarious or how beautiful Hogwarts is. I believe that was what motivated me to buy the Harry Potter books in the summer vacation of 2006. The first book I bought and read was Goblet of Fire, which had me gripped so fiercely, that I bought Philosopher's Stone and Chamber of Secrets as well. I had to wait until my next summer vacation to buy the Prisoner of Azkaban and the Order of Phoenix. The next summer vacation, I contracted with a nasty case of chickenpox, and I must say I enjoyed it thoroughly, all thanks to Harry Potter. 2010 was quite an exhausting year for me emotionally, and Harry Potter got me through that year. I read the Half-Blood Prince and the Deathly Hallows in the same year.

2. How has Harry Potter become a cherished part of your life?

Harry Potter happened to me when I needed a friend. It happened to me while I was dealing with the angst of growing up. It happened to me again, while I was dealing with a mild case of depression. It happened to me when I just wanted to quit. Time and again, it happens to me when I need some purpose. The quote "Happiness can be found even in the darkest of times, if only one remembers to turn on the light." and "We've all got light and dark inside us. What matters is the part we choose to act on.

That's who we really are." are the two quotes that have always kept me going. It taught me to be strong under the pressures of this world and to hold fast to what I knew to be right. These books taught me so much, they changed me as a person. The magic, the bond, the feelings and the morals are why it is the most cherished part of my life. It is a very comforting feeling to read "Hogwarts will always be there to welcome you home."

3. Does Harry Potter, a fantasy tale, have any bearing on our ruthless, real-world lives?

Harry Potter definitely has a bearing on our ruthless, real-world lives. A child growing up in abusive conditions that would give Cinderella the horrors, the equiva-

lent of racism with the pro-pureblood attitude, the imbalance of power and resultant abuse inherent in slavery, a justice system that is the opposite of just, mistreatment of the underprivileged, tyranny of the government and their interference in the education system, chauvinism, racism, sexism and prejudice are a few things on the top of my mind with which I could relate the real-world in the book.

4. Would you say that you are indebted to the Harry Potter books? Tell us about some of the life lessons you learnt from them.

I am forever indebted to the Harry Potter series because of the reasons I've stated above. Also, I made a few wonderful friends that I can call a family. Not only has it given me an escape when I needed one, but also a sense of perspective every time I read it. It has given me a sense of reality. It has made me appreciate this imperfect world, this imperfect life. It has humbled me. It has taught me that being different is alright, as is being wise beyond your years. It has taught me that the "greater good" is supposed to be achieved by simple means and not by violence or hatred. It made me realize how desperate people become and that they can do anything when it comes to FAMILY; both in a good and a bad sense. It has taught me to face every little fear. Harry's fear for a boggart and not Voldemort, taught me that the only thing we ever fear is fear itself. It has taught me to be ambitious, but not let my ambitions get the best of me. It has taught me to stand up for what is right, no matter who it's against, friends or foes. It has taught me that power has the power to build you or to destroy you, and that it is difficult to choose between the good and the evil, but you always have a choice. It has taught me to be acceptable and adaptable. It has taught me the consequences of greed. And most of all, it has taught me the

importance of friendships and relationships. It has taught me the importance of Love.

5. Do you feel that the Harry Potter books have contributed significantly to your identity? Could you elaborate?

The Harry Potter series has greatly contributed to my approach towards life and the world. It has shaped me into the person I am. I am recognized as a Potterhead almost everywhere, my parents and friends (who haven't read Harry Potter) think I've a crazy obsession, which is technically true. I make sure I ask if they are a fellow witch/wizard when I acquaint myself with a stranger. I can also proudly say that I've been responsible for the creation of a few Potterheads myself.

6. Why do you think Harry Potter has a role to play in today's world, when we are clearly witnessing a crisis of civilization?

Harry Potter is generally considered to be a children's fantasy novel. Those children, the readers, are the adults of tomorrow. Those children are us. Those children are the ones that are largely witnessing and living the crisis of civilization. So in order to stand up to it and fight for what is right, I believe we need more such children. We

need more readers. We need the "Defense Association"; because like Harry put it, "Every great wizard in history has started out as nothing more than what we are now: students. If they can do it, why not us?"

- **Jaita Saha (Software Engineer, Tech Mahindra)**

1. How did you become a reader of Harry Potter?

I came to know about the Harry Potter books when I was in class VI. I read in Anandabazar Patrika and Anandamela about how every other child/student in London queued outside the bookstore overnight to grab a copy when the fourth part, i.e. Harry Potter and the Goblet of Fire was published. Then I saw the first movie, Harry Potter and the Philosopher's Stone, at our neighbor's (they had the cable connection then, we didn't) and I loved the film. Being a big fantasy fan, (Thakurmar Jhuli, Alice in Wonderland, and many other fairy tales are my most favorite books) I was mesmerized to see the magical world of Hogwarts and wished to go there. From that day, I kept myself informed of when the next book was coming out or next movie was releasing. As the books were very expensive, I couldn't ask my parents to buy them and none of my school friends had them; I pledged in my heart that when I would be able to earn money, the entire Harry Potter series would definitely be the first thing I would buy. So I watched all the movies right up to Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1, and then the auspicious day came, when I was in the third year at college, a friend of mine told me that he had borrowed the first book of the HP series from a friend who has the entire collection, and if I am willing to read my friend can lend me the books every week but I have to return them within two days. I instantly grabbed the offer and that is how the first ever HP book came in my hand.

2. How has Harry Potter become a cherished part of your life?

I have already said that before reading the books I had already seen all the movies, which is a big setback as you are aware of all the spoilers and plot twists. But when I started to read the books, I started to become a part of the magical world. I wished with all my heart to be a student at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. In my mind palace, many a time I practiced the spells and thought about what my Patronus would be. I wished to see the magical creatures, dragons and centaurs; I wished to fly on Buckbeak. I wanted to live in 'The Burrow'; I wanted to walk through the enchanted staircases at Hogwarts. The world of Hogwarts and the relationship between the three friends took a cherished corner in my heart. In fact, even now at my workplace, almost every day I silently hurl 'Avada Kedavra' at my project manager who is an exact replica of Prof. Umbridge. Harry Potter books are to me an escape from reality. I still wonder when I will get my call letter from Hogwarts, and board the Hogwarts Express.

3. Does Harry Potter, a fantasy tale, have any bearing on our ruthless, real world lives?

I have never classified HP books as fantasy tales. In every other situation, it has reminded me of our own real-world lives. Starting from how the high-born wizards treat muggles and poor wizards, everything clearly reflects the discrimination rampant in our society. Dolores Umbridge's nasty politics with education and the students very much reflects our educational scenario nowadays.

4. Would you say that you are indebted to the Harry Potter books? Tell us about some of the life lessons you learned from them.

Harry Potter books are very close to my heart and the lesson I have learned from them is that love is the most important thing our life - not our career, not money, nor power. You can never be happy or live our life to the fullest if you do not have the love and support of your parents and your family. I have learned that you should have the courage to face the world all alone and that you should take risks in life. I have made many new friends over Harry Potter discussions and conversations, but most importantly, the person who lent me his books has become a very important person in my life. I met my soul-mate owing to these very books, so in that sense I will always be indebted to them.

5. Do you feel that Harry Potter books have significantly contributed to your identity? Could you elaborate?

From the very beginning, I identified myself with the character of Hermione. I think of myself as her, as I was very studious and kind of bossy among my friends. When I was reading the books, and studying her characteristics, I tried to become helpful, kind-hearted and caring like Hermione. I tried in my mind to become daring and fearless, to know new things and to take risks in life like the three friends did, but I failed to translate my wishes into reality. I always wished to have the courage Harry had, but I failed as we are bound by the chains of reality. That is why the Harry Potter books will always be an escape route for me.

6. Why do you think Harry Potter has a role to play in today's world, when we are witnessing a crisis of civilization?

Harry Potter definitely has a role to play in today's world. We need everyone to be as courageous and pure-hearted as Harry. We need friendships like this in our real world. We need teachers like Prof. McGonagall and Prof. Dumbledore. We need an army like the Order of the Phoenix to fight against all evils of the society.

- **Srinjay Dutta (Analyst, HSBC)**

Hi,

The Harry Potter books are very special to me both for their timeless appeal, marvellous storytelling ability and for personal reasons. I have made lifelong friends in real life after lending them my Harry Potter books, I have made friends with all my favourite characters in the books, I have lent them to my best friends and enriched our friendship by sharing this beautiful magical world with them and I met the love of my

life through lending the books. It was an unforeseen chance event, and for this and for creating a permanent magical realm in my mind where I can relapse any time to run away from the imperfect world we call 'reality'; I would forever be indebted to Joanne K Rowling.

The answers to the questions Manash asked all of us are below. Before even typing them, I know they will be incomplete as one can never speak enough about their treasured memories. I would try to be to the point.

1. How did you become a reader of Harry Potter?

I had read about the books in the movie reviews in newspapers, read a lot about them in 'Anandamela' monthlies and Pujabarshiki editions and became extremely interested towards reading them when I was in class VI. I think 'the goblet of fire' came first in India as a book before the others and the first movie was about to come out. I was very fortunate to have parents who were from a middle-class family but would indulge their child when it came to reading. The books, as single novels, were quite expensive to compare with other Bengali novels for children at a time when the economy had not opened up, not everyone had smartphones or credit cards in their pocket. But unlike many of my friends who had to borrow the books from someone or from a library, I rushed through the first five in two years. Then, for the last two books, I had to suffer the infamous wait, the enormous tension for a Harry Potter book release. I got my 'Half-Blood Prince' copy on the 1st week of its release in 2005 and in 2007, my father brought 'Deathly Hallows' on the day it was up for sale. My heart was aching after I finished the book. I could not believe that this was it, the last piece of the magical jigsaw puzzle. But of course, in your mind, the magic lasts forever; Harry, Ron and Hermione's adventures are never ending in your imagination.

2. How has Harry Potter become a cherished part of your life?

I think the stories were enchanting; the answer is self-explanatory for the readers, adult and children alike. Who would not want to point a wand and turn a teacup into a rabbit, apparate anywhere he wants to go, fly with a broomstick/ thestral/ dragon (your choice!) and above all, live the charming boarding life in Hogwarts we all wanted to be a part of? But it is not just the magic, the fun, the many comedies and tragedies in the books, the incredible and suspenseful storyline, the unique characters and the endless discussions with my friends and family; the beautiful sense of childhood - the most wonderful part of life - that is contained in the books has left an imprint on me forever.

3. Does Harry Potter, a fantasy tale, have any bearing on our ruthless, real-world lives?

I have never thought that these books were only about magic. They were about the innate purity in our heart, the profound magic that is love and our ability to learn from the books and transform the ruthless real world into an ideal, peaceful, Utopian one

with the very best in us. The books told of a reality that was no less ruthless than our world, if not more. They were written in a time of war. I shudder to think what might happen if even the worst terrorist groups, corrupt governments, and giant, usurping 'democracies' become as heartless as Lord Voldemort.

4. Would you say that you are indebted to the Harry Potter books? Tell us about some of the life lessons you learnt from them.

I am indebted to the books because of the reasons I have stated: I made friends, made my old friends' life more complete, met my lady through the books. But I am also indebted to the books for the magical realm built forever inside my mind where I can run away anytime I want. I think all of us will agree that books taught as life's most important values:

❖ Love is all conquering and the most important thing in life. To love and be loved, as a mother and son, as a teacher and student, as lovers, as the very best of friends, even an act of love and kindness to our enemy (remember Harry holding Snape¡¦s neck wound and fulfilling his last wishes) is the most important thing in life.

❖ You can count upon your true friends anytime. Even at the point of risking their lives, they will stand beside you. Who are your true friends? You will know them in your heart. I honour friendship the most in life; it comes without any price or compromise, and can be the best gift one can give to another.

❖ Courage can come from anybody, even the weakest of persons. One should never underestimate anyone's ability to stand up and perform when everything is at stake.

5. Do you feel that the Harry Potter books have contributed significantly to your identity? Could you elaborate?

I became a wizard in my mind after I read the books, I am sure I would be excellent in defence against the dark arts, potion brewing and ancient runes, thank you. I would make an average Quidditch player. My wand would be 10 and a half inch, dragon heartstring, Yew.

6. Why do you think Harry Potter has a role to play in today's world, when we are clearly witnessing a crisis of civilization?

Every great work of art has relevance in human society, for they are the proof of the very best qualities in us, the work of the very best talent in us, devoid of any impurity and darkness. The crisis of civilization is mainly a moral crisis, an act of self-denial when we go on about all the scientific, technological, democratic progress we make and ignoring every atom bomb, chemical weapons, global warming, pollution of the whole planet, racial hatred groups, terrorist activities, corruption, lies etc. ; pushing them under the carpet. We must acknowledge them, be brave and fight against them; never giving up even when everything looks bleak. Like ''Dumbledore's Army'', like the ''The Order of the Phoenix''. Like Harry.

Author based in Kolkata is a post graduate in English & sub-editor of the magazine "Tyremark"

পরবাস থেকে

উলটো রাজার দেশ

অরিন্দম চক্রবর্তী

মাধ্যমিক, ১৯৮৫

দিনটা ছিল রবিবার। আগের দিনই আমরা, মানে আমি আর আমার গিন্নি, গভীর রাতে প্লেন ধরেছিলাম বোম্বে থেকে। গন্তব্য সান ফ্রান্সিস্ক থেকে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণে সান্টা ক্লারা শহর। আমার চেনা এক বন্ধু পৌঁছে দিয়েছিল এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে। আগের দিন থেকে ভালো ঘুমতেই পারিনি কারণ পুরো রাস্তাই সূর্য ছিল আমাদের সঙ্গে। প্রথমেই ভাবলাম ঘরে ঢুকে একটু ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না। হোঁচট খেলাম হোটেল-এর ঘরের দরজায় এসে। চাবি কিছুতেই ঢোকে না। অনেক চেষ্টার পর বুঝলাম চাবি উলটো দিকে ঢোকাতে হবে। তারপর ঘোরাতে হবে ঘড়ির কাঁটার উলটো দিকে। এ কোথায় এসে পড়লাম রে বাবা!

বাইরে ঝকঝক করছে রোদ ক্যালিফোর্নিয়ার দুপুর বেলায়। ঘরে ঢুকে প্রথমে অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। জানলায় ভারী পর্দা। আলো জ্বালাতে গিয়ে দেখি সুইচ তো অন করাই আছে, কিন্তু জ্বলছে না কেন? সুইচ ওপর দিকে ওঠাতেই আলো জ্বলে উঠল। তাহলেকি ওরা কানেকশন-এ কোন গোলমাল করেছে? আমাদের দেশে তো সুইচ নীচে করা মানে অন আর ওপরে মানে অফ। বাথ্রুম-এ চেষ্টা করা যাক। বাথ্রুম-এও সেই এক ব্যাপার! এযে দেখছি উলটো রাজার দেশ। বেশ ধকল গেছে। আর বেশি চিন্তা না করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকেল নেমে এসেছে। জানলার পর্দা সরিয়ে দেখি সামনের বিশাল ৩-লেন আলো ঝলমল রাস্তায় গাড়ি চলেছে অবিরাম। ভাবলাম রাস্তা পার হয়ে অন্য দিকের দোকান থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসি। রাস্তার ডান দিক দেখলাম একদম ফাঁকা। সবে একটা পা রাস্তায় ফেলেছি কি ফেলিনি, বাঁ দিক থেকে মনে হল অনেকগুলো গাড়ী যেন হর্ন বাজাল! দেখি সারি সারি গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়েছে আমার মতন অর্বাচীনকে এভাবে রাস্তায় নামতে দেখে। অবাক করা ব্যাপার সে সবাই দাঁড়িয়ে আছে যতক্ষণ না আমি রাস্তা পার হই! এও সম্ভব! মনে পড়ল হাইয়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার নম্বর বেরোনোর পর মহানন্দে বিটি রোড পার হতে গিয়ে মিনি বাসের নীচে পড়তে পড়তে বেঁচে যাবার কথা।

বেশ বড় একটা গ্রোসারী দোকান। ভাবলাম একটু জমিয়ে চা বিস্কুট খাওয়া যায় নাকি? খুঁজে খুঁজে একটা বিস্কুট-এর টিন আর একটা চা-এর প্যাকেট নিয়ে হোটেল-এ ফিরলাম। গিন্নি লেগে পড়লো চা বানাতে। কিন্তু চা প্যাকেট খুলতেই আমাকে তলব। "এই তোমার চা আর বিস্কুট"? বুঝলাম কিছু একটা গোলমাল ঘটেছে। চা-এর প্যাকেট-এর মধ্যে ডিপ করার পাউচ তো রয়েছে, কিন্তু সেগুলো এক একটা এক এক ফ্লেভার-এর। কোনটা রাস্পবেরী তো কোনটা ব্লুবেরী! বিস্কুট দেখে তো আমরা হাসবো না কাঁদবো বুঝতে পারলাম না। টিন কাটতেই বেরোল একটা নরম নরম থকথকে পদার্থ। ভালো করে টিন-এর গায়ের লেখাগুলো এবার পড়ে দেখলাম। ওটাকে নাকি ওভেনে বেক করতে হবে বিস্কুট বানাবার জন্য। আমরা সেবারকার মতন চা বিস্কুট-এর আশা ত্যাগ করে ভাবলাম একটু বসি টিভি দেখার জন্য।

বোম্বে এয়ারপোর্ট লাউঞ্জ-এ বসে শেষ দেখছিলাম ওয়ান ডে ক্রিকেট। ভাবলাম যদি খেলাগুলো দেখা যায়। নাহলে খবর-এর চ্যানেল তো আছেই। টিভি চালাতেই পরদায় ভেসে উঠলো একটা স্টেডিয়াম, আর সেখানে হেলমেট আর বর্ম পরিহিত কালো যোদ্ধারা যেন একটা ফুটির মতন বল নিয়ে লড়ছে। ওটা নাকি এখানকার ফুটবল! চ্যানেল পালটাতেই এবার দেখি বেসবলের লড়াই চলছে। নিউজ তো কিছু মাথাতেই ঢুকল না।

তাড়াতাড়ি টিভি বন্ধ করে দিলাম। তখন তো আর এত ভালো ইন্টারনেট ছিল না, তাই আর কোন উপায় দেখলাম না ক্রিকেট দেখার। আর কিছুদিন পরেই বিশ্বকাপ শুরু। ক্রিক ইনফো বলে একটা ওয়েবসাইট সবে শুরু হয়েছে নেটস্কেপ বলে একটা ব্রাউসার-এ দেখার জন্য, কিন্তু ৩-৪ টা ওভার একসঙ্গে হবার পর ওরা আপডেট দিতো। ওভাবে কি খেলা দেখা যায়? ধুৎ এ কি দেশে এসে পড়লাম রে বাবা।

পরের দিন অফিস শুরু। পুরো অফিস বিল্ডিং কমপ্লেক্স এতো বড়, কিন্তু লোকজন বিশেষ নেই। যারা আছে তাদের পোশাক দেখবার মতন! কেউ বারমুডা আর চকরা বকরা জামা, কেউ আবার হাত আর গলায় রঙ বেরং-এর চেন। এভাবে কি কেউ অফিস-এ আসে আমাদের দেশে? আমার সাথে যে সাহেব কাজ করবে সে সকাল থেকেই বীয়ার-এর ক্যান হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কখন লাঞ্চ খাবে দেভ? ও বলল ''No man takes lunch!''। আমি তো অবাক। তারপর ঠিক হল আমার ম্যানেজার জন, দেভ আর আন্দ্রেয়াস বলে আর একজন সাহেব যাবো কাছেই একটা জায়গায় লাঞ্চ খেতে। লাঞ্চ-এ গিয়ে তো ওরা তিনজন প্রথমেই একটা ১ গ্যালন-এর বীয়ার অর্ডার দিয়ে বসলো। বেশ জমিয়ে খাওয়া দাওয়ার পর জন বলল এক এক জনের ১২ ডলার করে দিতে হবে। আমার তো আক্কেল গুড়ুম! দেশে কি অফিস থেকে লাঞ্চ-এ গেলে নিজেকে পয়সা দিতে হয়? মনে পড়ল না।

কিছু দিনের মধ্যে ওখানকার ভারতীয় কলিগদের সাথে পরিচয় হয়ে গেল। এক শনিবার আমার এক কলিগ প্রশান্ত ওদের বাড়িতে যেতে বলল আমাদের। আমরা দেখলাম এখানে কেউ বাড়িতে ডাকলে লাঞ্চ অথবা ডিনার খেতেই হবে। প্রশান্তর বাড়িটা কাছেই, কিন্তু এখানে গাড়ি ছাড়া রাস্তায় হাঁটলে লোকে ভাবে ভালো পোশাক পরা গৃহহীন (Homeless)। তাই ওরাই আমাদের নিয়ে গেলো ওদের বাড়ি। ওদের বাড়িটা বেশ সাজানো নিরিবিলি। একটু পর আমাদের আর এক কলিগ অনিলও এসে পড়ল সপরিবার-এ। কিছুক্ষণ আড্ডার পর প্রশান্ত আমাদের জিজ্ঞেস করল, ''রাইস কে সাথ ক্যা লেগা? কোক ইয়া অরেঞ্জ?''। আমরা মনে মনে ভাবছি এরা কি ভাতের সাথে কোক খায়? কি জানি বাবা এখানে সবই সম্ভব। ওকে বললাম আমাদের জল হলেই চলবে।

কফি এখানে খুব চলে, সারাদিন এখানকার লোকেরা মগ মগ কফি খায়। কিন্তু আমাদের এখানকার কফিও ঠিক জমছিল না। ভীষণ কড়া স্বাদ। একদিন বিকেলে গিন্নিকে নিয়ে একজনকে আনতে গেছি এয়ারপোর্টে। হঠাৎ চোখ আটকে গেলো একটা কফির দোকান-এর তালিকায়। লেখা আছে ''Double Espresso'' কফি। আমরা তো উচ্ছ্বসিত, এবারে একদম ঠিকঠাক জিনিস পাওয়া গেছে। ''Espresso'' কফি আমাদের দেশে দেখেছি বিয়ের বাড়িতে গিয়ে, ফেনা ওঠা কাপ-এ চুমুক দেবার স্বপ্ন তখন আমাদের চোখে। বেশ কয়েক মিনিট পর আমাদের হাতে যেটা এলো তা দেখে আমাদের চক্ষু স্থির! ভয়ানক কালো আর ঘন একটা তরল, পরিমাণ গড়িয়াহাটে ছোটো প্লাস্টিকের কাপে এখন যে চা দেয় তার চেয়ে বেশি হবে না। মুখে দিয়ে মনে হল কড়া কোনো ওষুধ খাচ্ছি।

এই সবের মধ্যে দিয়েই শুরু হল আমাদের উলটো রাজার দেশে পথ চলা। কিছুটা চলার পর মনে হয় সব কিছু আর অত বুঝি আজগুবি নয়। আমাদের বিদ্যাপীঠের স্যার অশোকদার ভূগোলের গল্পের মতন যদি স্থান, কাল, আর পাত্রের যোগাযোগ ভেবে নেওয়া যায়, তাহলে পঞ্চ হ্রদ-এর দেশ মনে হয় না খুব অচেনা। এদেশের মানুষের সাথে মিশে অনুভব করি কেন এই পার্থক্য। আমাদের জীবন এগিয়ে চলে আঁকাবাঁকা পথে নতুনের সন্ধানে।

(লেখক JP Morgan Fidessa Corporation, New York, এর Enterprise Technical Manager)

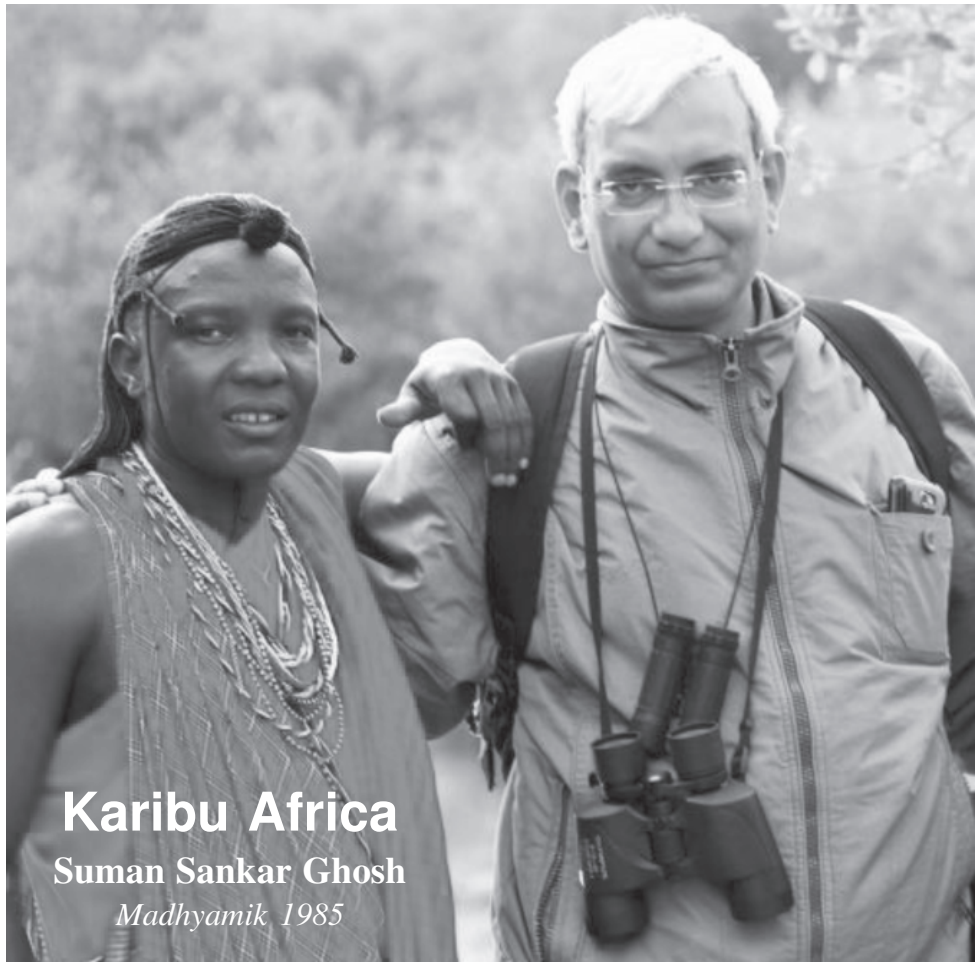

Karibu Africa

Suman Sankar Ghosh
Madhyamik 1985

It was a hectic Friday in Mumbai. I was toiling hard in my office to complete an urgent presentation to the Board in my Friday casuals, when I received the call. It was a call from one of myriad placement agencies enquiring if I am open to change my job. I was disinterested at the beginning but the job was in Africa. Well just to cut things short, I agreed to appear for an interview and to my utter surprise, I was informed that the interview will happen on the same day at LeelaKempenski hotel. The hotel was not far from my place of work and I knew that I can spare an hour from my schedule to explore the opportunity but I still insisted that I am in casual dress, and not ready for the interview. However the lady was persistent enough and I agreed reluctantly. So I reached at the hotel at the scheduled time and got interviewed, came back to my busy never ending work schedule and promptly forgot the entire episode.

At about 15 days from the date of the interview I received another call from the same head hunting agency. Yes nowadays, the HR organization goes for hunting the heads of the prospective employees. Well, I was informed that I had been selected and after a

prolonged negotiation (believe me it is a fish market!) I agreed to join the new Organization.

Many things started to happen simultaneously and too fast to make any sense. First my present organization did not want me to go, my parents and my well wishers were horrified that I am going to Africa, my family was shell shocked. But amidst all these chaos and frantic activity at remote corner of my mind, Africa had already started to take root. The same Africa we read about in Betal(Phantom for the more anglicized) the same Africa of ChanderPahar, the same Africa where Rijuda used to travel. The attraction to go to this so called "Dark Continent" was so strong that it was almost physical.

One fine day, against all the advices of my family and friends, I started for the unknown. My destination was Dar Es Salaam in Tanzania. The Emirate flight was uneventful and on the same day after a 7 hours flight, I reached.

The first impression of Africa was an anticlimax. While landing at the Dar Airport, I was hoping to see some wild life, some forest but all I saw was a sea of buildings. After clearing immigration I took another flight to a place called Arusha. Things started to become interesting. The inland plane was a small 5 seater plane. After stowing away my luggage I sat beside the Pilot and we started flying. 10,000 Feet down below Africa started revealing itself. The maze of buildings gave way to limitless savannah dotted with volcanic craters. From my previous research in Google I knew Arusha is at a height of 1,500 meters from the sea level and near Mt. Kilimanjaro. But Google never ever told me that Arusha was so beautiful. 45 minutes into our flying we started to descend at Arusha airport sorry! airstrip. It was a plain grassland and I could see the herd of Zebra and Wildebeests roaming around where our plane was supposed to land. The pilot took the plane quite low and made a pass 10 feet above the airstrip. The wilderness ran helter skelter at the sudden attack of civilization and the pilot made a perfect landing. In my mind I was murmuring "Africa here I come".

Arusha stunned me with profusion of violet. Everything seemed to be painted in various shades of violet. It was surreal. The Jacaranda trees which were everywhere were in full bloom and painted the landscape with violet. As I got down I was greeted by my Company representative and I knew that I was in Africa. He was Johnson a tall, lanky Masai in full Masai traditional dress complete with a spear. He welcomed me profusely at least that is what I thought because he spoke only Swahili with a smattering of English. Later on when I came to know him well, he told me that he was cautioning me about the lions and the hyenas which were common place in and around Arusha. Nevertheless grinning from ear to ear and nodding my head to everything that Johnson had to say and not understanding a single word of it, I reached my office. To my utter relief I saw an Indian there as my boss and he showed me around and was kind enough to show me the house that I was going to stay.

Arusha is a small town in Northern part of Tanzania. It is nestled between, Mt.

Kilimanjaro, the highest mountain of African Continent at 19,000 feet and Mt. Meru the third highest mountain of Africa at 14,000 Feet. The temperature never rises above 25 degree and does not fall below 10 degree. One side of Arusha is full of tall coniferous trees and the other side is the beginning of the vast savannah which is popularly known as Serengeti. Being situated on the southern side of the Equator, the weather pattern is just opposite to India. Starting from November till February it is summer and the rest of time is winter. It rains twice a year in March - April and in December. From the sweltering heat and the crowded environment of Mumbai, Arusha came across as heaven to me.

As time flew by, I settled down in my new home. The hardest part was to make people understand my surname. One day I visited a hospital due to some stomach infection and the nurse wrote my surname as "Ghost" and started laughing loudly. I thought she had never seen an Indian so she was laughing. But she explained to me in broken English that a "Ghost" had come to the hospital was too much for her to digest. Very soon I learned that they put a vowel after every word they speak. So "Police" is

pronounced as "Polici" and I was fondly called "Sumani". One Indian technician was there who became the butt of constant ribbing. The poor fellow's name was Raj Kumar and everyone used to call him Raj Kumari.

One day one of my colleagues who was also a Masai invited me to his home to have traditional African dinner during the time of Saba Saba. Before we sat down for dinner I requested my host to explain everything that we were going to eat so that I could fully understand the tradition. Many others were also invited but they were all African and at home with the rituals. An elaborate fire was lit in the garden and the invited ladies started dancing going around the fire. The gentlemen with their spears started jumping up and down shouting some blood curdling sound. My host explained to me that they were doing "Kuruka Dance". Amazingly the tone of the song, the beat of the drums were very similar to the tribal music of Purulia. In an instant I forgot that I have travelled 6,000 miles and I am not at home. I also joined them in their celebration. Elaborate dinner was served and my host was mindful that being an Indian I may not like beef so it was no-beef menu. Ugali (Boiled Maize flour), NyamaChoma (roasted meat chops), some type of stewed meat soup with many vegetables and finally desert. The food was without any salt and spices. So for my palate it was tasteless but everyone ate heartily so did I. Desert was some type of milk in vermilion colour. I tasted that too and it was very bad for my taste. However I gulped it down smilingly. Now it was my host's turn to explain me what things I ate. Till the nyamachoma part I was fairly ok. But when he explained that the meat stew was made out of Crocodile tail meat and banana I felt little nauseated but the cherry on the cake was the desert. It was a mix of fresh milk and blood from the cow's neck. As my host explained me the benefit of this concoction, I kept on grinning.

With the passage of time Africa has taken firm root within me. Now I can speak a smattering of Swahili, at least I can compete with BudhadebGuha's Swahili vocabulary. There are many common words between Hindi and Swahili, like "Kalam", "Faida", "Kitab", "Dawa", etc. I guess it's the Arabic influence on both the languages. The people are warm and very cordial. Because of the exploitation of the western world and lack of basic education they are poor. There are many tribes in Africa, Masai is one of those tribes. Every tribe has their own language, culture and tradition. But Swahili is the common language in eastern part of Africa. As the sun goes down on the 3.36 degree south parallel, I feel grateful to the almighty to get a chance to witness this great continent.

Author is based in Arushu, Kenya working as Financial Controller, Coca Cola East Africa Ltd.

Musings on a journey back home

Samik Kumar Bandyopadhyay

Madhyamik 1987

I looked at the clock in the car dashboard - 18.30. GMT. Time to get back home. As I reversed the car into the road I could not help noticing that it had been a bright sunny day - the golden glimmer was still well spread across the surrounding trees, cars, fences, buildings, everywhere. I remembered one of my small comments made to a friend on the phone and suppressed a wry smile. In my early days in Manchester, a student of mine (now a surgeon of repute himself) had asked me how the weather here was like (Oh! A classical British question to start a conversation). Not knowing how to describe the off on cycle of rain and sunshine I had summed it up in a small quip - just like the moods of an adolescent girl.

I winded up along the A road - the windy bendy country road that would eventually take me home. At this time of the weekend I was the lone motorist - a not so infrequent privilege I always relished thoroughly. As I kept on meandering along the windy, bendy road I could not help noticing the various shades of crimson and vermillion that was splashing along the sky creating a masterly canvas across the firmament. It was early autumn (across the Atlantic they would call it the beginning of fall) and the tall trees on both sides had started shedding their leaves - a few weeks later they would stand bare and upright like a lonely wiry tower each. Whatever remained till now was a mixture of yellow, copper, brown and pale green - the colours creating an undefined maze that was meant to be watched in silence and enjoyed.

I have always enjoyed the colours of twilight. As I kept on moving towards home, my thoughts slowly turned to the different places where I had gathered such blissful memories. I slowly became aware that the first time I had stopped playing with my friend to look at the sky and be taken aback by such ethereal beauty was at the place I have cherished ever after - my school. Very few places can actually experience such wonderful colours in the summer evenings. The vast fields palisaded by the rows of eucalyptus trees, the wafting evening breeze, the occasional arcade of thin clouds, the slight nip in the air as the sun slowly set, everything would add to the enchantment that always pervaded the air as dusk creeped in. We were by then a frolicking bunch of teenagers,eager to understand the sights and sounds of the world as much as a curious puppy and never ceased to be mesmerised by the beauty that was on offer day after day, week after week, year after year.

Anyone who has had the privilege of seeing the countryside aflame with Palash flowers in the evening or has smelt the intoxicating sweet smell of the Kurchi flowers will never forget Purulia, the place where I have had the most formative and the best

years of my life. I earned friends who are still more of a family. I had my teachers who not only taught me but inspired me, directed me and handed me over an arsenal of values which have shaped my life. The four hour journey from Durgapur to Purulia that I made on a fateful January morning in 1983 set me off on a quest that will possibly last till my remains go back to mother nature - a quest for harmony, for realization, for perfection and understanding of oneself as well as the world.

It was much later when we exchanged ourexperiences with those of other residential schools I realized what a decent group of people we had been. No, we never used Bunsen burners to skew up burettes and pipettes to mind boggling shapes. We never hung from ceiling fans to see if we could make it look like a lotus. We never tried to dance on table tennis boards. However, in the midst of a strictly maintained disciplined ambience we had our own community feelings of fun, laughter, grief and caring. Who can forget handing over the books to the friends who would unflinchingly carry them to the work education classes, bind them back and hand them dutifully? Who can forget the tiny shirts that used to be made in the tailoring classes for the puppies whimpering in winter? Fraternising and sharing was the norm rather than an exception. The transgressions were innocent, funny and unforgettable.

The canine cacophony that usually accompanied the dining bells had become an inseparable part of Vidyapth life. Dining hall experiences were always colourful ones. Samosa s had been introduced to the evening snacks for a long time as an evening snacks - it was an instant hit. Unfortunately, monotony has a way of it" ownway of turning pleasant things unattractive. As months passed the samosas became one of the least liked evening treats.No one knew how to get the point through without creating a semblance of fuss. The quickest solution was to turn into a dog lover, daintily sharing an evening snack. However, fads catch on and the number of such dog lovers increased exponentially. The inevitable followed - any invitation to the samosa treat was responded to by a sniff and a wagging tail but nothing more. It ultimately took a surreptitious pyramid building with samosas to ensure that peace prevailed.

The annual school exhibition was always a wonderful time. For people involved directly with the exhibition, it was a time of hard work and excitement rolled in to one. A decision had been made to dissect a few animals for the Biology exhibition. Toads and Mice surrendered meekly to a liberal dose of chloroform and were displayed quickly. The next to go under the knife was a garden lizard which was, in a way, unusually plump and long. Our teacher had to think for a few more seconds about the amount that may be necessary to deal with this creature. Bottle, beast and chloroform were screwed tight and a few minutes later it seemed just right to start the dissection. The waxboard with a layer of water was waiting and the creature with almost a foot long tail was heaved into it. The next few moments were sheer magic. The lizard opened its eyes and looked into the eyes of his tormentor who was fidgeting with his scalpel. The lizard raised its

head - our teacher moved his head back. The lizard turned on his side and our teacher turned sideways too anticipating an imminent disaster. The lizard jumped straight into our respected teacher"s shoulder - he jumped back with an equal spring. The lizard sprang into the floor and ambled off at full pace turning back and swinging his tail while crossing the door leaving behind a dazed group of enthusiasts and an equally horrified teacher.

I looked at the GPS navigator. I was halfway home. When we went out on our annual excursions did I imagine that one day I would be driving home like this? Did I ever imagine that the languor I was feeling now would be the same that I used to feelwhen we were on our way back to the Vidyapith with the dusk settling slowly as the bus edged on therural highways at the end of the annual excursion day? The occasional tawny owl was now softly hooting around and my mind drifted once more to the various night sound that we used to hear while walking back from the dining halls or the prayer hall. The sounds of nature have an amazing similarity wherever one may be, I thought to myself.

Childhood pranks may sometimes be unfair and unkind. How could I forget the day when one of the known rebellious characters had made good use of a blanket and bedsheet at night to create an illusion of a floating apparition and had cornered people into odd places? Too bad, I did not then know that there were many more things in heaven and earth that were never dreamt of in the newspapers. My wife, a Gynaecologist by profession had been left quite dazed a few days ago when one lady immediately after her operation accurately described a nursing staff and her dress that matched a matron who had left the world half a century ago.

As I collected my thoughts I took a left turn into the final stretch of the motorway. As I wheeled along my mind kept on racing through hordes of memories once more. My classmate, my teachers, the sannyasi maharaj, the non teaching faculty, all of whom had a single minded devotion in promoting the cause of education and indulged in man making with an unmatched fervour. We, the members of the Vivekananda regiment have not yet produced presidents, prime ministers and nobel laureates but we are possibly quite close to that enviable distinction. What we may be justly proud of is that we belong to a heritage that has gifted the country and the world a phenomenal number of model citizens and good people. As I eased my car into the driveway I reminded myself of the enormous pride that I carry in my heart - I am proud to have belonged to Vidyapith, I am proud to be a Bengalee (or shall I call it a Bong) and I am proud to be an Indian. Arise, Awake and Stop Not Till the Goal is Reached - I carry the motto in my heart and wear it proudly on my sleeve. Vidyapth - I bow my head to you, I bow down to all my teachers and guiding lights, to all members past and present who have been associated with this wonderful organisation. May the show go on…..

Author is Manchester based Surgeon at Leighton Hospital Crewe, U.K.

প্র ব ন্ধ

স্কুল ছুটির পরে

ইন্দ্রজিৎ রায়

মাধ্যমিক, ১৯৮৫

"ভোরে অন্ধকার থাকিতে উঠিয়া লংটি পরিয়া প্রথমেই এক কানা পালোয়ানের সঙ্গে কুস্তি করিতে হইত। তাহার পরে সেই মাটিমাখা শরীরের উপরে জামা পরিয়া পদার্থবিদ্যা, মেঘনাদবধ কাব্য, জ্যামিতি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল শিখিতে হইত। স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিলেই ড্রয়িং এবং জিম্‌নাস্টিকের মাস্টার আমাদিগকে লইয়া পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় ইংরেজি পড়াইবার জন্য অঘোরবাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনস্মৃতি (১৯১২)

প্রায় ১৫০ বছর আগে ঠাকুর পরিবারের এক বালকের অভিজ্ঞতার সাথে বর্তমান প্রজন্মের অনেকের খুবই মিল। আমরা, আধুনিক বাবা-মারা, আমাদের সন্তানদের জন্যেও ''নানা বিদ্যার আয়োজন'' করেছি। তার মধ্যে অবশ্য ''অ্যাকাডেমিক''ই বেশি—স্কুলের পড়ার উপরে প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়া, বিভিন্ন কোচিং ক্লাসে যাওয়া। পড়াশোনা ছাড়া ''একস্ট্রা কারিকুলার'' বিদ্যা—আমার সন্তান যেন বাড়ে অলরাউন্ডার হয়ে—কম্পিউটার তার পেশা হবে, ক্রিকেট হবে নেশা, সঙ্গীত শখ, কালচার হাতের পাঁচ।

নানা বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা বা অলরাউন্ডার গড়ার উপযোগিতা বলাই বাহুল্য তর্কসাপেক্ষ। একদিকের যুক্তি হল ''অল ওয়ার্ক অ্যান্ড নো প্লে'' মোটেই কাম্য নয়; অন্যদিকে, অনেক বিশেষজ্ঞের মতে অভিভাবক হিসেবে আমরা সন্তানদের উপর বেশি চাপ দিই। এই বিতর্কটা শুধু আমাদের সমাজেই নয়, বিদেশেও প্রাসঙ্গিক। তবে, সেক্ষেত্রে সমস্যার রূপটি আলাদা। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বাবা-মা-রা চাকরি করেন, তাঁদের বাড়ি ফিরতে দেরি হয়, তাই স্কুলের পরে (সাধারণতঃ স্কুল ছুটি হয় সাড়ে তিনটে নাগাদ) সন্তানদের কোনভাবে নিযুক্ত রাখার জন্যেই প্রয়োজন ''আফটার-স্কুল প্রোগ্রাম''-এর, যার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন খেলা, সাঁতার, সঙ্গীত ইত্যাদি।

এই বিতর্কে (মনো—, সমাজ-) বিজ্ঞানীরা কী বলেন? সম্প্রতি আমেরিকার কানেটিকাট প্রদেশের জেনারেল অ্যাসেমব্লি-র এডুকেশন কমিটির কাছে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান (সাইকোলজি) বিভাগের এক অধ্যাপক তাঁর গবেষণাপ্রসূত ফলের ভিত্তিতে এক রিপোর্ট পেশ করেন। অধ্যাপকের নাম জোসেফ মেহনি; তিনি ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী মিলে সম্প্রতি যে গবেষণা প্রকল্পের কাজ শেষ করেছেন সেটির নাম ''দ্য ইয়েল স্টাডি অফ চিলড্রেনস আফটার-স্কুল টাইম''। আফটার-স্কুল অর্থাৎ ছুটির পরে বাচ্ছারা কীভাবে তাদের সময় কাটায় তাই নিয়েই গবেষণা। ২০০২ সালে গবেষণার শুরুতে অধ্যাপক মেহনি ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস থ্রি-র মোট সাড়ে ছয়শো স্কুলছাত্রকে বেছে নেন, যাদের অধিকাংশই গরীব ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারের; তারপর গত চার বছর ধরে তাদের ''আফটার-স্কুল টাইম''-এ পর্যবেক্ষণ করেন। অধ্যাপক মেহনি আফটার-স্কুল-র মধ্যে ধরেছেন বিদেশে সাধারণভাবে প্রচলিত চার রকম কার্যকলাপ—''আফটার-স্কুল প্রোগ্রাম'' (স্কুল ছুটির পরে স্কুলে বসে স্কুলের শিক্ষকদের কাছেই পড়াশোনা বা অন্যান্য শিক্ষা), ''স্কুল-বেসড একস্ট্রা-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজ'' (যেমন, ছুটির পরে স্কুলের মাঠে ফুটবল কোচিং), কমিউনিটি-বেসড অর্গানাইজেশন (যেমন,

পুরসভার নিয়ন্ত্রণাধীন সুইমিং পুলে সাঁতার শিক্ষা) আর ''ইয়ুথ সেন্টারস'' (যেমন, কোন ক্লাবে নাটক চর্চা)। এধরণের বিভিন্ন কাজে যে সব শিশুরা ''আফটার-স্কুল টাইম'' কাটায় তাদের সম্বন্ধে অধ্যাপক মেহনি তিনটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তিনি প্রমাণ করেছেন এই সব বাচ্ছারা, অন্যান্যদের তুলনায়, পড়াশোনা (অ্যাকাডেমিক পারফর্মেন্স)-য় ভাল, তাদের স্বভাব-আচার-ব্যবহার (বিহেভিওর)-ও তুলনায় ভাল, এবং এদের মধ্যে শারীরিক স্থূলতা (ওবিসিটি)-র লক্ষণ কম।

কিন্তু বিদেশের গবেষণা কি আমাদের সমাজে প্রাসঙ্গিক? ঠিকই; আমেরিকার কানেটিকাট প্রদেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে ভারতের বা পশ্চিমবঙ্গের বাবা-মা-দের মিল সামান্যই। বিদেশের সমস্যা আমাদের সমাজে এখনও হয়ত নেই, তবে হয়ত অদূর ভবিষ্যতেই দেখা দেবে। আফটার-স্কুল প্রোগ্রামের অভাব আমাদের নেই, ১৪০ বছর আগেও ছিল না; আমাদের সমস্যা ''একস্ট্রা-কারিকুলার'' শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে ও প্রকরণে। আমাদের বর্তমান সমস্যাটার চারটে দিক।

এক, অভিভাবকদের সমস্যা—আমরা বিভিন্ন খেলার কোচিং-য়ে আমাদের সন্তানদের পাঠাই চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড় তৈরীর উদ্দেশ্যে। শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য যে শরীরচর্চার প্রয়োজন আর শুধুমাত্র সেই তাগিদেই যে বাচ্চাদের খেলতে পাঠানো উচিৎ এটা আমরা ভুলে যাই। ঠাকুরবাড়ির কেউ পরবর্তী জীবনে বিখ্যাত কুস্তিগীর হয়েছে বলে খবর নেই, কিন্তু অন্ধকার থাকতে উঠে কুস্তি করাটা নিশ্চয় বৃথা যায় নি—রবীন্দ্রনাথের কথায়, ''ইচ্ছেমত কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা পেয়েছি ঝুলি ভর্তি করেছি তাই দিয়েই'' (ছেলেবেলা, ১৯৪০)।

দুই, স্কুলের বাইরে বিভিন্ন প্রোগ্রামে, কোচিং-য়ে যাবার সুযোগ মূলতঃ উচ্চ-মধ্যবিত্তদের পরিবারের সন্তানদেরই মেলে। এজাতীয় প্রায় সব কোচিং-ই বেসরকারী, যার ব্যয়ভার বহন করা নিম্নবিত্তের ক্ষমতার বাইরে। সমাজের সমস্ত স্তরে কার্যকরী সুলভ কোন সরকারী পরিকল্পনার হদিশ আমাদের সমাজে মেলে না।

তিন, ''একস্ট্রা-কারিকুলার'' (ক্রিকেট বা গান যা-ই হোক না কেন) বেসরকারী শিক্ষণ-কেন্দ্রগুলির সাথে পড়ুয়াদের নিজেদের স্কুলের যোগাযোগ কম। তাই শিশুদের কোন সামগ্রিক পাঠক্রম গড়ে ওঠেনা।

সর্বোপরি, পরিকাঠামোর সমস্যা—বিদেশের তুলনায় সেক্ষেত্রে আমরা অনেক পিছিয়ে। আমাদের উচ্চমানের পরিকাঠামো নেই, থাকলেও তা হাতে গোনা কেন্দ্রে, যা মুষ্টিমেয় কজন ভোগ করতে পারে।

তাহলে এর সমাধান কী? চারটি ভিন্নমুখী সমস্যার সমাধান বোধকরি একটাই। কাকতলীয় হলেও, সমাধানটা কানেটিকাটের সরকারের জন্য তৈরী অধ্যাপক মেহনি-র রিপোর্টের শেষ বাক্যে রয়েছে—''funding for after school programs represents an important and worthwhile investment''। শুধু কানেটিকাটে নয়, আমাদের সমাজেও প্রয়োজন বিনিয়োগ। চাই পরিকাঠামো—স্কুলে, পুরসভায়, জেলা-শহরে; চাই স্কুলের পরিপূরক হিসেবে শিক্ষণ কেন্দ্র। চাই সামগ্রিক পরিকল্পনা—বিনিয়োগ সরকারী বা বেসরকারী যাই হোক না কেন, পরিকল্পনা অবশ্যই সরকারের উদ্যোগে হওয়া উচিৎ। শিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে বেশ কয়েকটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যেগুলি ব্যবহার যেতে পারে নানান কাজে, নানা প্রয়োজনে। পাশ্চাত্যে এটাই রীতি। অধ্যাপক মেহনির গবেষণার ফল আমাদের ফল আমাদের সমাজে প্রযোজ্য নয় এমন ভাবাটা মুর্খামির সমতুল।

(লেখক ইংল্যান্ডের কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতির অধ্যাপক।)

Cafe Commoners

Ritwik Mukherjee

Madhyamik 1986

As I moved along in life, I have had many experiences and have gained some wisdom. It's always 'some wisdom', because there will always be more lessons ahead. Anyone would appreciate that wisdom can always be gained through experiences. These experiences are like beautiful, valuable pearls lying in the sand by your feet. These are like those pearls we often step over without noticing, without stopping to pick them up.

These pearls are placed in our paths when we need them the most, as if sent as lessons, meant to aid us and guide us on our paths.

I never picked them up as pearls. But as I look back and glance through what can best be billed as a 'common man's diary', I discovered or re-discovered these little, beautiful and invaluable pearls. Here's some of these pearls for you.

Different ball game?

In one of the recent adda sessions amongst friends, one of my close friends narrated what he had experienced recently. This friend of ours with a creative bent of mind has been planning to make a film and has been on the look-out for the right producer who would finance the film with the right kind of creative freedom to him. In the process he was introduced to this man, a lawyer by training and profession who is extremely keen on finding a toe hold in the tinsel town. He readily agreed to produce (or get it produced) the film—without even going through the script—on condition that he will have to be made the director of the movie. He even promised a couple of awards for that yet-to-be-made film. This friend of ours, who had been struggling to get a producer for his film, was in two minds on whether to make this compromise and threw it up for discussion amongst us.

We were immediately reminded of another friend of ours, who joined us in the college from a very rich family of businessmen. He used to come to college everyday in different cars. He always aspired to be in the college team in soccer and cricket, with hardly any prior exposures to these sports and games. We also knew that, for sure. But we used to keep him in the team, just to ensure that there were enough good cars to take us to the ground, there were enough snack and soft drinks of our choice, there were parties after the game, there were some additional sporting gears and kits for all of us, so on and so forth. He was not too demanding either. He would just field for 10/15 minutes and he would be happy!

We are yet to check out what this friend of ours who aspires to be a movie maker finally decided after being narrated this story of our college days. Or is it a different ball game altogether?

May Day

Bulbul Da is a simple man. But he is driven by extra ordinary philosophy and incredible enthusiasm. He does not necessarily make an attempt for that but he naturally stands out in whatever he does and says. His current address is well within the urban agglomeration of the city, but he hails from one of the most picturesque and agriculture-rich places of rural Bengal. And it's not too difficult to make out that his heart still stays along the serene and tranquil banks of river Jalangi, near Dhubulia in Nadia district.

On May 1, which is celebrated (not too sure if that's the right word!) worldwide as the international labour day, Bulbul da gave me a call pretty early in the morning, to share another of his simple-yet-extra ordinary plan of action. As he was explaining to me his POA for the day, I could hear those innocent voices, which sounded like chirping of the birds. He was already out with 19 kids including his son Zidane and daughter Jemima. These wonderful kids vouchsafed that they would clean up their village (Kalika Nagar) from plastics and other forms of dirt. These were kids in the age group of 4 to 10 years and not that they understood what they were up to. I was just wondering what would have brought those kids out on the street in this scorching heat with mercury soaring up to almost 42 degree? What was the incentive? Bulbul da had promised them that once they were through with their jobs, they could jump on the river, swim and play on the river for as long as they wanted. That's not all. In the afternoon there will be a unique game: 'catch the rabbit'. Whoever catches the rabbit, will get it. And then, they will be taken to bamboo-made make-shift cottage right on the banks of river Jalangi, with interesting story telling session by Bulbul Da. Kids were more than happy. So was the nature and it didn't cost anything.

All for a byline

It's all but natural that those who join media, particularly in various editorial roles, would get a kick out of his or her bylines when the paper hits the stand, the next morning. This veteran photo journalist, who was already in his pushing 60s, was no exception. In fact, many of his colleagues say that he used to get more kicks than most of his younger colleagues and I cannot but second them. He was very particular and insistent that all photographs either taken or sourced by him should come out with his name clearly mentioned on the credit line. He had a photographic memory and was incredibly methodical. You ask for any photograph and he would get it in minutes

from different racks of his old fashioned almirah. He also used to have his name stickers printed by himself and all photographs from him used to come with these stickers pasted distinctly on it.

Be it trading, transaction or membership, things at Calcutta Stock Exchange is otherwise nothing to write home about. But that was some special occasion for the over century old Calcutta Stock Exchange and the newspaper we used to work for at that point of time, thought of bringing out a special advertisement-backed supplement on the occasion. The editor and the page editors, were looking for some black and white photographs to go with the piece on "CSE: Down Memory Lane". This effervescent photographer was prompt enough to volunteer and came up almost immediately with some wonderful black and white pictures of the old and original building of Calcutta Stock Exchange. Those were the right pictures that would add a dash of nostalgia to the special pull-out.

This was not the regular main section of the newspaper and there must have been some flip flops on part of the sub editors who made the pages, besides insistence by the senior photographer himself. The next morning that special pull-out did come out with that appealing photograph of the original CSE building founded in 1830 and incorporated in 1908 in our dear photographer's byline!!

A Simple Business Model

In one of my previous professional engagements I came across this man. We used to work in the same office. Once he was promoted as clerk, from being a peon, albeit with a posting outside the city. But he left no stone unturned so that this promotion order was not put into effect. Because he thought his actual earning would come down, the more prestigious designation and higher pay packs notwithstanding. Much later we realised how wise and justified his decision was.

This extremely effervescent and hard working guy would never say 'no' to any job offered to him. He would particularly get excited on being asked to take up some challenging odd jobs. But nothing would come free. He would expect (read demand) some 'professional fee' or 'service charge' for whatever he does. And once he accepts some such 'assignment', rest assured it will be done, by all means.

If he is sent to the bank to deposit salary cheques, withdraw cash for any other purpose and so on, he would take his fees from each one of us. Similarly if he is sent to get food for five, six or seven of us, he would take the same 'professional fee' from each one of us. Mind you, in all such cases, he would be going to the same place and therefore his only investment, in this case, his labour, would be the same. So at no extra investment (labour) he would get his return or earning multiplied many times.

That's not all. By virtue of his incredible public relations and networking skills, he

would get some additional jobs from the banker or the food vendor or some other persons, who he would meet with our jobs. And those jobs would also be done for a fee. This entire cycle and mechanism not only ensures that his earning increases manifold but also guarantees that everyone's work gets done smoothly and hassle-free. He certainly has an important business model to offer. Doesn't he?

Burah na mano bhai, holi hai !!

The festival of colour is also changing its colour and complexion. I wouldn't risk another hackneyed discussion on 'our time and their time', because people say (and rightly so) these discussions are signs off ageing. But matter of factly, we used to have a blast, albeit of a different nature, at our ancestral place. We used to put up a make-shift pond on our concrete lawn to mix colours with water. None of our bros and sis was however allowed to touch that coloured water before the puja got over. Morning was for playing with water gun, while evening time was more sane and sober—playing with abir. The puja at home used to have its own attraction because deities could never air their choices and different types of prasadas were truly satiating our tastebuds. Now as my daughter and her friends celebrate happy holi and I also join them, it has its own charm as well.

Those who know me would take no time in saying that for me festival colour would be yet another occasion to celebrate with good food. Last evening also, I was out looking out for some gastronomical delights. There was a small precursor also. I tried almost a dozen of restaurants asking for 'home delivery', the tallest order and the most stupid one on such days. I realised that once I went out moving from one join to another along the self-styled food street in our locality. Restaurants were turning down orders-left, right and centre. When finally I could make it to the counter, placing my order, a young boy rushed in and asked, "What's there on offer in a special biriyani?" "A boiled egg, grilled potato, besides the chicken or mutton piece."—was the answer. The boy said, "Ok, pack six of them". The restaurant guy said, "Sorry we are completely run out of biriyani." The young boy was palpably annoyed, said, "Why didn't you tell me that in the first place?" and left in a huff. ..Bura na mano bhai, holi hai!!

Tailpiece

This is a story of a well known NRI entrepreneur and narrated to me by the man himself (although I would not like to name him). After a brilliant academic career, this gentleman went abroad for advance studies -quite like many others with such strong academic track record do. When he finished his advance studies, getting a well paid and respectable job, befitting his persona and qualification was not at all a difficult

task for him and understandably so. So he got one. By then this soft spoken man (an ambitious young man then), who had originally hailed from a far-flung district of West Bengal got used to living in the US amidst better opportunities and much better amenities. It was all but natural that he decided to settle abroad and got busy in was charting out his own course. He always wanted to do something on his own. He was getting increasingly busy in his works and was still regularly in touch with his family members, particularly his mother at his ancestral place. He used to keep his mother posted about every single career advancement, that he was going through in those days.

After couple of years and different successful stints with large fund managers, this quintessentially Bengali gentleman finally managed to convince some fund managers to back him in his own venture, a dream he had been nurturing all those years. He actually bought over a technology start-up to kick off his own operations. He was very thrilled and excited. One of the first few calls he made was to his mother. Palpably upbeat, this man called up his mom and told her .that her son was no longer just an employee. He actually bought a company and became an owner. His mother, a simple and extremely caring village woman replied, "That's really a very good news, my son and I have no doubt whatsoever that you will very good for yourself and others. But I hope you haven't left your job!"

The author is Kolkata based Senior Assistant Editor and Chief of Bureau of Financial Chronicle

Be a Good Hindu. Be a Good Muslim.

''The Christian is not to become a Hindu or a Buddhist, nor a Hindu or a Buddhist to become a Christian. But each must assimilate the spirit of the others and yet preserve his individuality and grow according to his own law of growth.''

– Swami Vivekananda

Global Warming Conundrum : What can we do?

Sankha Bhowmick

Madhyamik, 1986

Global warming is the most challenging problem to humanity in the 21st century.The complexity of the science is further exacerbated by a plethora of interest groups trying to shape environmental policy. Once politics enter the fray, the 'noise' soon drowns out the actual issues. At this point the debate and policies have become extremely contentious and no one knows how to move on them. So let us check the facts first.

Why does no one take it seriously?

The starting point of convincing an average person about global warming is challenging itself. Given how much we are inundated with sensational news on a nanosecond basis, if someone tells you that the earth has warmed up by 1^{o}C over the last century, what would you do? Yawn probably. If you then add that atmospheric CO_2 has been climbing at an unprecedented rate over the last couple of decades, people will shrug and say, so what? So herein lies the major challenge–there is no way to apparently sensationalize the problem. And once you cannot do that, it is hard to bring it to the public conscience. Why would someone take the problem seriously? So, to increase visibility, efforts are underway to sensationalize the problem. Dramatic pictures of arctic ice melt, disappearing glacierspolar bears losing habitat are being flashed on TV and computer screens. Pretty soon people have started blaming everything from Californian wildfires to hurricanes to record snowfall anywhere on global warming. And therefore a sane, rational person would turn skeptical.Also there are these anecdotes out there that the change in the earth's temperature is miniscule on the geological time scale. Doesn't the earth go through warming and cooling cycles? Like when there were dinosaurs during the warm period and we had a recent ice age some 10,000 years ago. So why bother?

Why is Global Warming a problem?

So why are scientists concerned in the first place? A basic understanding of the mechanism of global warming may help answer that question. Global warming takes place through a phenomenon known as greenhouse effect. Just like a greenhouse that allows sunlight to stream in through glass windows and heat the enclosed environment but prevents the heat from leaving through specially designed low iron content glass, the earth's atmosphere acts in a similar way to trap the heat in our planet. How does

this happen? Solar radiation, emanated by the sun at 5800 Kelvins is predominantly shortwave radiation (400-700 nanometers) in the visible spectrum (we call it light), the atmosphere allows a large part of this radiation to pass through(although ozone in the upper layer of the atmosphere is supposed to absorb the shorter wave length, less than 400 nm radiation like ultraviolet to prevent skin damage). The earth absorbs this radiation and warms up.In the process, the earth emits its own radiation. Since the earth is relatively cooler than the sun (300 Kelvin), based on radiation principles it emits long wave-length radiation (8-12 micrometers) known as infrared (IR) radiation. These radiation get mostly absorbed by the atmosphere and are re-emitted, most of which comes back to the earth. In general this is a good thing, without the atmosphere all the IR radiation would be leaving and the earth would be cold and uninhabitable. So, what is the fuss all about?

Well, the gases that absorb the IR radiation are called greenhouse gases, predominant among them are carbondioxide (CO_2), water vapor and to a lesser extent methane. While water-vapour has a natural cycle and can be controlled in the atmosphere, CO_2 doesn't have a normal recycling process and keeps accumulating in the atmosphere or in the ocean. Over the last 50 years the CO_2 in the air has dramatically increased predominantly through the use of fossil fuel combustion– the source of almost 90% of our energy. This CO_2 is being stored in the atmosphere, it is absorbing more radiation and emitting it back to the earth. There is indisputable evidence in the steep rise of atmospheric CO_2 in the last century. Models are predicting that at this pace, the heat trapping by the atmosphere will cross a critical threshold soon. This has alarmed scientists because we are unaware of a safety valve that will allow the release of CO_2 or the heat. Moreover, CO_2 is being absorbed by the ocean and causing ocean acidification that has been altering the marine ecosystem. Therefore, with increasing CO_2 content natural physics dictates that the earth will warm up.

What are possible solutions?

As a starting point, over 90% of our energy sources come from fossil fuel like coal, petroleum or natural gas. These sources are harnessed to generate electricity, aid transportation or provide heat the three major sectors of energy. Alternatives of fossil fuel have been rare, the energy or power density from the alternative sources are not high and the only long-term alternative source that is feasible– nuclear power has plenty of other complexities (think Fukushima disaster) that makes it a non-starter. From the viewpoint of cost, fossil fuels are still cheaper. This is where government intervention in the form of Carbon tax or some equivalent can be the only solution till alternative technologies like solar, wind, fuel cells are economically feasible. However, the major countries are mostly unwilling to take the steps since they are politically unattractive. United States has the largest carbon footprint in the world. It has not been able to make any legislation that helps alternative energy sources prosper.

On the other hand it has allowed alternative technologies like fracking to progress that allows the extraction of shale gas from locations that were previously not possible. The arctic front has been also opened to oil and natural gas drilling– this being approved by Barack Obama. All these factors have partially contributed to lowering gas prices across the globe (one of many complex factors), however it has not contributed one bit to lowering the carbon footprint that the US has left in the world. This lack of action by the single biggest contributor to the carbon footprint is morally reprehensible and therefore makes any actions on the IPCC report impossible to implement. Furthermore, nations like India, China, Brazil and other developing nations that are finally seeing some of the benefits of affluence, predominantly in the middle class, have now started to significantly contribute to the carbon footprint. The contention among developed nations and developing nations about how to tackle global warming and who should make the major sacrifices to reduce carbon footprint has left the world in a precarious position with very little political resolution in sight.

The problem is one in which very few are willing to make the sacrifice. Developed nations are unwilling or unable to make the changes necessary to address climate change. In the US, this is the most apparent. A powerful oil lobby controls politicians who benefit from their donation. This has prevented any meaningful legislation from making it to Congress. It is also a big proof of one of the enduring tragedies of democracy. The fact that all the developed nations have a functioning democracy and nothing meaningful regarding global warming has emerged from a majority of these countries is a testament to how democracy is not the panacea of all evils. A fundamental philosophical shift has to take place and this can only happen when alternative philosophies are introduced in the debate.

The solution is there for all of us to see. Developed nations want to come up with more complex technological solutions that may alleviate the problem but will create an entire generation of newer problems (like electric cars and fuel cells). At the same time non-technological simpler solutions are not being sought. Planting more trees in a consistent manner as a matter of policy is one of the major ways to move forward. Ensuring that we do not lose the lungs of planet earth in the Amazon, Sumatra and African rain forest remains the key to global warming. One can show that planting a dozen of trees per year by every family in this planet can offset global warming significantly. While this is technologically not an attractive solution, it remains the most feasible and logical one. I remember as a kid working on plays with my teachers at Purulia Ramakrishna Mission about afforestation - although the message conveyed is simple; it is a solution to global warming; and we the common people can take the lead.

Author is Professor and Chairperson, Mechanical Engineering, University of Massachusetts, Dartmouth

স্মৃতিসুধা

বোধোদয়

দীপক অধিকারী

হায়ার সেকেন্ডারী, ১৯৬৬

একটি শিশু নার্সারি স্কুল থেকে বেরিয়ে বড়ো স্কুলে ভর্ত্তি হলো। ধীরে ধীরে পড়াশোনার সাথে সাথে খেলাধূলার প্রতি আকর্ষিত হতে থাকল। দুরন্তপনায় কিছু খামতি ছিলো না। বাড়ির লোকেরা যথেষ্ট শাসনে বেঁধে রাখার চেষ্টা করার সত্ত্বেও দুরন্তপনা বা খেলাধূলার প্রতি আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। তার খেলাধূলার প্রতি আকর্ষণের জন্য ক্লাস ফোর-এ পড়াকালীন বাবা একদিন নিয়ে গেল এক জায়গায়। যেখানে শুধুই খেলা। নিজে খেলতে পাবে না। খেলোয়াড়রা খেলবে। সেই খেলা দেখতে যাওয়া। তাই বা কম কি? ওদের দেখেই তো শিখতে হবে খেলা। অতএব রোজ যেতে হবে। সে তো বোঝেনা যে রোজ এই খেলা হয় না একান্ত মরসুম ভিত্তিক। রোজ রোজ যাওয়া যায় না। স্কুল আছে। নিয়ে যাবার লোকও নেই। নেশাটা চেপে গেল। কি ডাকসাইটে সব খেলোয়াড়। তাদের নাম সব মুখস্ত। মাঝে মাঝে রেডিওতেও খেলার কথা শোনা যেত (ধারাবিবরণী)। জায়গাটা হলো মোহনবাগান ক্লাব। ওই ছোটবেলাতেই নামটা শুনলে রক্তে একটা আগুনে হলকা অনুভব করতো। পাড়া তে, মাঠে চলছে বিকেলে রোজ খেলা। পড়াশোনায় কি একটু ঢিলে পড়ে যাচ্ছে? বাড়ির লোকের কাছে অবস্থা তাই। ক্লাসে ওঠা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাড়ির লোকের মনে শান্তি নেই। অতএব ব্যবস্থা নাও। ঠাকুর্দা নিদান দিলেন বংশের একমাত্র ছেলে, কষ্ট হলেও, একে বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দাও। এর মধ্যে সে ছেলে স্কুলে বৃত্তি পরীক্ষা দিয়ে পাসও করে ফেলল। পরিণাম? অবাক হয়ে দেখলো বাড়ীতে ধুনুরী এসে লেপ, তোষক, বালিশ বানাচ্ছে। কেন? কোন উত্তর নেই। কয়েকদিন পরে সেই লেপ, তোষক আর ট্রাঙ্কের সাথে তাকেও ট্যাক্সি করে কোথাও নিয়ে যাওয়া হোল। সে এক বিরাট স্কুল। গেরুয়া পোষাক পরা কিছু লোক এবং প্রচুর ছেলে। সাল ১৯৫৯। শ্যামবাজারের মুক্ত পাখি বন্দি হোল "বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন" স্কুলে। খুবই আদর করে বড় বড় দাদারা এসে জিনিসপত্র নিয়ে গেলো। বাবার সাথে অফিস ঘরে ঢুকলো শিশু। সেখানে একজন গেরুয়া পোষাক পরা লোক বসেছিলেন। নাম শোনার পর ঘরে চলে যেতে বললেন। কোথায় ঘর? কোন দিকে? কেন যাবো? ঘর থেকে বেরিয়ে ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা বেরিয়ে বললেন, এখন থেকে তুমি এখানে থাকবে। অনেক বন্ধু হবে। ভাল স্কুল। মাথা নীচু করে শুধু একটা প্রশ্ন করে ছিলো সেই শিশু—আমি আর কোনও দিন বাড়ী যাবনা? কোন উত্তর পাওয়ার আগেই দুজন ছোট ছেলে এসে হাত ধরে নিয়ে চলে গেলো। পিছন ফিরে বাবার দিকে তাকায়নি সেই শিশু। হয়তো দু এক ফোঁটা চোখের জল বেরিয়ে ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড অভিমান, রাগ নিয়ে সে চলে গেল নতুন দুই বন্ধুর সাথে। নতুন স্কুলে ক্লাস ফাইভের ছাত্র। যাত্রা শুরু নতুন জীবনের। শিখে গেলো ওই গেরুয়া পোষাক পরারা হলেন মহারাজ। ঘর, বাড়ী, সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন। তাদের তত্ত্বাবধানেই থাকতে হবে। দিন কয়েক সময়ের মধ্যেই নতুন জীবনে মানিয়ে নেওয়া। ভোরবেলা ওঠা। প্রার্থনা ঘরে গিয়ে প্রার্থনা করা। স্কুল সবই ঠিক ছিল। বিকেলে প্রচুর খেলা। কষ্ট হতো রাত্রে। শোবার সময়। নিজের মশারী টাঙাতে হতো। আর সপ্তাহের শেষে নিজের জামা প্যান্ট কাচতে হোত। দেখতে দেখতে সপ্তাহান্তে অভিভাবকদের আসার দিন। এসেছিলেন সেই শিশুটির বাবা ও তাঁর বাবা। সেদিন ছিল

শনিবার। রেডিওতে চলছে মোহনবাগান ও ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল খেলার ধারাবিবরণী। বদ্রু ব্যানার্জ্জীর গোলে এগিয়ে মোহনবাগান। সেই ধারাবিবরণী ছেড়ে সেই শিশু দেখা করেনি তার অভিভাবকের সাথে।

সেকি শুধুই মোহনবাগান প্রীতি? কোথাও কি প্রচ্ছন্ন অভিমানও মনের ভিতর ছিল না? শুরু হোল নতুন জীবন। নতুন শিক্ষা, ক্রমশ জানতে শিখল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে, স্বামী বিবেকানন্দকে। কেটে গেল বেশ কয়েক বছর। ক্লাস ফাইভের ছাত্র পৌঁছে গেল ক্লাস এইটে। পড়াশোনা ভালই চলছে। এখন আবার অভিভাবকের নতুন চিন্তা, ক্লাস নাইনে কি নিয়ে পড়বে বাড়ির একমাত্র বংশধর? বাৎসরিক পরীক্ষার ফল বেরোবার পর দেখা গেল ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয়ে গেলো। এর মধ্যে বাড়ীতে নতুন স্কুলের ফর্ম এলো। সেখানে ভর্ত্তি হবার জন্য পরীক্ষা দিতে যেতে হবে। সে অনেক দূর। ট্রেনে করে যেতে হবে। নতুন বিষয় নিয়ে পড়তে হবে। এগ্রিকালচার। সেটা কি কিছুই জানা নেই। যাই হোক কিছু খবরাখবর করে পড়া হোল। তারপর সেই স্কুলের উদ্দেশ্যে একদিন রাতের ট্রেনে উঠে যাত্রা শুরু। পরের দিন স্কুলে পৌঁছে সেই বালক তো অবাক। কি বিরাট বিরাট মাঠ। কি বড় স্কুল বাড়ী। কি বিরাট জায়গা। কিন্তু কোথাও বিদ্যাপীঠের নাম লেখা নেই। অধ্যক্ষ মহারাজকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম বিদ্যালয়ের কোথাও নাম লেখা নেই কেন? উনি হেসে বললেন বিদ্যালয়ের সব ছাত্রের নামই হল বিদ্যালয়ের নাম। এদের নামেই বিদ্যালয়কে সবাই চিনবে। এখানেও সেই মহারাজরা রয়েছেন। সেই প্রার্থনা ঘর। সেই হোষ্টেল। খাবার ঘর কি বিরাট। তিনটে বিষয়ের পরীক্ষা হয়ে গেল। বাংলা, অঙ্ক, ইংরাজী। এরপর সেই এগ্রিকালচারের পরীক্ষা। একমাত্র সেই বালক একা পরীক্ষা দিচ্ছে ওই বিষয়ে। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় একজন মহারাজ বালকটির বাবাকে জানিয়ে দিলেন যে, সে ভর্ত্তি হতে পারবে। আনুষ্ঠানিক ভাবে একদিন স্কুলে আবার এসে ওঠা। ক্লাস নাইনে। এখানে রোজকার রুটিন প্রায় একই রকম। তাই কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। কিন্তু অনেক কিছু বেশ নতুন। সকালে প্যারেড। সপ্তাহান্তে এ্যাসেম্বলি ইত্যাদি। ধীরে ধীরে তিন বছর অতিক্রান্ত করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ করে ফেলল। এবার বিদায়ের পালা। বিদায় ''পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ''। বিগত তিন বছর কি সব মাষ্টারমশায়দের পাওয়া। নাম না করাই ভালো। পাছে কেউ বাদ পড়ে যায়। তবে তিনজন মহারাজের নাম না করলেই নয়। যাঁরা একাই কারোর জীবন তৈরী করে দিতে পারেন। প্রথমেই অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী, দ্বিতীয় কালীপদ দা স্বামী পূতানন্দজী এবং তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক ব্রহ্মচারী শ্রীবিষ্ণুচৈতন্য জী। পরে যিনি স্বামী রমানন্দ জী মহারাজ নামে পরিচিত। দীর্ঘ জীবনযাত্রায়, কর্ম জীবনে বা অবসর সময়ে বার বার ফিরে আসে পুরানো স্কুলের কথা। দুটো স্কুলের মধ্যে কেন পরের স্কুলটা বেশী মনে পড়ে? কেন এখনো সেই বালক যে জীবন সায়াহ্নে পৌঁছেও ভুলতে পারে না সেই স্কুলকে? শুধু কি তার বিশালত্বের জন্য? শুধু কি খেলার মাঠের জন্য? জানে না, সে জানে না। তবে বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে এখন আর অভিমান হয় না। এখন কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি। বলে ভালই করে ছিলে বাবা। ধন্যবাদ এক নতুন জীবনের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। যার জোরে আজও সম্মানের সাথে মাথা তুলে বলতে পারে কোন স্কুলে পড়েছে। কাদের সাথে সে যুক্ত। যার জন্য জীবন যুদ্ধে আজও কোথাও বিপদে পড়তে হয়নি। কৃতজ্ঞতা বাবার প্রতি। কৃতজ্ঞতা সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতি। অসংখ্য প্রণাম সেই জীবন উৎসর্গীকৃত মহারাজদের। যাঁরা মানুষ তৈরীর ব্রতে ব্রতী হয়েছেন।

লেখক প্রথম শ্রেণির প্রাক্তন ক্রিকেটার ও ই. সি. বি. স্বীকৃত আম্পায়ার, বর্তমানে ক্রিকেট কোচ, মোহনবাগান ক্লাবের দীর্ঘদিনের সদস্য।

‘তোমার পরে ঠেকাই মাথা’

ডাঃ (অধ্যাপক) উদয় চৌধুরী

হায়ার সেকেন্ডারী, ১৯৭৩

বিদ্যাপীঠ এই চার অক্ষরের শব্দটির মধ্যে খুঁজে পাই—প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ ও আত্মার শান্তি।

কোনো এক অবসর মুহূর্তে বসে ভাবলে এই ষাট (৬০) বছরের জীবনের শ্রেষ্ঠ—‘কোন অধ্যায়টি’? অবশ্যই বিদ্যাপীঠ জীবনের অধ্যায়টি আমার কাছে ‘জীবনের সুবর্ণযুগ’। মনের কোঠায় মণির মতো উজ্জ্বল ‘‘জ্যোতির জ্যোতি-উজ্জ্বল হৃদিকন্দর’’। বিদ্যাপীঠ মর্মার্থে আমার কাছে ভালোবাসার প্রকৃত সংজ্ঞা ও প্রকাশ।

বিদ্যাপীঠের পরিবেশ ও পরিমণ্ডল

বিদ্যাপীঠের-পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের কথা ভাবলে যে মনোরম ছবিটি মনের আকাশে ফুটে ওঠে, সেই ‘আনন্দ’ চিত্রটি হল—‘‘ছায়া সুনিবিড় তপোবন সুলভ প্রশান্তির বাতাবরণ ও পঠন-পাঠনের সহায়ক পরিবেশ।’’ বিদ্যাপীঠের আকাশ, বাতাস, ফুলে ফলে, প্রশস্ত সবুজ মাঠ আর তার মধ্যে বিচরণকারী দেবসুলভ মানুষগুলি মন মুগ্ধ করে। প্রতিটি মানুষ যেন একই সূত্রে গাঁথা প্রাণ যা ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তার বন্ধনে স্বর্গীয় পরিবেশ রচনা করে—‘‘জীবনে জীবন যোগ করে’’ (Adds life to years).

বিদ্যাপীঠের ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী ও অভিভাবকদের সম্পর্কের কথা ভাবলে মনে হয়—এক অচ্ছেদ্য বন্ধন, শিক্ষকদের, মহারাজদের, কর্মীদের—সকলের সঙ্গে ‘দাদা-ভাই’ এর সম্পর্ক। শিক্ষকেরা বিদ্যাপীঠ পরিবেশের মধ্যেই থাকতেন—‘‘গুরুপল্লী’’—পাশাপাশিই ছিল।

আমরা ছিলাম পরম আনন্দে, মনের গভীরে অজান্তে ফুটে উঠত—‘‘ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ’’। আমাদের জীবন ছিল একটি যেন সঙ্গীতের সুর—‘‘বিদ্যাপীঠের তরুলতা মুগ্ধ করে মন’’। মনে পড়ে বিদ্যালয়ের প্রার্থনা সঙ্গীত। বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় স্বামী হিরন্ময়ানন্দজীর রচিত ‘‘বিদ্যাপীঠের গগনতলে দীপ্ত আলোক জ্বলে’’, সেই আলোকের শিখা বহে ছাত্রদল চলেরে, চলবে দেশ-দেশান্তরে—ঘুরবে মরুপ্রান্তরে—আজ মনে হয় ‘‘আমরা করব জয়’’। সারা দেশ, পৃথিবী জুড়ে আজ বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা ছড়িয়ে রয়েছে—শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামীজীর ভাবধারায় স্নাত হয়ে অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ তথা দেবত্বের স্ফুরণের মধ্য দিয়ে। সবসময়ই আজ মনে প্রাণে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি যে—‘‘বিদ্যাপীঠের ছেলেরা যে কোনো পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেবে, পরিবেশকে আপন করে নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামীজীর আদর্শে—‘‘বহুজন হিতায়—বহুজন সুখায়’’ কর্মপদ্ধতির মধ্যে দিয়ে সকলের হৃদয়ে আসন করে নেবে—‘‘জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে’’।

‘বিদ্যাপীঠের প্রথম দিনটি ও শিবানন্দ সদন’

স্মৃতি-মন্থন করতে করতে সুন্দরতম মুহূর্তে কখন পৌঁছে গেছি—ছবির মতো ভেসে ওঠে ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসের শীতের একটি আলোঝলমল সকাল। বিদ্যাপীঠের প্রথম দিনটির সুখস্মৃতি—মনোমুগ্ধকারী নয়নাভিরাম পরিবেশের মধ্যে পথচলার শুরু। মন গুন গুন করে গেয়ে ওঠে ‘‘আমার এই পথচলাতেই

আনন্দ"। বর্ধমানের 'নন্দনপুর' গ্রামে আমার জন্ম—আমাদের ছোট বাড়িটি—বড়ই প্রিয় বিদ্যাপীঠে আমাদের নতুন বাড়ি "শিবানন্দ সদনে" প্রবেশ অভিজ্ঞতা কিশোর মনের কল্পনার মানসপটে এ যেন 'স্বর্গরাজ্যের রাজকীয় প্রাসাদে প্রবেশ।' সবাই মিলে একসাথে ঘুম থেকে ওঠা ভোরের ঘন্টাধ্বনিতে। প্রার্থনাগৃহে ঠাকুর, মা, স্বামীজীর চরণে প্রার্থনা ও সঙ্গীত অঞ্জলি। খুব মনে পড়ে শিবানন্দ সদনের সবুজ মাঠে রৌদ্রস্নানের মধ্যে সকলে মিলে তেল মাখা আর নিজেদের মধ্যে খুনশুটি "জয়ন্ত দুষ্টুমি করিস না"। আমাদের প্রিয় ফণীদার (ওয়ার্ডেন) ভালোবাসা- আন্তরিকতা-শাসন মিশ্রিত মিষ্টি অভিভাবকত্ব। তাঁর উদ্দেশ্যে রইল সশ্রদ্ধ প্রণাম। সবাই মিলে একসাথে থাকার আনন্দ শিবানন্দ সদনে। "বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা", "বিবিধের মাঝে মিলন মহান" জীবন্ত ভারতবর্ষ সাক্ষাৎ রূপায়ণ সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে জীবন নদীগুলি এসে জীবনে মিলিত হয়ে তৈরী করেছে 'আনন্দসাগর'—শিবানন্দ সদন।

বিদ্যাপীঠের শিক্ষাব্যবস্থা ও আজকের সমাজ

বিদ্যাপীঠে অভিভাবক, শিক্ষক, কর্মীবৃন্দদের-আমরা 'দাদা' বলতাম—আর এই দুই অক্ষরের শব্দের মধ্যেই-অন্তর্নিহিত ছিল 'নিউক্লিয়ার শক্তি'—ভ্রাতৃত্বের নিবিড় ও অনন্ত বন্ধন।

শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রমথানন্দজী রচিত—বিদ্যাপীঠের 'জীবনের শপথ' ছিল—'সমস্ত ভারতবাসী আমার ভাই'—সমস্ত বিশ্ববাসী আমাদের ভাই—আমরা দেশের সাথে বিশ্বের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। স্বামীজীর ভাবধারা—উপনিষদের ভাবতরঙ্গে—'বসুধৈব কুটুম্বকম্' (The World is one family)। বিদ্যাপীঠে তৈরী হতো ভবিষ্যতের "বিশ্ব-নাগরিক মনোভূমি" (mind scape)। আনন্দময় পরিবেশে-মনেপ্রাণে খুশী ও উৎসাহ নিয়ে চলতো—আমাদের পড়াশোনা, খেলাধুলা, শরীরচর্চা, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা। আমাদের সকলের হৃদয়পাত্র কানায় কানায় ভরে উঠতো। হৃদয় অধিকার করতো আনন্দ ও প্রশান্তি। আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকরা যন্ত্রবৎ ছুটে চলেছে স্কুল থেকে প্রাইভেট টিউশন—যেন একটি নির্মম চক্রব্যূহ, শিক্ষার বলীর যূপকাষ্ঠে যা আটকে আছে নিষ্ঠুরতায়। পেশায় মনোবিদ হওয়ার সুবাদে দেখেছি—ছাত্র অভিভাবকেরা এক যান্ত্রিক নিয়মে অবিরত ছুটে চলেছে 'ফল'-এর পিছনে। সেখানে অধুনা শিক্ষা যন্ত্রের নিষ্ঠুরতায় পিশে যাচ্ছে কৈশোরের চাপল্য, শিশুদের মাধুর্য্য ও স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ। দিনে দিনে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে—হৃদয়বৃত্তির বিকাশ, সৃজনশীলতা, মনোবীক্ষণ, পারস্পরিক শ্রদ্ধা—ভালোবাসা ও নির্ভরতার সম্পর্ক তার পরিণতি মানসিক অবসাদ, টেনশন ও স্ট্রেস ডিসঅর্ডার। টি.ভি.-মোবাইলের নেশা, মাদক সেবন ও আত্মহননে কত কিশলয় জীবনবৃক্ষ থেকে অকালে ঝরে যাচ্ছে, কত ফুল ফুটতে পারছে না—ব্যর্থতার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতিভা। বিদ্যাপীঠের শিক্ষাপদ্ধতি মনে করলে মনের আকাশে নক্ষত্রমালার আনন্দচিত্র জ্বল্‌জ্বল্ করে। বিদ্যাপীঠের অনবদ্য স্কুল বাড়ি দুটি ফুল ও সুন্দর গাছপালা দিয়ে সাজানো স্বর্গীয় পরিবেশ। সারদামন্দিরের প্রবেশ দ্বারে দেবী সরস্বতীর অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি। তার পাশাপাশি প্রশস্ত সবুজ মাঠগুলি মিলেমিশে নান্দনিক পরিবেশ রচনা করত। বিবেক মন্দিরের প্রবেশদ্বারের ডানদিকে—স্বামীজীর বলিষ্ঠ—তেজোদীপ্ত 'ব্রোঞ্জ মূর্ত্তি' আমাদের 'বলিষ্ঠদেহ ও বৈদান্তিক মস্তিষ্কের' অনুপ্রেরণা যোগাত। তাঁর মধ্যে সবই ছিল ইতিবাচক (Positive)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'প্রণাম মন্ত্রে' ছিলেন অপরাজিত। আমাদের বিদ্যার—পীঠস্থান—বিদ্যাপীঠে রীতি ছিল শিক্ষক, অভিভাবক মহারাজ ও গুরুজনদের দেখলে—তাঁদের পায়ে মাথানত করা—অন্তর্নিহিত শিক্ষাটি হল—"নমো নারায়ণায় নমোঃ।"

আমাদের বিদ্যাপীঠের দিনপঞ্জী

সকালে প্রায় এক ঘন্টা শরীরচর্চা, বিকালে একঘন্টা খেলাধুলা। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল ইত্যাদি বাধ্যতামূলক ছিলো। শরীরচর্চায় তৈরী হতো সুস্থ ও শক্ত 'শরীর-মনের গঠন'। স্বামীজীর চিন্তায় ভবিষ্যতের ভারতকারিগর- যাদের থাকবে শরীরে শক্তি ও প্রাণে বিদ্যাশিক্ষার যথার্থ স্ফুরণ। আজকের পড়াশোনার রীতিতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যা বিরল। তাদের একমাত্র অবসর বিনোদন-টিভি, মোবাইল, ফেসবুক ও ইন্টারনেটে মিতালী যা 'বিহেভিয়ারাল এডিকশান' এ পরিণত হয়ে প্রতিভাবিকাশে আঘাত হানছে। এর পরিবর্তে নেশা, ক্রোধ ও কনডাক্ট ডিস্‌ওর্ডারের ভয়ঙ্কর পরিণতির মধ্যে সামাজিক অবক্ষয় তৈরি করছে।

আমাদের পড়াশোনা, খেলাধুলার পাশাপাশি ছিল—গান কবিতা ছবি আঁকা ইত্যাদি বিভিন্ন হবি। এর জন্য বিদ্যাপীঠের বিখ্যাত হবি সেন্টার। সাংস্কৃতিক জীবনে বিদ্যাপীঠে লেগে থাকতো 'বারো মাসে তেরো পাবন'। উদ্ভাবনা শক্তির স্ফুরণের সাথে ছিল আধ্যাত্মিক শিক্ষার পঠনপাঠন-গীতা, বেদ, উপনিষদের নির্যাস সহজ করে গল্পের ছলে আমাদের পড়াতেন সকলের প্রিয় কালীপদদা, স্বামী পূতানন্দজী মহারাজ। তিনি নিজে ছিলেন আধ্যাত্মিক শক্তির মূর্তিমান ও প্রেমপূর্ণ প্রকাশ। শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার মধ্যে দিয়ে হতো জীবন ও চরিত্রগঠন। বিদ্যাপীঠের শিক্ষা যেন আনন্দ ঝর্ণা হয়ে মন কানায় কানায় ভরিয়ে দিতো—'আনন্দধারা বহিত ভূবনে'।

বিদ্যাপীঠের ডিসিপ্লিনড জীবন মনে করিয়ে দেয় ছেলেবেলার সহজপাঠ। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে প্রার্থনা গৃহে প্রার্থনা, তারপর শরীরচর্চা, পরে প্রাতঃরাশ। ফিরে এসে নিজেদের কাজ। ঘর পরিষ্কার, ঝাঁট দেওয়া, সব আমরা নিজেরা করতাম, তারপর পড়াশোনাগৃহে, 'স্টাডিহলে' পড়াশোনা। স্নান সেরে, খেয়ে দশটার মধ্যে স্কুলে যাওয়া। বিকাল চারটে পর্যন্ত স্কুল মাঝখানে টিফিন ব্রেক। বিকালে মন পড়ে থাকতো খেলার মাঠে। সারাদিনের সমস্ত ক্লান্তি ধুয়ে মুছে যেতো, খেলাধুলার আনন্দে ও তৃপ্তিতে। এরপর সান্ধ্যপ্রার্থনা খণ্ডন ভব বন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমার। মনেপ্রাণে ঝংকার তুলতো 'গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ...আরতি তোমার জয় জয় আরতি তোমার' ও রাতের পড়া এবং দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া। সমস্ত কিছুর মধ্যে ছিল আনন্দ, প্রাণের পরশ, মনের খোরাক, শ্রদ্ধা ভালোবাসার স্নিগ্ধ ছোঁয়া, প্রতিটি দিনই আনন্দে ও পরিপূর্ণতায় ভরপুর ''জীবনপাত্র উচ্ছালীয়া মাধুরী দান করতো বিদ্যাপীঠের জীবন।"

বিদ্যাপীঠের পড়াশোনায় কোনো স্পুন ফিডিং ছিলো না। স্টাডি হলে আমরা সকলে নিজেদের টেবিল ও ডেস্কে নিঃশব্দে, নীরবে পড়তাম। মূলতঃ শ্রবণ মনন ও নিধিধ্যাষনের মধ্যে দিয়ে বৈদিক শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণের মধ্যে দিয়ে অন্তর্নিহিত পূর্ণতা বিকশিত হত। বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকেরা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসে থাকতেন, ছাত্রদের কারোর কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে সাহায্য করতেন যা ছিল গাইডেড 'সেলফ ডিসকভারি'। আমাদের একটি বিষয় ছিল ভারতীয় সংস্কৃতি। কালিপদদা (স্বামী পূতানন্দজী) বড় যত্নে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত সত্যকে তুলে ধরতেন, আর তিনিও নিজে ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির জীবন্ত-পুস্তক। তাঁর জীবন ধারার মধ্যে দিয়ে আমরা পরম সত্য সন্ধানের আভাস পেতাম। কতকগুলি বিষয় আমাদের ছিলো, যেমন গার্ডেনিং, টেলারিং, কারপেনটারি, লেদারিং ও মিউজিক। সেগুলি আমাদের ভিতরের অন্তর্নিহিত প্রতিভা স্ফুরণের সহায়ক ছিলো বাস্তবমুখী জীবনশিক্ষার।

বিদ্যাপীঠের এই শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের মান-হুঁশে পৌঁছে দিত। হৃদয় আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ করতো। জীবনমুখী শিক্ষায় জীবনের যে কোন কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলায় পারদর্শী করে তুলতো। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি —"বিদ্যাপীঠের ছেলেরা যে কোন পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে"।

আজকের শিক্ষাধারা ছুটছে সাফল্যের দিকে এবং তা হচ্ছে বিচ্ছিন্ন ও যান্ত্রিকভাবে। এটি বিষাদ রোগের জনক আর এই পরিবেশ হোলো স্ট্রেস, ডিসঅর্ডারের ম্যাট্রিক্স।

বিদ্যাপীঠের ছুটিছাটা

বিদ্যাপীঠের গরমের ছুটি প্রায় মাস দেড়েক থাকতো। পুরুলিয়ার গরম ও সেই সময় জলকষ্টের জন্য। ছুটিতে বাড়িতে এসে কয়েকদিন পরেই মন আনচান করতো, কবে আবার বিদ্যাপীঠ জীবনে ফিরে যাবো। এমনই ছিলো বিদ্যাপীঠের আকর্ষণ। মা অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করতো, "হ্যাঁরে এতো যত্ন করছি, কত ভালো ভালো খাবার তৈরি করে দিচ্ছি, বিদ্যাপীঠে কী আছে যা এখানে বাড়িতে তোর মিলছে না?"

আমার উত্তর ছিলো—"মা বিদ্যাপীঠকে ভালোবেসে ফেলেছি, তাই এতো মিস্ করছি।"

বিদ্যাপীঠের ভোজ

ছুটির আগে ও বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠানে উদর প্রাণ পরিপূর্ণ হতো সুখাদ্যের তৃপ্তিতে। একনম্বর মাঠে কয়েক চক্কর দিয়ে আসতাম—খিদে খোলার জন্য—যাতে খুব করে খেতে পারি।

বিদ্যাপীঠের অভিভাবকবৃন্দ

চতুর্থ থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্ররা বাবা, মাকে বাড়িতে ছেড়ে এসে পেলাম এমন একটি অনন্য ও সার্থক পরিবেশ যা ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও আত্মীয়তা পূর্ণ। বিদ্যাপীঠ বৃহৎ পরিবারের শীর্ষে আমাদের অভিভাবক ছিলেন সম্পাদক মহারাজ। আমরা পেয়েছি প্রথমে স্বামী চন্দ্রানন্দজী—চন্দনদাকে আর তারপর স্বামী প্রমথানন্দজী—ধীরেনদাকে। তাঁরা ছিলেন ধীর, স্থির, ভালোবাসা, আন্তরিকতায় পূর্ণ। কখনো তাঁদের ভয় পাইনি, তাঁদের নিকটে স্নিগ্ধ ভালোবাসার আনন্দছায়া পেয়েছি। তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও বিনম্র প্রণাম জানাই। প্রধান শিক্ষক হিসাবে পেয়েছি স্বামী রমানন্দ মহারাজকে—স্বামীজীর কর্মযোগের একজন স্বার্থক কর্মবীর তাঁকে দেখলেই বীর স্বামীজীর বাণী হৃদয়ে জেগে উঠতো। তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করতেন, সুঠাম দেহ তীব্র স্মৃতিশক্তি, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, শাসন ও ভালোবাসার সংমিশ্রণে স্বামীজীর ভাবধারায় জীবন চরিত্রগঠনে আদর্শ প্রধান শিক্ষক মহারাজকে কখনো কখনো ভয় পেয়েছি কিন্তু তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাকে ছাপিয়ে উঠেছে—তাঁর 'ভালোবাসা ও আন্তরিকতা'। তাঁকে আমার প্রণাম ও শ্রদ্ধা নিবেদন করি। বিদ্যাপীঠের খাবার ঘরে (ডাইনিং হলে) প্রাণ পুরুষ ছিলেন—"প্রাণগোপাল মহারাজ" আমাদের প্রিয় ভাণ্ডারী মহারাজ।

একদিনের ঘটনা বলি। বিকালে অনেক ক্রিকেট বোলিং করেছি, খুব খিদে ও তেষ্টা পেয়ে গেছে। কী করি? প্রাণগোপাল মহারাজের ঘরে ঢুকে প্রণাম করে পায়ের কাছে এমন ভাবে বসে পড়লাম, তাঁর আর ওঠার উপায় থাকল না। মিষ্টি হেসে বললেন "ওরে দুষ্টু খুব খিদে পেয়েছে তো?" অবাক হলাম। মহারাজ কেমন করে

জানলেন আমার অন্তরের কথা? হাঁক দিলেন, ''মহাদেব (ভাণ্ডারের প্রধান পাচক), যা আছে একে তাড়াতাড়ি খেতে দাও''। তাঁর স্মৃতিতে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি।

আর যাঁর কথা বলতে গেলে ভয় হয়, তাঁর সুবৃহৎ মাতৃহৃদয় কেমন করে প্রকাশ করবো—কথায় ভাষায়? সে যে পরমযত্নে হৃদয় অনুভবের ধন-ধ্যানচিত্র।

মা বাবাকে ছেড়ে এসে বাড়ির পরিচিত প্রিয় পরিবেশ ফেলে প্রেয় থেকে শ্রেয়র পথে চলতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে কয়েক সপ্তাহ কষ্ট অনুভব করেছিলাম। তারপর আমরা এসে পড়লাম এমন এক 'মাতৃহৃদয় সমুদ্রের সামনে যা আনন্দ তরঙ্গে মনপ্রাণ ভরিয়ে দেয়-সকল সন্তানদের।

একদিনের ঘটনা তুলে ধরি আমার রুমের সহপাঠীর জ্বর হয়েছে, খাবার ঘরে আসতে পারে নি। সে খাবার টেবিলে আমার পাশেই বসতো হঠাৎ তিনি এসে জিজ্ঞাসা করলেন কয়েকশ ছাত্রের মধ্যে শুভাশিস্ আসেনি কেন?

আমি অবাক তাঁর সুবৃহৎ অনুভবের বৈভব দেখে। আমাদের খাওয়া হলে তিনি বললেন ''ওকে নিয়ে এসো ওকে না খাইয়ে আমি খেতে পারবো না। শুভাশিস্ একথা শোনা মাত্র আনন্দে চাঙ্গা হয়ে উঠল আর আমার দুচোখ ছাপিয়ে নেমে এল আনন্দঅশ্রু। তাঁর কাছে উপস্থিত হলে তাঁর একটি মন্ত্র, ''এসো, বসো, খাও'' তাঁর আচরণ মাতৃত্ব ও ভালোবাসায় পূর্ণ। আর সেই আদরের পিঠের চাপড়টি—আমাদের সকলের আজও অতি প্রিয়।

'তিনি' শ্রীরামকৃষ্ণ ও মায়ের চরণে নিবেদিত প্রাণ। আমাদের সকলের পরমপ্রিয় কালীপদদা—(স্বামী পূতানন্দজী)। তাঁকে আমাদের সকলের প্রণাম নিবেদন করি।

বিদ্যাপীঠের মন্ত্রীসভা ও বিচারসভা

বর্তমান রাজনীতির চালচিত্রের পাশাপাশি-বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের মন্ত্রীসভা ও বিচারসভার—একটি আদর্শচিত্র সেবাভাব ও সত্যনিষ্ঠার—সম্মুখীন হওয়ার বাস্তব শিক্ষা পেয়েছি সেখানে। 'মন্ত্রী-সভা' নির্বাচিত হতো-গণতান্ত্রিক উপায়ে। ছাত্রদের ভোটদানের মাধ্যমে। আমাদের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে—প্রধানসেবক আর নির্বাচিত সব মন্ত্রীদের—সেবকমণ্ডলী বা সেবকবৃন্দ বলা হত। তারা সকলে মিলে সাহায্য করতো সুষ্ঠুভাবে বিদ্যাপীঠ-কর্ম পরিচালনা করতে। মন্ত্রীমণ্ডলী ও বিচারসভার সদস্যবৃন্দ বিচক্ষণতার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ ভারতের চরিত্রগুণ সম্পন্ন নেতা হিসাবে শিক্ষালাভ করার সুযোগ লাভ করত। অন্য কোনো বিদ্যালয়ে এমন ব্যবস্থা আছে কিনা জানা নেই। ফলস্বরূপ ছাত্ররা আস্বাদন করতে পারতো 'আদর্শ গণতান্ত্রিক মুক্ত পরিবেশ'—যা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে পূর্ণ। সত্য, সেবা বাস্তব অভিজ্ঞতার আশ্চর্য আয়োজন। জীবনের প্রতিকূলতা দূরীকরণে অগ্রণী-হওয়ার প্রেরণা ও বন্ধুদের সার্বিক মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করার শিক্ষার কথা আজও মনে পড়ে। হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্য থেকে ছাত্ররা—অরুণাচল-প্রদেশ, মণিপুর, আসাম থেকে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম—সমগ্র ভারতের ছাত্রদের মহামিলনকেন্দ্র ছিল আমাদের প্রিয় বিদ্যাপীঠ-'বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন ও ভারতবাসীর-জাতীয় সঙ্গীতের সার্থক রূপায়ণ।

বিদ্যাপীঠ জীবন-স্মৃতি যা শৈশবের আনন্দ প্রস্রবনের উৎসমুখ এবং বর্তমান কর্মজীবনের পাথেয় ও বাতিস্তম্ভ হিসাবে আলো বিকিরণ করে চলেছে—বার্ধক্যের বারাণসীর পথে। কেন জানি না বলতে ইচ্ছা করছে 'এই লভিনু

সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর'.....আর মনে হয় 'যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে, গন্ধে, গানে—তোমারই আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

রবিবার সমগ্র বিদ্যাপীঠ পরিষ্কারে ছাত্ররা হাত লাগাতো। ছাত্ররা নিজেদের সাফসুতরো করত এবং ছাত্রাবাস ও বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার আয়োজন হ'ত। এও ছিল—একটা শিক্ষার অঙ্গ, কোথায় অনাবশ্যক আলো-পাখা চললে তা নিভিয়ে দেওয়ার শিক্ষা, বিদ্যাপীঠ ছাত্রদের মজ্জাগত ছিল। জন্মাষ্টমী উৎসবের দিন সব ছাত্রাবাসে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতিযোগিতার আয়োজন ও বিশেষ পুরস্কার ব্যবস্থা ছিলো।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক। আমাদের পরীক্ষার ফলের পাশাপাশি আচরণবিধির ফলও প্রকাশিত হতো। বিদ্যাপীঠে পরীক্ষার ফলের চেয়েও আচরণবিধির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত হত। আমার স্মৃতিচারণের এই সুন্দর ফুলগুলি ফোটাতে আমাকে প্রতি নিয়ত নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করেছে আমারই এক বিদ্যাপীঠের ছোট ভাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-মা-স্বামীজীর চরণে অর্পিত প্রাণ, ত্যাগী এই বিদ্যাপীঠ ভাইয়ের লেখনীর ফলিত পরশ আমার এই লেখাটিকে পরিমার্জিত করেছে। তার উদ্দেশ্যে থাকল আমার অসীম ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও আন্তরিক শুদ্ধা।

বিদ্যাপীঠ জীবন—একটি আদর্শ ধ্যানচিত্র ও লীলাচিন্তন

সকালে সূর্য উদয় হলে যেমন রাতের অন্ধকার নিমেষে দূর হয়, জগৎ চরাচর আলোয় আলো হয়ে ওঠে—তেমনি 'বিদ্যাপীঠ জীবনস্মৃতি' আমাদের মনের আকাশ—আলোয় আলো করে দেয়—দেখি আমরা সকলে 'অমৃতস্য পুত্রঃ' 'আর বিদ্যাপীঠ জীবন'—''Bliss of Solitude'' (Children of Importent Bliss) আমাদের অভিভাবক মহারাজ ও শিক্ষকদের চরণে প্রণাম জানিয়ে, বিদ্যাপীঠের দাদা, ভাও ও সহপাঠী, সহকর্মীদের ভালোবাসা জানিয়ে, একটি চরণ স্মরণ করে বলব 'মাথা নত করে দাওগো তোমার চরণধূলার তলে—'**তোমার পরে ঠেকাই মাথা**'।

লেখক কলকাতাবাসী। বিশিষ্ট মনোরোগ চিকিৎসক।

> ''There is enough in the world for everybody's need, but not enough for even one person's greed.''
>
> **–Mahatma Gandhi**

অনুভবে বিদ্যাপীঠ

সুজয় দে

মাধ্যমিক, ১৯৮২

তখন আমরা হাওড়ায় থাকি। বাবার বদলির চাকরি, ব্রাবোর্ন রোডে টি বোর্ডের কাছে কোথাও একটা বাবার অফিস। সেই সময় এত উড়াল পুলের রমরমা ছিল না। তাই অফিস যাতায়াতের পথে প্রতিদিনই বাবাকে হাওড়া ব্রিজের এপার ওপার দুদিকেই ট্র্যাফিক জ্যাম নামক বস্তুটিতে ভীষণ বিধ্বস্ত ও নাজেহাল হতে হত। দুই দাদা কলেজ হোস্টেলে থেকে পড়াশুনা করে, পনেরো দিনে একবার বা মাসে একবার তারা আমাদের দেড় কামরার ফ্ল্যাটে আসে।

আমি তখন মোটে ক্লাস ফাইভ, দাদারা এলে খুব মজা হত। ওদের কাছে কলেজের বন্ধুদের গল্প, স্যারদের গল্প, এমন কি র‍্যাগিং-এর গল্প সব হাঁ করে শুনতাম। ছোট বলে আমায় তেমন কেউ পাত্তা দিত না। কিন্তু বাবা-মা-দাদাদের কথাগুলো আমি যেন চোখ কান দিয়ে গিলতাম। ভীষণ দুরন্ত আর ফাঁকিবাজ ছিলাম। বাবা বেরিয়ে যাবার পর থেকে ঘরে ফেরার আগে পর্যন্ত কিছুই পড়তাম না। স্কুল থেকে ফিরে টিফিন করেই খেলতে চলে যেতাম। কোয়ার্টারের একচিলতে মাঠে টেনিস বলে ফুটবল ক্রিকেট চলত, মাঝে মাঝে লুকোচুরি ধাপ্পা পিট্টু এসবও চলত। দুরন্তপনার জন্য প্রায়ই মায়ের কাছে অভিযোগ আসত। সেগুলো বাবা ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বাবার কাছে রিলে হয়ে যেত। তারপরে বাবার কাছে পেটান খেয়ে পড়তে বসা।

এটা ছিল আমার প্রায় রোজকার রুটিন। যদিও আমি তখনকার স্কুলে ফার্স্ট হতাম তবুও এরকমই চলত। তবে রবিবারটা ছিল আনন্দের। বাবা ঘরে থাকলেও মাঝে মাঝেই আমাদের নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থানে বেড়াতে চলে যেত। বিড়লা তারামণ্ডল, চিড়িয়াখানা, বিড়লা মিউজিয়াম, ন্যাশনাল মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখা, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চলন্ত সিঁড়িতে চাপা, আরও কতকিছু সবই বাবা-মায়ের হাত ধরে। আজ আমরা যারা কলকাতায় থাকি তাদের মেট্রো চাপলে বা কোন মলে গেলেই এসক্যালেটর চাপতে হয়। তখন এসব কোথায়, একমাত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্কেই এসক্যালেটর ছিল।

দিনগুলো বেশ কেটে যেতে থাকলেও দাদাদের দেখেই কিনা কে জানে ওইটুকু বয়সেই আমার ভেতর হোস্টেলে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগতে শুরু করল। এটার পিছনে বাবার মারের হাত থেকে পালানোর ইচ্ছাটাও কাজ করেছিল কিনা কে জানে। আমি এখনও এটা ভেবে বেশ অবাক হই যে, অত কম বয়সে আমার মধ্যে হোস্টেলে যাবার ইচ্ছাটা প্রবল হয়েছিল কেন।

দাদাদের মুখেও মাঝে মাঝে শুনতাম—বাবার বদলির চাকরির জন্য ওদের ভাল স্কুলে পড়ার সুযোগ হয়নি, আমার যেন সেই সুযোগটা হয়। এরকম চলতে চলতে একদিন দাদাদের উৎসাহেই পুরুলিয়া সৈনিক স্কুলে ক্লাস সিক্সে ভর্তির আবেদনপত্র জমা পড়ল। তার জন্য প্রস্তুতিও পুরোমাত্রায় শুরু হল। প্রধান যেটা ছিল সেটা হল পনেরো মিনিটে একশ'টা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ করতে হবে। অভ্যাস করে করে সেটা চোদ্দো মিনিটেই আমার হয়ে যেত। অবশ্যই বাবাই অভ্যাস করিয়েছিল। দেখতে দেখতে পরীক্ষার দিন চলে এল। ফোর্ট উইলিয়ামের ভেতরে পরীক্ষা-রাস্তাটা গড়িয়ে মাটির তলায় নেমে গেল। সেখানে পুরো একটা শহর। পরীক্ষার

হলে টেবিল নেই, চেয়ারের সাথে চামচের মত হাতল লাগানো, তার ওপর পরীক্ষার খাতা রেখে উত্তর লিখতে হল। ওরকম চেয়ার জীবনে প্রথম দেখলাম, আমার খুব মজা লেগেছিল। ফোর্ট উইলিয়ামেও ওই একবারই ঢোকার সুযোগ হয়েছে এখনও পর্যন্ত। যাইহোক পরীক্ষা তো ভালই দিলাম। সাত মিনিটে পঞ্চাশটা যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ সেরে এক মিনিট আবার মিলিয়ে দেখার সময় পেয়েছিলাম। খুব সম্ভব শ'চারেক ছেলের মধ্যে আমি প্রথম বা দ্বিতীয় হয়েছিলাম। সমস্ত পড়াশুনার খরচ স্কুল থেকে দিত, আমাকে পড়ানোর জন্য বাবাকে আর এক পয়সা খরচ করতে হত না। এটা বলতে গেলে বাবার কাছে একটা পুরস্কার, কেননা দুই দাদার কলেজ হোস্টেলের খরচ মিটিয়ে আমার স্কুল হোস্টেলের খরচ চালানো খুব কষ্টকর ছিল বাবার পক্ষে। সেটা ওই বয়সেও সামান্য হলেও বুঝতাম বা পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিত রেশনের চালের ভাত খেতে গিয়ে।

কিন্তু বাবা আমাকে ভর্তি করল না, দাদারাও তেমন কিছু বলল না, কেন কিছু বুঝলাম না। আমার খুব রাগ হল, খুব মন খারাপ। আমার মন ভাল করতে বাবা আমায় নিয়ে একদিন মহাজাতি সদনে জুনিয়র পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখিয়ে নিয়ে এল। অনেক পরে জেনেছিলাম, তখন আমার একটা কঠিন অসুখ হয়েছিল, প্রায় বছরখানেক চিকিৎসার একটা কোর্স চলছিল, তাই সৈনিক স্কুলে ভর্তি করা হয়নি আমার শারীরিক অসুস্থতার কারণেই। সেসব তো আমি জানতাম না, আমার ভেতরে জেদ চেপে গেল আমি হোস্টেলে যাবই। এবার নিজেই খবরের কাগজে চোখ রাখি। দিন মাস বছর ঘোরে, হঠাৎ করেই একদিন কাগজে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তির বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। তখন আমি ক্লাস সিক্সের বার্ষিক পরীক্ষা দেব। দাদাদের সাহায্যে বাবা-মায়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্লাস সেভেনে ভর্তির আবেদনপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হল। বাবা আমাকে তৈরীও করলেন পরীক্ষার জন্য। নির্দিষ্ট দিনে গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে পরীক্ষা দিতে গেলাম। সেখানেও সেই চামচের মত হাতল লাগানো চেয়ারে বসে উত্তর লেখা। পরীক্ষা ভালই দিলাম, তবু মনে মনে ভাবি, কি জানি সুযোগ পাব তো? একদিন চিঠি এল, লেখা পরীক্ষায় পাশ করেছি। সেটা ডিসেম্বরের শেষ, ক'দিন পরেই পুরুলিয়া গিয়ে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে। সেটাতে পারলে তবেই ভর্তি হতে পারব। চিঠিতে অবশ্য লেখা ছিল—ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় টাকা-পয়সা নিয়ে যেতে, কেননা চান্স পেলে তখুনি ভর্তি হতে হবে।

আমি মৌখিক পরীক্ষা দিতে পুরুলিয়া যাই এই ব্যাপারটায় বাবা-মা রাজি হচ্ছিল না। তারপর দাদাদের পীড়াপীড়িতে প্রতিবেশীরা বলাতেও খানিকটা শেষ পর্যন্ত বাবা রাজি হয়ে গেল। মৌখিক পরীক্ষার আগের দিন রাতে আমি আর বাবা হাওড়া স্টেশন থেকে আদ্রা চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে উঠে শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে কনকনে ঠান্ডার মধ্যে আমরা পুরুলিয়া গিয়ে নামলাম। একটা রিক্সায় চেপে শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে বিবেকানন্দনগরে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে পৌঁছালাম। ওখানকার অতিথি আবাসে স্নান করে খেয়ে প্রস্তুত হয়ে নিলাম। আরও অনেক ছেলে তাদের বাবার সাথে এসেছে। কারও সাথে আবার মা-ও আছে। পরীক্ষা দেব কি, তার আগে বড় বড় বাড়ি-মন্দির-প্রেক্ষাগৃহ-বিশাল বড় বড় খেলার মাঠ এসব তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। বেলা দশটা থেকে মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। প্রচুর ছেলে, বিকেল পর্যন্ত আমার ডাক পড়ল না বলে ছটফট করছিলাম। যখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে তখন আমার ডাক পড়ল। পরীক্ষা নিতে কে কে ছিলেন সে এখন আর মনে নেই। তবে কালিপদ মহারাজ ছিলেন এটুকু মনে পড়ছে, সুভাষ মহারাজও বোধহয় ছিলেন।

দু'চারটে প্রশ্ন করার পর আমাকে বলা হল—ক্লাস সেভেনে নয় ক্লাস সিক্সে আমাকে ভর্তি নেওয়া হবে। আমি তো ওখানেই বেঁকে বসলাম, তখন তো ছোট, ভয় পাওয়া নার্ভাস হওয়া এসব বোধগুলো ঠিক তৈরী হয়নি। আমি বলতে লাগলাম, এক ক্লাসে দু'বার পড়ব না, ক্লাস সেভেনে ভর্তি হলে ঠিক পারব। একপ্রকার ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকলাম। কালিপদ মহারাজ তখন হাতে চকোলেট ধরিয়ে বললেন, ''বেশ বাপু তোকে ক্লাস সেভেনেই ভর্তি করে নেব।'' বলে আমার সাথে বাইরে এসে বাবাকে বললেন, ''আমরা ওকে সিক্সে ভর্তি করতে চাইছিলাম, কিন্তু ছেলে তো এক ক্লাসে দু'বার পড়বে না বলে বায়না করছে, তাই ওকে সেভেনেই চান্স দিলাম, তবে না পারলে কিন্তু এক ক্লাস নামিয়ে দিতে হবে।'' এরপরেও বাবা আমাকে ভর্তি করবে কিনা চিন্তা করতে থাকল। আমি বাবাকে বললাম, ''ভর্তিটা এখন হয়ে যাই, তারপর মা আসতে না দিলে তখন দেখা যাবে।'' বাবা ভীষণ অনিচ্ছাতেও আমার কথা মেনে নিল। আমি পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হয়ে গেলাম। শুরু হল আমার বিদ্যাপীঠ জীবন, সাল—১৯৭৮।

এই লেখা যখন লিখছি তখন পর্যন্ত কালিপদ মহারাজ বলরাম মন্দিরে আর সুভাষ মহারাজ মায়ের বাড়িতে আছেন। ২০১৩ সালে একবার দেখা করে আসতে পেরেছি। বাবা-মা এখনও বর্তমান। বাবা বলে আমি যদি মিশনে না গিয়ে বাবার কাছে থেকে পড়াশুনা করতাম তাহলে মাধ্যমিকে অনেক ভাল ফল করতাম। হয়তো ঠিক বলে, আমি মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন পেলেও স্টার পাইনি। অনামী স্কুলের ভাল ছেলে থেকে নামী স্কুলের খারাপ ছেলে হয়েছিলাম। আগেই বলেছি পড়াশুনা করতাম না, ভীষণ ফাঁকিবাজ ছিলাম। কিন্তু একটা কথা কেবল মনে হয়, কত ভাল ফল করতাম? ভাল ফল করে কত বড় হতাম? অনেক ধনী হতাম? বিদেশ যেতাম? বিলাসবহুল জীবনযাপন করতাম? কি জানি?

আমার মনে হয় এসব করার জন্য বহু মানুষ আছে। আমি আছি আমার মত—অতি সাধারণ হয়ে যার বুকের মাঝে জেগে আছে সেই বাণী—''উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত—ওঠো জাগো লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না—Arise Awake and stop not till the goal is achieved.'' আর লক্ষ্যটা কী সেটাও স্বামীজী দিকনির্দেশ করে গেছেন—''Lay down your comforts, your pleasures, your names, fame or position, nay, even your lives and make a bridge of human chains over which million will cross the ocean of life. Bring all forces of good together''.

[লেখক কলকাতায় স্থিত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরে কর্মরত। দূরভাষ : 7685862217]

নকশি-কাঁথা

পার্থ দে

মাধ্যমিক, ১৯৮৫

স্নেহভাজনেষু চাঁদু

কতদিন তোমার কুশল সংবাদ পাই না। মন বড় অস্থির হইয়া আছে। কেমন আছ তুমি? গত গ্রীষ্মবকাশে যখন বাড়ি আসিলে দেখিলাম তোমার মুখটি শুকাইয়া গালের হনু বাহির হইয়াছে। পড়াশোনার চাপে তুমি শীর্ণ হইয়া গিয়াছ দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়া গিয়াছিল। এইভাবে কি তুমি আমাকে কষ্ট দিবে? তুমি কথা দাও যে শরীরের যত্ন লইবে, পেট ভরিয়া খাইবে। তাহা না হইলে আমিও অন্নজল ত্যাগ করিব।

ইতি আশীর্বাদক
তোমার ঠাকুরমা

আমার আশ্রমিক স্কুলবেলার হলুদ পোস্টকার্ডের দিনগুলো থেকে ভেসে এল স্মৃতি-সত্তা। তখন নীল ইনল্যান্ড লেটারে মোড়া আকাশ থেকে আসত বাড়ির চিঠি। মেঘ-পিওন নয় সে চিঠি বিলি করার ভার পড়ত সেবকদের ওপর। আমি কখনও সেবক ছিলাম না কারণ সেবক হওয়ার জন্য বায়োডাটায় সে গুণগুলো লাগে তার একটাও আমার মধ্যে ছিল না। প্রেয়ার হলে আরাত্রিক ভজন 'খন্ডন ভব—' শুরু করার মিনিট খানেকের মধ্যে আমি 'দিনের শেষে ঘুমের দেশে—'। এরপর স্টাডি হলেও গানটার সঞ্চারী আর অন্তরা চলতে থাকত। ডাইনিং হলে খেতাম যৎসামান্য কিন্তু সেটুকু সেরেও ফিরতাম সবার শেষে। তখন আমাকে দেখে অনেকের মনে হত দিনটা বুঝি চব্বিশ নয় আটচল্লিশ ঘণ্টার! এ হেন আমাকে একদিন শিবানন্দ সদনের খাঁদুদা চিঠিটা দিয়েছিলেন ক্লাস সিক্সের সেবকের হাতে দেওয়ার জন্য। খাঁদুদা শুধু আমাদের সদনের কেয়ারটেকার ছিলেন বললে কম বলা হবে—জামা-প্যান্টের ছেঁড়া বোতাম সেলাই করে দিতেন, মাথার ভেজা চুল মুছিয়ে আঁচড়ে দিতেন পরম মমতায়। আশ্রমিক জীবনে মা-কে তো কাছে পেতাম না তাই মায়ের-কাছে-করা বায়নাক্কাগুলো নিয়ে পৌঁছে যেতাম খাঁদুদার কাছে।

শুরুতে লেখা চিঠিটার প্রাপক চন্দ্রভানুদা। চন্দ্রভানু সরকার। আমাদের থেকে দু-ক্লাস উঁচুতে পড়া এই দাদাটিকে যাদের মনে আছে তারা জানে ভগবান তাকে যথেষ্ট উদারতা নিয়ে বানিয়েছিলেন। কোনো কার্পণ্য করেননি কাঁচামাল ব্যবহারে। চন্দ্রভানুদার স্নেহশীল ঠাকুরমা যদিও চাঁদুদার শুকিয়ে যাওয়ায় খুব চিন্তিত ছিলেন। ওই ব্যাচে আরেক দাদা ছিলেন (এক ক্লাস উঁচুতে পড়া দাদাকেও তখন আপনি-আজ্ঞে করাটা রীতি ছিল) নাম সুমন। তার নাম অবশ্য অনায়াসে হতে পারত দু-মন!

পিপুল কে পেড় তক দো চক্কর

ক্লাস ফোরে বিরজানন্দ ধামে আমাদের ওয়ার্ডেন ছিলেন সদ্য-নবীন-ব্রহ্মচারী-হওয়া অনিল মহারাজ। শরীর-চর্চা বিষয়ে এতটাই আগ্রহী ছিলেন যে রবিবার দুপুরে ধামের মধ্যেই কুস্তির আখড়া খুলে দিতেন। সম ভরবিশিষ্ট

খুদে যোদ্ধারা লড়ত একে অপরের বিরুদ্ধে। আমি বরাবরের অস্থিসার গামা পালোয়ান! তাতেও কেন জানি বরাবর নিজের পালোয়ানির ওপর আমার অগাধ আস্থা ছিল। একবার আমাকে লড়তে হল আমারই মতো আরেকজন কুস্তিগীরের বিরুদ্ধে। বলাবাহুল্য আমাদের কুস্তিটা সুপার ফেদার-ওয়েট ক্যাটেগরির ছিল! জীবনে একবারই কাউকে সম্মুখ সমরে পরাস্ত করার সুযোগ এসেছিল কিন্তু হল না। রাজীব ব্যানার্জী (ইনি বর্তমানে রসায়নের অধ্যাপক) আমাকে দেড় মিনিটের মধ্যেই পটকে ফেলেছিল। দারুণ একটা প্যাঁচ মেরে আমাকে কুপোকাত করেছিল। সম্ভবত চিন-লক কিম্বা কোবরা-ক্লাচ টাইপের কিছু একটা হবে। আমার বেইজ্জতি ওখানেই থেমে থাকেনি।

পরদিন গায়ে প্রবল ব্যথা নিয়ে সকালের ড্রিলের সময় গিয়ে দাঁড়ালাম সর্দারজীর সামনে। মনে একটাই আকুতি যেন আজকের দিনটা গেমস টিচার সর্দারজী আমাকে রেহাই দেন। কিন্তু সর্দার তো যে সে লোক নয়—সর্দার বীর সিং। পাঞ্জাব রেজিমেন্টের এক্স সার্ভিস ম্যান। লাইন অফ কন্ট্রোলে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে লড়তে গিয়ে গুলি খেয়েছিলেন। কথিত ছিল তাঁর পায়ের কাফ মাসলে তখনও দুটো গুলি নাকি অলংকারের মতো বহন করতেন।

আমি বললাম, স্যার শরীর মানে তবিয়ত খারাপ।

—ক্যায়া হুয়া

—ব্যথা স্যার (যতটা সম্ভব করুণ মুখ করে বলেছিলাম)

—*দর্দ হ্যায়?* কাঁহা পেট মে।

আমি ঘাড় দেখিয়ে বলেছিলাম, না স্যার এখানে।

(যদিও আমার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিং যথেষ্ট ভাল ছিল এবং উঁচু ক্লাসে আমার অভিনয় প্রতিভা আরও বিকশিত হয়েছিল)

বীর সিং বিড়ালের ঘেঁটি ধরার মতো আমার ঘাড় ধরে একটা পেল্লায় অর্ধচন্দ্র দিয়ে বলেছিলেন, চল ঝুটে কাঁহিকা পিপুল কে পেড় তক দো চক্কর লাগা।

জলফড়িং আর জলরঙের অধ্যায়

ছোটবেলা থেকেই আমি একটু এলেবেলে টাইপের ছিলাম। সাদামাটা জিনিস দেখেই আমার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাওয়ার দশা হত। নাগচম্পার ফুল, হলুদ বড় বড় কদমফুলে ছেয়ে থাকা গাছতলা, উজ্জ্বল হলুদ অমলতাস অথবা বর্ষাকালে সবুজ ঘাসের ডগায় উড়তে থাকা জলফড়িং! জন্মাবধি কলকাতার গাড়িঘোড়া লেন-বাইলেন দেখা অনভ্যস্ত চোখ প্রকৃতির বুকে যাই দেখত যেন গোগ্রাসে গিলত। আমার বন্ধু স্থানীয় ছেলে শুভেন্দু আমাকে জলফড়িং ধরা শিখিয়েছিল। সবাই জানে মাছি-ধরা সবচেয়ে দুরূহ ব্যাপার। মাছিদের পুঞ্জাক্ষি থাকে তাই শিকারী যেদিক থেকেই এগোক সে দেখতে পাবেই। শুভেন্দু আমাকে সেই মাছি ধরার টেকনিকটাও শিখিয়েছিল যে জন্য আমি আজও কৃতজ্ঞ। যাদের নাকের ডগা দিয়ে মাছি গলে যায় তারা পরে যোগাযোগ করলে শিখিয়েও দিতে পারি।

এগুলো ছাড়াও আঁকার ক্লাসটা ছিল আমার ফেভারিট। আঁকার শিক্ষক পাঁচুদা তখন চল্লিশের কোঠায়। মজার মানুষ—জোরে জোরে কথা বলেন প্রাণ খুলে হাসেন। নন্দলাল ঘরানার মানুষ। আমাদের বিদ্যাপীঠে

অঙ্কন শিক্ষকদের ইতিহাস খুব ঐতিহ্যবাহী ছিল। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অঙ্কন শিক্ষক যদিও আমরা যে বছর ভর্তি হই তিনি সে বছর ছেড়ে চলে আসেন। আরেকজন বয়স্ক অঙ্কন শিক্ষক যোগ দেন—ফণীভূষণ আচার্য। ক্লাস ফোরে একদিন আঁকার ক্লাসে ফণীদা ও পাঁচুদা বোর্ডে আঁকতে ডাকলেন। বিষয়—একটি ফুটবল ম্যাচ। দেবাশিস উঠে গিয়ে বোর্ডে আঁকল। আমি ওর আঁকা দেখে দাঁত বের করে খিকখিক করে হাসতে লাগলাম। ওর আঁকা মানুষগুলো বাক্সের মতো আর হাত-পা গুলো যেন গাড়ির রেঞ্জ হাতলের মতো। ওই রকম রোবট-মানুষ দেখেই হাসি চাপতে পারিনি! ধরা পড়ে গেলাম পাঁচুদার চোখে। বললেন, অ্যাই বোর্ডে উঠে আয়।

সেদিন পর্যন্ত নিজের আঁকা সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। কিন্তু চক ধরে বোর্ডে যখন আঁকলাম তখন মনে হল আঁকা খেলোয়াড়গুলো বল নিয়ে বুঝি সত্যি ছোটাছুটি করছে। কেমন এঁকেছিলাম জানি না পাঁচুদা বলেছিলেন, বাহ বেশ এঁকেছিস তো!

কিন্তু পাঁচুদা-ফণীদার প্রশস্তি আর আমার 'বেশ আঁকাটাই' কাল হল! পরের সাতবছর ধরে বন্ধুদের আঁকার খাতা, জীবন বিজ্ঞানের খাতা, ওয়ার্ক এডুকেশন খাতা, ক্লে-মডেলিংয়ের খাতায় ছবি এঁকে এঁকে আমার হাতে বুঝি বাত হয়ে গিয়েছিল। অহিংসবাদী বন্ধুদের কাছ থেকে পারিশ্রমিক জুটত বড়জোর দুটো বিস্কুট বা দুটো ক্যান্ডি। কিন্তু সহিংসবাদী কেউ কেউ আবার ভয় দেখিয়ে কার্যোদ্ধার করত।

নতুন বন্ধু

ক্লাস ফাইভের পর সিক্সে উঠে আবার এক ঝাঁক নতুন বন্ধু ভর্তি হল। তখন আমরা ত্রিগুণাতীতানন্দ ধামে থাকি। মনীষী, সঞ্চয়ন, অরিন্দম চক্রবর্তী—এরকম আরো অনেকে—সবাই খুব ব্রাইট। এক ঝলক নতুন বাতাস, নতুন ভাবনা এল।

পেরিস্কোপ বানানোর নো-হাউ, প্রজাপতির জীবনচক্র হাতে কলমে করা। এই শেষের ব্যাপারটা আমাকে বেশি টানল। সবাই আকন্দ আর করবী গাছ থেকে প্রজাপতির শুককীট সংগ্রহে মেতে উঠল। আমিও একটি শিশু শুঁয়োপোকাকে দত্তক নিলাম। এর বাসস্থান হল আমার ভাঙা জ্যামিতি বাক্স। নাম দিলাম মজন্তালী সরকার। উপেন্দ্রকিশোরের শিশু রচনাসমগ্রর এই চরিত্রটি আমার খুব প্রিয় ছিল।

আমার বন্ধু মজন্তালী আর আমার দিন ভালই কাটছিল। ক্লাসঘরে বসে দুজনে একসঙ্গে পড়া শুনতাম। মাঝে মাঝে জ্যামিতি বাক্স খুলে আমার স্যাঙাতকে আকন্দ পাতা খেতে দিতাম। স্কুলের পর হস্টেলের দেয়াল আলমারিতে রাখতাম তাকে। বেশ স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠেছিল সে। একদিন সকালে বাক্স খুলে দেখি মজন্তালী ঝলমলে রেশমী সুতোর একটা জ্যাকেটের ভিতর সেঁধিয়েছে। মুখচোখ কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। এক্কেবারে নট নড়ন চড়ন যাকে বলে নির্বিকল্প সমাধি। আমি একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। আস্তে আস্তে মজন্তালীর গুটিটা আরো রঙিন আর ঝলমলে হয়ে উঠল। শেষে একদিন আমার চোখের সামনে গুটি কেটে বেরিয়ে এল মজন্তালী নয় একটা আস্ত রঙিন প্রজাপতি। তারপর তার ভিজে পাখনাটা একটু শুকোতেই সে উড়ে গেল জানালা দিয়ে। আমার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল কারণ আমার দিকে প্রজাপতিরূপী মজন্তালী ফিরেও তাকায়নি। আজ এত বছর পর মাঝবয়সে পৌঁছে মনে হয় আমাদের জীবনচক্রটাও তো অনেকটা একইরকমের। শুঁয়োপোকা থেকে

প্রজাপতি হয়ে ওঠা। রঙিন প্রজাপতি হয়ে সব ছড়িয়ে পড়ছে মুম্বই, বেঙ্গালুরু, লন্ডন, নিউ ইয়র্ক। কিন্তু প্রজাপতি হয়ে তার শুঁয়োপোকা জীবন আর শুঁয়োপোকা বন্ধুদের ভুলে গেলে চলে!

বেনীআসহকলা

তরতর করে সবাই বাড়ছে কমপ্লান বয়ের মতো। আমি এক বাঁটকুল রয়ে গেছি। তখন ক্লাস সিক্স, খুব ম্যাচ হচ্ছে রোজ। সিক্স-এ ভার্সেস সিক্স-বি কিম্বা সিক্স-ই। আমি খেলাধূলায় একদম ঢেঁড়স না হলেও আমার বাঁটকুল চেহারার জন্য টিম সিলেকশনের সময় অবধারিতভাবে বাদ পড়তাম। তবে দুধের সাধ আমরাও ঘোলে মেটাতাম। সিক্স-এ আনসিলেক্টেড ইলেভেন ভার্সেস সিক্স-বি আনসিলেক্টেড ইলেভেন। মানে ঢেঁড়স বনাম রাঙাআলু! বুদ্ধিটা চিন্ময়ের ছিল। চিন্ময়ের কানদুটো ছিল 'স্টার ট্রেক' সিরিজের ক্যাপ্টেন স্পকের মতো। ওর কানদুটো আর দুষ্টুমি বুদ্ধির জন্য নাম হয়ে গিয়েছিল—পণ্ডিত! একদিন বিকেলে আমরা মাঠে ফুটবল খেলছি। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টি শেষে একটুকরো আহ্লাদী রোদ উঠতেই মেঘের পিছন থেকে উঁকি মারল একটা রামধনু। হঠাৎ দেখি সেই ঝলমলে বেনীআসহকলা-কে পিছনে রেখে একটা ঢ্যাঙা মতো লোক হেঁটে আসছে মাঠের দিকে। কাছে এলে বুঝলাম সদ্য যুবক লোকটা আমাদের দলে ভিড়ে ফুটবল খেলতে চায়। আমাদের বিস্ময় কাটার আগেই লোকটা ফুলপ্যান্ট গুটিয়ে সটান মাঠে। মুহূর্তে আমাদের মধ্যে মিশে আমাদেরই একজন হয়ে উঠল যেন। ট্যাকল করছে, ট্যাকল আটকাচ্ছে। পাশ থেকে কে যেন বলল, নতুন ইংরেজীর টীচার শক্তিদা। দেখতে দেখতে নরেন্দ্রপুরের প্রাক্তনী লোকটা আমাদের খুব কাছের হয়ে উঠল। তার আগে পর্যন্ত ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের একটা দূরত্ব ছিল। কিন্তু সমীহ-জাগানো ঢ্যাঙা লোকটা যখন হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো রাস্তা দিয়ে যেত পিছনে পিলপিল করে ছুটত ইঁদুরের মত ছাত্রকুল। ক্লাস সিক্সের ছাত্রদের নিয়ে প্রথম বিতর্কসভার আয়োজন করলেন। বিতর্কের মোশনটাও উনিই বাছলেন—"লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে"। বাংলা আর ইংরেজী দুটোতেই হল বিতর্কসভা। বাংলা ডিবেটের জন্য বারোজনকে বাছলেন যারা পক্ষে আর বিপক্ষে বলবে। বাছাইয়ের সময় যখন আমার নাম ধরে ডাকলেন বিস্ময়ে আমার চোয়াল ঝুলে পড়ল। জীবনে সেই প্রথম নিজেকে ঢেঁড়সের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছু মনে হল। সেদিন দেখলাম আবার রামধনুটা আঁকা রয়েছে আকাশের গায়ে। আর ঝলমল করছে বেনীআসহকলা।

বাঙাল-ঘটি দ্বৈরথ

ঠাকুর-মা-স্বামীজীর তিথি পূজোর বাইরে আরেকটা উৎসবের দিন ছিল ছোটবেলার শিবানন্দ সদনের দিনগুলোয়। সেটা ঘটি-বাঙালের দ্বৈরথ মানে ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান। ক্লাসে মোহনবাগানের তুলনায় ইস্টবেঙ্গল সমর্থক ছিল নগণ্য। যখন ম্যাচ খেলতাম আমাদের ইস্টবেঙ্গল টিমে লোকই হত না। সাকুল্যে তিনটে ভাল প্লেয়ার ছিল—হিল্লোল, ত্রিপাঠী আর গৌতম। কিন্তু তিনজনে তো আর টিম হয়না বাকি আটজন আমাদের মতো ঢেঁড়স ভরে একটা এলেবেলে একাদশ তৈরি হত। দেবব্রত, দেবাশিস, অনির্বাণ, সিদ্ধার্থ আর গোলকিপার অভিজিতের মতো ভাল প্লেয়াররা সব মোহনবাগানের টিমে। ওদিকে কলকাতার আসল ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগানের গায়েও তখন কিংফিশার আর ম্যাকডোয়েলের তকমা লাগেনি। দুটো টিমেই তখন বীর বঙ্গসন্তানরা

খেলছে। মানস-বিদেশ-গৌতম-প্রসূন-শ্যাম-সুরজিৎ-ভাস্কর। বিদেশী তখন সদ্য এসেছেন মজিদ বাসকর। অবাঙালি অন্য রাজ্যের হাবিব-আকবর-উলগানাথন।

তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি। কলকাতা লিগের শেষদিকের ডার্বি ম্যাচ—ইস্টবেঙ্গল বনাম মোহনবাগান। প্রবল উৎসাহ আমাদের খুদে সমর্থকদের মধ্যে। আমাদের ঘটি-বাঙালের দ্বৈরথে শ্যাম মহারাজের মতো মারাঠী মানুষও ফুটবল ফিভারে আক্রান্ত। শিবানন্দ সদনের দোতলায় ভজন-হলের পাশের ঘরে আমরা জড়ো হয়েছি। দুখানা বড় বড় মাইক লাগানো হয়েছে। একটু আগে কিক অফ হয়ে গেছে। আমরা উদগ্রীব হয়ে অজয় বসুর ধারা বিবরণী শুনছি। সময় এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু কি বিশ্রী খেলা হচ্ছে আজ! আমরা খুদে সমর্থকরা কেউ টেনশনে দাঁত দিয়ে নখ কাটছি তো কেউ রাগে দাঁত কিড়মিড়। হাফটাইমেও গোলশূণ্য। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। এইসময় মোহনবাগানের বিদেশ বসু লালকার্ড দেখে মাঠের বাইরে চলে গেল। আমি এক বন্ধু মোহনবাগানিকে ভেংচি কাটলাম। সেও ঘুঁষি পাকিয়ে তেড়ে এল। এরপর আবার দিলীপ পালিত লালকার্ড দেখে মাঠ থেকে বেরিয়ে যেতেই ইডেন গার্ডেনস সেদিন রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল। রেডিওয় শুনে আমরা বুঝতে পারছিলাম মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মধ্যে মাঠে হাতাহাতি মারামারি শুরু হয়ে গিয়েছিল। এদিকে আমরা খুদে সমর্থকরাও রাগে ফুঁসছি একে অপরের দিকে তাকিয়ে। শ্যাম মহারাজের মুখেও অসীম বিরক্তি। তিনি আমাদের অনেককেই সামলাচ্ছেন। প্রবল গণ্ডগোলের মধ্যে খেলাটা গোলশূণ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যেবেলা ভজন সেরে ফেরার সময় শ্যাম মহারাজের ঘরের সামনে অনেক জটলা দেখে থমকে গিয়েছিলাম। কলকাতার ডার্বির ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেছে ততক্ষণে যার খবর এসেছে রেডিও মারফৎ। সেই ম্যাচ শেষে দর্শকাসনে দু-দলের সমর্থকদের দাঙ্গার সময় ভিড়ে পিষ্ট হয়ে মারা গেছেন ১৬টি তরতাজা মানুষ। সেই কালো দিনটা ছিল ১৬ই আগস্ট, ১৯৮০।

অবনী বাড়ি আছো?

আমাদের আশ্রমিক স্কুলের রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী বেশ ঘটা করেই হত। হয়ত ঐতিহ্য আর কৌলিন্যে তা কবিগুরুর শান্তিনিকেতনের কাছে নেহাতই অর্বাচীন তবু তার স্মৃতি আজও আচ্ছন্ন করে রাখে।

একটা ছোটখাট প্রভাত ফেরী বেরোত। তারপর আমরা জড়ো হতাম আম্রকুঞ্জে। মেয়েদের শ্যাম্পু করা চুলের মতো ফুলেফেঁপে ওঠা আম গাছের মাথাগুলি। আমরা তলায় বসে পাখিদের সঙ্গীত সিম্ফনী শুনতাম। উঁচু ক্লাসের কোনো দাদা হয়ত আবেগসিঞ্চিত কণ্ঠে 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তি করছেন, আমরাও দুরু দুরু বক্ষে শুনছি তন্ময় হয়ে। হঠাৎ এক বেহায়া কোকিল আমগাছের মগডাল থেকে ডেকে উঠল, কু-উ-উ। ব্যস অমনি অন্য ডাল থেকে আরেকটি ফাজিল কোকিল জবাব দিল কু-উ-উ। এরপর তিন নম্বর, চার নম্বর, পাঁচ নম্বর কোকিলরা আমগাছের মডগাল থেকে না ডেকে গাছের তলায় তেরপলে বসা আশ্রমিকদের ভিড় থেকে সোল্লাসে ডেকে উঠল। ততক্ষণে আবৃত্তিকারের 'মাসী মাসী' আর্তনাদ কোকিলের সিম্ফনীতে ঢাকা পড়ে গেল।

একবার রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তীতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এলেন। আমাদের বাংলার শিক্ষক শান্তি সিংহদাও তখন বড় কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'লালমাটি নীলঅরণ্য' সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'যেতে পারি কিন্তু কেন

যাব' প্রকাশিত হয়ে তিনি তখনই প্রায় কিংবদন্তী। আমরা তখন সেভেনে পড়ি। অনেক শুনেছি কবির কথা। তিনি নাকি রাতের কলকাতা শাসন করেন। তারপর খালাসীটোলা না বারদুয়ারি কি কি জায়গায় তার পায়ের ধূলো পড়ে (একবার তো ভেবেছিলাম ছুটিতে বাড়ি ফিরে বাবাকে বলব জায়গা দুটো দেখাতে। শেষে এক বুদ্ধিমান বন্ধু আমাকে নিরস্ত্র করে)। যাকগে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে যাব এটাই ছিল মনোবাসনা। কিন্তু মুশকিল হল তার মোটা কাঁচাপাকা গোঁফ, মোটা জুলফি আর কালো ফ্রেমের মোটা চশমা বাঁধানো মুখে স্বল্প কেশ দেখে ঈষৎ ভয়ের উদ্রেক হচ্ছে। আসলে তাকে দেখে আমার মতো চতুর্দশবর্ষীয়ের কবি বলে মনেই হচ্ছিল না। যেন অঙ্ক বা ভূগোলের মাস্টার হলেই বেশি মানাত। এদিকে কবির কাছে যেতেই হবে। খাতায় বড় করে অটোগ্রাফ নেওয়ার বাসনা সেই সকাল থেকে মনের মধ্যে পাক খাচ্ছে। মুশকিলটা হল অন্য জায়গায়। সকাল থেকে সেদিন শান্তিদা কবিকে দেহরক্ষীর মতো আগলে রেখেছেন। কবির ধারেকাছে কাউকে ঘেঁষতে দিচ্ছেন না। অটোগ্রাফ চাইলে কবি নাকি বিরক্ত হবেন। এদিকে কবি রাতের ট্রেনে কলকাতায় ফিরবেন।

কোনো ফন্দী মাথায় আসছে না। শেষে আমার এক বন্ধু দেবাশিস (বর্তমানে উকিল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ল' অফিসার) লাইব্রেরীর সুব্রতদার কাছ থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা বই যোগাড় করে এনে বলল, চল 'যেতে পারি কিন্তু কেন যাব' কবিতাটার মানে বুঝতে চাই বলে কবিকে গিয়ে ধরি। আমি বললাম, তোর যেমন বুদ্ধি! ওঁর দায় পড়েছে তোর মতো আনাড়িকে ভাব সম্প্রসারণ শেখাতে।

শেষে অনেক ঘেঁটেঘুঁটে মাথার ঘিলু নিড়েন দিয়ে একটা ফন্দি বের করলাম। শান্তিদার সুরক্ষা বলয় একটু শিথিল হতেই দুজনে হাজির কবির কাছে। আমি ঘাড় চুলকে বললাম স্যার আপনার একটা কবিতা আপনাকে আবৃত্তি করে শোনাতে চাই। দুটি অর্বাচীনের সাহসে তিনি বোধহয় মুগ্ধই হয়েছিলেন অথবা আমাদের আবদারে কোথাও হয়ত একটু আমাদের আভাস পেয়েছিলেন তাই সাগ্রহে রাজী হয়ে গেলেন।

''অবনী বাড়ি আছে'' কবিতাটা আমার মুখস্থই ছিল তাই গড়গড় করে বলতে শুরু করলাম। উনি চুপ করে মন দিয়ে আগাগোড়া শুনে গেলেন। আমার আবৃত্তি শেষ হলে বললেন, ভালই বলেছ, তোমার গলাটিও বেশ মিষ্টি। তবে তুমি ছোট তো তাই কবিতার মর্ম না বুঝে বলেছ। সেটা বুঝতে পারলে এ কবিতা তোমার গলায় আরও ভাল মানাত। আরেকটা মজার কথা বলি তা হল রাতদুপুরে ঘুমন্ত অবনীকে ওরকম মিহি গলায় ডাকলে অবনী উঠবে কেন হে ছোকরা হা হা হা! নাও এবার আমার গলায় শোনো।

আমি সেদিন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সকণ্ঠে জীবনে প্রথম ''অবনী বাড়ি আছো'' শুনেছিলাম। আর সেটা ছিল শোনার মতো শোনা। তৃতীয়বার যখন ''অবনী বাড়ি আছোওওও'' বলে ডাক দিলেন তখন মনে হল এ ডাক শুনে শুধু অবনী কেন মড়া মানুষও জেগে উঠবে!

বার্লো চক্র ও ব্যাগি প্যান্ট

ক্লাস এইটের প্রেমানন্দ ধাম ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে। সামনে ছোট মাঠ। মাঠ পেরোলে লাইব্রেরী, পাশেই ডাইনিং হল। বিবেকমন্দির আর সারদামন্দির দুটোই সমদূরত্বে।

শীতের শুরুতে ঠিক হল সেবার প্রেমানন্দ ধামে কালীপূজো হবে। তবে ব্যাপারটা ঠিক বারোয়ারি স্টাইলে নয়, একটু লুকোছাপা করে শেষ মুহূর্তে ওয়ার্ডেন মহারাজের পারমিশন নেওয়া হল। মূল উদ্যোক্তা—তাপস,

সঞ্জয় মণ্ডল, হিল্লোলরা। ঠাকুর কে কিনে এনেছিল মনে নেই। আমরা থার্মোকোল কেটে ঘরেই প্যান্ডেল বানালাম। কিন্তু কলকাতার পূজো প্যান্ডেলের মতো স্পেশাল এফেক্ট, লাইটিং না হলে কি জমে! তখন আজকের দিনের মতো এলইডি ছিল না তাই ক'টা টুনি বাল্ব আর নীল সেলোফেন কাগজে মোড়া টর্চ দিয়েই চালাতে হল। পঞ্জিকামতে রাত বারোটার পর মাতৃ আরাধনার সময়, জানাল খুদে পুরুত-বন্ধু সোমনাথ। শ্যামাপূজায় মায়ের নৈবেদ্যর সঙ্গে বলিও দিতে হয়। সে দায়িত্বও সোমনাথের। একটা মর্তমান কলা আনা হল বলির জন্য। আমাদের বিদ্যাপীঠের শ্যামাপূজা খুবই ঐতিহ্যবাহী। বহুবছর ধরে খুব নিষ্ঠা ও জাঁকজমকের সঙ্গে হয়। রাতের বেলা মাঠে ঘটা করে বাজি পোড়ানো হয়। বুড়িমা আর শিবকাশীর বাজির নামকরা কারিগররা যেত বাজি পোড়ানোর প্রদর্শনী করতে। বাজিতে ফুটে উঠত ঠাকুর-মা-স্বামীজীর প্রতিমূর্তি! এছাড়া নায়াগ্রা ফলস, কদম গাছ আর স্পেশাল হাউই সহ বাজির সম্ভার ছিল তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো যা আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল! কিন্তু ক্লাস সেভেনে প্রেমানন্দ ধামের কালীপূজো ছিল আমাদের প্রথম মিনিয়েচার ফর্মে বারোয়ারি পূজোর হাতেখড়ি। হয়ত বন্ধুদের মধ্যে আজ অনেকেই বাড়ি-পাড়া-অফিসের পূজো কমিটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত কিন্তু সেই ছোট্ট পূজোর স্মৃতিমেদুরতা আজও তাদের নিশ্চয় আচ্ছন্ন করে! সেবার স্পেশাল এফেক্টের দায়িত্ব নিয়েছিল সঞ্জয়। রাতারাতি তড়িৎ বিজ্ঞানের ফ্লেমিং সাহেবের বামহস্ত নীতি প্রয়োগ করে বার্লো চক্র বানিয়ে ফেলল যা কিনা মা কালীর পিছনের ঘূর্ণায়মান জ্যোতির্বলয় হয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল।

এই সময়টাতেই একদিন বিকেলে দেখি এক লালমুখো সাহেব শক্তিদা-স্বপনদার সঙ্গে গপ্পো করছে। জানতে পারলাম বুড়ো সাহেব নাকি ইউসিএলএ, সানফ্রানসিস্কোর জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিখ্যাত প্রফেসর জন ডবসন। বিজ্ঞানী সাহেবের সঙ্গে এসেছেন আরেক সাহেব ব্রহ্মচারী। তার পরনে আবার সাদা পোশাকের বদলে জলপাই রঙের বাবাস্যুট।

চাঁদ-টাদ জোছনা-টোছনা আমরা পছন্দের বিষয় হলেও জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে আমি ছিলাম একেবারে গণ্ডমূর্খ। আমার বন্ধু সুমনশংকর আবার এ বিষয়ে বিশেষ পণ্ডিত। গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকা-ছায়াপথ-কৃষ্ণ গহ্বর সব কিছু সে জেনে বসে আছে। এর মধ্যে একদিন শ্যাম মহারাজ শিবানন্দ সদনের ছাদে উঠিয়ে একটা সুবিশাল টেলিস্কোপ থেকে আমাদের চাঁদ দেখালেন।

চাঁদের ক্রেটার আর কি কি যেন সাহেব সেদিন আমাদের বোঝালেন। সব ছাই বুঝিও নি। পরদিন মাঠের রাস্তা ধরে বিজ্ঞানী সাহেব আর ব্রহ্মচারী সাহেবকে আসতে দেখে সুমন বলল, চল সাহেবের কাছে সব ব্যাপারগুলো সব বুঝে নিই। আমি দূর থেকে দেখছি একটা ঢলঢলে বস্তার মতো প্যান্ট পরে ডবসন সাহেব আসছে। এই প্যান্টকে নাকি ব্যাগি প্যান্ট বলে। শুধু চাল-ডাল বাজার হাট কেন গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বুঝি ঢুকে যাবে সাহেবের প্যান্টের পকেটে। আমি হাঁ করে দেখছি সাহেবের প্যান্ট এদিকে সুমন সাহেবকে কি জিজ্ঞেস করেছে আমি জানি না। সাহেবও খ্যাঁকরম্যাকর করে ইংরেজীতে কি বলে চলেছে বুঝতেই পারছি না। আমার খালি মনে হচ্ছে এই সময় শক্তিদা পাশে থাকলে বুঝি একটু বুকে বল পেতাম। সাহেবকে সুমনের অনেক প্রশ্ন, আমার শুধু একটাই প্রশ্ন—সাহেবের প্যান্টের পকেটে কি আছে—কনস্টেলেশন না কৃষ্ণ গহ্বর! সাহেব আমার নিরুচ্চারিত প্রশ্ন বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। হঠাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনলেন গোটা তিনেক লজেন্স।

চাঁদ না মঙ্গলের লজেন্স—সে বিষয়ে গভীর সংশয় নিয়েও আমি হাত বাড়ালাম!

হালুম আর বুধুয়া

জানুয়ারী মাসটা বিদ্যাপীঠে বরাবর খুব আনন্দের। সেশনের শুরুতে পড়াশোনার চাপ কম, হিমেল হাওয়ায় দুপুরের কমলালেবু-রঙা রোদ্দুরে ক্রিকেট খেলা। ক্লাস এইটের জানুয়ারী মাসটায় ছিল দারুণ সব বোনাস অফার—ক্রিকেট ম্যাচ, অ্যানুয়াল একজিবিশনের সঙ্গে সেবার বিদ্যাপীঠের রজতজয়ন্তী উদযাপন। তিন-চার দিন ধরে জিভে-জল-আসা খাবারের মেনু, অনুষ্ঠান, নাটক—আরো কত কি!

সুখের দিন কি মানুষের চিরকাল যায়! উৎসব শেষ হওয়ার পর ক্লাস রুটিনে চোখ রাখতেই হৃদকম্প শুরু হল। বাংলার ক্লাস নেবেন বাংলার বাঘ থুড়ি বিদ্যাপীঠের বাঘ—স্বামী বিশ্বনাথানন্দ (সুভাষ মহারাজ)। যেদিন মহারাজের ক্লাস থাকত আমাদের হাসপাতালের আউটডোরে ডাঃ দরিপার চেম্বারে অষ্টম শ্রেণীর রুগীর সংখ্যা বেড়ে যেত—যদি ডাক্তারবাবুর পরামর্শে একদিনের বেড রেস্ট পাওয়া যায়!

সুভাষ মহারাজ তখন পাঠ্যবইয়ে 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের একটি অংশ পড়াচ্ছেন। ইমেজারি, অক্সিমোরনে ভর্তি কবিতাংশ সেটা—কিছুই মাথায় সেঁধোচ্ছে না। এদিকে ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষা এসে গেছে। বাংলা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ভাষা পড়ে অর্ধেক ছেলে মানেই বুঝতে পারছে না তো উত্তর লিখবে কি! পরীক্ষার পর খাতা বেরোনোর দিন যত এগিয়ে আসছে তত সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ছে। অবশেষে খাতা দেখানোর ডুমস-ডে এসে গেল। আমার পিছনে বসত প্রবীর সাহা (বর্তমানে আই আই টির অধ্যাপক) আর পাশে পার্থপ্রতিম দে (শিবপুর বেসুর অধ্যাপক)। দুজনেই ভাল ছেলে। প্রবীর দাঁত বের করে বলল, আমি ফেল।

আমারও ভয়ে আত্মারাম খাঁচা ছাড়া!

সুভাষ মহারাজ খাতার বান্ডিল হাতে করে ক্লাসে ঢুকলেন পিনপতন নিস্তব্ধতার মধ্যে।

একে একে খাতা দিচ্ছেন আর গম্ভীর মুখে নম্বর বলছেন—পাঁচ, ছয়, সাড়ে আট, এগারো (এক্ষণে বলে নেওয়া ভাল পরীক্ষার পূর্ণমান ৫০)!

এক সময়ে আমার নাম ধরে ডাকলেন। উঠে দাঁড়ালাম, ভাবলাম এবার বুঝি বাঘ হালুম বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে!

বললেন, ভাল হয়েছে, সেকেন্ড হায়েস্ট পেয়েছিস—২২।

তিরিশের তলায় কিন্তু কুড়ির ওপর নম্বর মাত্র তিনজন পেয়েছিল—অরিন্দম চক্রবর্ত্তী, অভিজিত মণ্ডল আর আমি।

বাংলা লিখতে পারার প্রথম কনফিডেন্সটা আমাকে সুভাষ মহারাজ দিয়েছিলেন। তবে আমার বাংলা শিক্ষার জন্য আমি আরও দুজনের কাছে ঋণী যার প্রথম জন হলেন ফণীভূষণ খাটুয়াদা। খুব কম মানুষ আছেন যার বাংলা ব্যাকরণ জ্ঞান তার চেয়ে বেশি! এছাড়া আরেকটা গুণ ছিল ফণীদার—খুব জমিয়ে গল্প বলতে পারতেন। সাদামাটা গল্পও তাঁর বলার গুণে রোমহর্ষক হয়ে উঠত। দ্বিতীয় জন যার কাছে আমার ভাষাশিক্ষার (ইংরেজী ও বাংলা) জন্য আমি ঋণী সে হল আমার পরমবন্ধু মনীষী মুখোপাধ্যায় (বর্তমানে নামী ব্যবসাদার, দেশবিদেশে ওর কোম্পানীর ক্লায়েন্টরা ছড়িয়ে)। মনীষী বি-সেকশনে পড়ত। যেমন সাবলীল ছিল ওর লেখার ভঙ্গি তেমন ছিল ওর রসবোধ যা আজও অক্ষুণ্ণ।

ক্লাস এইটে সবার গলার অ্যাডামস অ্যাপল উঁচিয়ে উঠছে। স্বরের পরিবর্তন হচ্ছে—কারো গলা বসে গেছে—কারো ফ্যাসফ্যাসে হাঁড়িচাচা নয়তো হাফ-ব্যারিটোন। আমি আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় কখনও নাম দিইনি—সেবার

দিলাম। আসলে প্রতিযোগিতার কবিতাটা পড়ে আমার ভীষণ ভাল লেগে গিয়েছিল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বুধুয়ার পাখি'। কবিতার প্রোটাগনিস্ট প্রকৃতিপ্রেমিক বুধুয়া এক সাঁওতাল কিশোর যে মাঠেঘাটে গরুছাগলের বাগালি করে তার সঙ্গে আমি আজও নিজেকে আইডেন্টিফাই করি। স্টেজে যখন বলতে উঠেছিলাম কেন জানি মনে হয়েছিল আমি নিজেই যেন বুধুয়া। কবিতা বলা শেষ হলে বুঝতে পারি সবাই আমি নয় বুধুয়াকে বুকে টেনে জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে।

তুমি ঈশ্বরের আধার

রজতজয়ন্তীর সময় প্রেসিডেন্ট মহারাজ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর ভাষণ শুনেছিলাম। সঙ্গে ছিলেন আমাদের বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী মহারাজের ভাষণ। তাঁর জ্ঞান ও বাগ্মীতা ছিল কিংবদন্তীসম। ওনাকে খুব শ্রদ্ধা করতাম আমরা। এরপর এসেছিলেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভারতীয় ফলে ইংরেজীতে বলতেন। সেই বয়সে সবটুকু বুঝতাম না যেটুকু বুঝতাম তাতে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য—'আত্মন মোক্ষার্থম জগত হিতায় চ'—কিছুটা বুঝলেও বাকি অনেক কিছুরই মর্মোদ্ধার করতে পারতাম না। ক্লাস এইট পর্যন্ত ইন্ডিয়ান কালচার না বুঝেই মুখস্থ করতাম। না বুঝেই গীতার শ্লোক টীকাসহ ঝরঝর করে লিখে প্রচুর নম্বরও পেয়ে যেতাম। কিন্তু এই বয়সটা থেকেই অনেক প্রশ্ন জাগছিল মনে। উত্তর খুঁজে বেড়াতাম কিন্তু পেতাম না। মনে হত আরেকটু সহজ করে যদি কেউ বোঝাত!

এই সময় একদিন বিদ্যাপীঠে এলেন স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। আজ থেকে তিরিশ বত্রিশ বৎসর আগে তখন তার তেজোদ্দীপ্ত চেহারা ঠোঁটে লেগে অমায়িক হাসি। আমাদের অ্যাসেম্বলি হল-এ ওনার জন্য সভার আয়োজন করা হল। উনি বলতে উঠলেন, আমরা তন্ময় হয়ে শুনছি। কি ঝরঝরে সহজ বাংলায় বলছেন উনি! মনে হচ্ছিল ধর্মের কথা এত সহজ করে কেউ বলতে পারেন!

ওনার বক্তব্যের পর ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব।

আমাদের ক্লাসের অমিতাভ রায় উঠে বলল, মহারাজ, আমার তিনটি প্রশ্ন আছে।

উনি স্মিত হেসে বললেন, বল।

অমিতাভ। মহারাজ, আমার প্রথম প্রশ্ন—ঈশ্বর কি আছেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—থাকলে তিনি কোথায় আছেন?

তৃতীয় প্রশ্ন—কিভাবে আছেন?

স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।। হ্যাঁ ঈশ্বর আছেন। তোমার মধ্যে আছেন, মানে তুমিই ঈশ্বরের আধার। আর ঈশ্বর আছেন মানবরূপে তোমারই আকারে।

ওই গাছে জ্যোতীষ পাখি আছে

বহুদিন ভেবেছি ডাঃ দরিপা কিসের টানে বিদ্যাপীঠে কাটিয়ে গেছেন সারাজীবন! যে কোনো ডাক্তারের মত তিনি কেরিয়ারিস্ট ছিলেন না কেন? এই অমোঘ প্রশ্নটা বারবার মনে আসত। আছ বুঝি তিনি তার মেধাবী সন্তান অরূপরতন দরিপার জন্য তার নিজের কেরিয়ারের কথা ভাবেননি। বিদ্যাপীঠের ইতিহাসে মেধাবী

ছাত্রদের তালিকায় অরূপরতনদা ছিলেন অন্যতম। ডাক্তারবাবুর পরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি ছিল রবিমামার। তিনি ছিলেন হাসপাতালের মেডিক্যাল স্টোরের ম্যানেজার। বিদ্যাপীঠে সব শিক্ষকদের 'দাদা' সম্বোধন করার নিয়ম ছিল কিন্তু রবিমামাকে কখনও দাদা বলে ডাকতে শোনা যায়নি। ব্যাচ পরম্পরায় এটাই চলে এসেছে। রবিমামা তার অধস্তন চার কর্মচারীকে সুর করে হাঁক দিতেন—কেষ্টা-অবনী-মহাদেব-মহাদানী। কেষ্টদা আর অবনীদা ছিলেন হাসপাতালের ডিসপেনসারির কম্পাউন্ডার। মহাদানীদা হাসপাতাল প্যান্ট্রির দেখাশোনা করতেন। আর মহাদেবদা হাসপাতাল সাফসুতরো আর বাগানের দায়িত্বে ছিলেন।

রেললাইনের ধারঘেঁষা কাগজি লেবু, করবী আর মাথা উঁচু দেবদারু ঘেরা একতলা হাসপাতাল বাড়িটা যেন এক অন্য অন্তর্মুখী পৃথিবী। এখানে মন্থর দ্বিপ্রহর কাটত আনন্দমেলা, শুকতারা আর টিনটিনের জগতে। আমাদের হাসপাতাল যাপনে বিশেষ বর্ণাশ্রম ছিল—এ-ডায়েট, বি-ডায়েট ও সি-ডায়েট। হাতভাঙা, পা-ভাঙা রুগীদের জন্য চারপিস মাংস সম্বলিত এ-ডায়েট। বি-ডায়েটে মাছ থাকত।

পৃথিবীর সবচেয়ে দুরূহ এবং ডায়াগনসিস-অসাধ্য রোগটি হল পেট ব্যথা। আজকাল ডাক্তাররা পেটব্যথার জন্য আলট্রা-সোনোগ্রাফি, এন্ডোস্কোপি বা কোলোনস্কোপির টেস্ট করতে দেন। এসব টেস্ট করাতে রুগীর যা অর্থদণ্ড হয় তাতে বলা যায় এগুলো আসলে ডাক্তারবাবুর দেওয়া পেট ব্যথার শাস্তি। আমাদের আশ্রমিক স্কুলে ডাক্তারবাবু পেটব্যথার রুগীদের শাস্তি দেবার জন্য একটা সহজ উপায় রেখেছিলেন যেটার নাম—সি-ডায়েট!

এই ডায়েটে থাকত সিক-ঝোল। সিক (ইংরেজীতে পড়ুন) অর্থাৎ রুগীর ঝোল। এই বিশেষ ঝোলটি ছিল সর্বরোগহরা পথ্যি! যে রুগী একবার খেয়েছে সে পেট ব্যথা কমে যাওয়ায় আর দ্বিতীয়বার মুখ ফুটে এটি খেতে চাইবে না। ফলে পেটব্যাথার রুগীদের ওষুধের চেয়ে ডাঃ দরিপার এই 'সিক-ঝোল' পথ্যি বেশি ধরত।

দিনমানে হাসপাতালের ঘরে ঘরে যখন সাঁঝবাতি জ্বলে উঠত তখন মহাদেবদা তার বেতো পা টেনে টেনে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ছোট লোহার কড়াইয়ে ধুনো জ্বালিয়ে ঘুরতেন। তখন বিষণ্ণবিধুর গলায় মহাদেবদা গাইতেন জগন্ময় মিত্রের 'আমি ভুলে গেছি তব পরিচয়/তব মুখখানি ভুলি নাই।'

তখন আধবুড়ো মানুষটাকে অন্যরকম লাগত, ঘরের বাতাস যেন কার দীর্ঘশ্বাসে ভারী হয়ে উঠত।

রবিমামাও খুব বিষণ্ণ আর একলাটি ছিলেন কিন্তু বোঝা যেত না। দুষ্টু ছেলেরা আড়াল থেকে সুর করে ছড়া কাটত—'রবি মামা দেয় হামা/মাথায় বালতি গায়ে জামা।'

রবিমামা মাথায় রুশ-উজবেকিস্তানের লোকেদের মতো চোঙাকৃতির মোটা ভেড়ার লোমের টুপি পরতেন!

আসলে রবিমামা কিন্তু খুব বিষণ্ণ আর একলাটি ছিলেন। একদিন সন্ধ্যেবেলার পর আকাশে বোধহয় শুক্ল চতুর্দশীর চাঁদ। ফুটফুটে জোছনায় ভাসছে চরাচর। রবিমামা আর মহাদেবদা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বাইরের বারান্দায়। হাসপাতালের সামনের হাতায় যেদিকে দুটো পেল্লায় ঝাউ আর দেবদারু গাছগুলো ঝুপ্পুস অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে তাকিয়ে মামা আনমনা গলায় বলেন, জানস মহাদেব ওই গাছে দুইখান জ্যোতিষ পাখি আছে। ওরা আসলে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী। ওরা কথা বলে, ভূত-ভবিষ্যতের কথা, আমি শুনতে পাই।

সেই রাতে, যা সহস্রাব্দে একবারই আসে, আমি দেখেছিলাম দুটি বিষণ্ণ মানুষ চেয়ে আছে আকাশ পানে যেন চাঁদের শাম্পান আসবে বলে কত জন্ম প্রতীক্ষায় আছে।

তারপর কতবার আমি সেই গাছতলায় গেছি যদি ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর দেখা পাই। যদি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আগাম

জানতে পাই! দেখা মেলেনি একটিবারও। বুঝেছি তারা শুধু রবিমামা আর মহাদেবদার মতো বিষণ্ণ মানুষদেরই দেখা দেয়।

সুপার হিট গায়ন-অ্যাকশন পুঁথি (এই সাঁওতালি শব্দ গুচ্ছের অর্থ—গানে অ্যাকশনে সমৃদ্ধ যাত্রাপালা)!

আমাদের ক্লাসের জয়দীপ তখন সুপারস্টার। বিদ্যাপীঠ প্রোডাকশনসের একটার পর একটা নাটকের সুদর্শন নায়ক—'ভক্ত প্রহ্লাদে' মুখ্যভূমিকায়। কার্লো কলোদির ইতালিয়ান নাটক 'পিনোচ্চিও'-এর ইংরেজী নাট্যরূপেও পিনোচ্চিওর ভূমিকায়। বিদ্যাপীঠে বছরে তখন তিনটে নাটক হত—জন্মাষ্টমীতে জুনিয়র ক্লাসের (চতুর্থ থেকে সপ্তম শ্রেণী) ছেলেরা নাটক করত। স্বাধীনতা দিবসে সিনিয়র ছেলেরা (অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী) মূলত নাইনের ছেলেরাই এই নাটকটা করত আর শিক্ষক দিবসে শিক্ষকরা অভিনয় করতেন। শিক্ষকদের মধ্যে অসাধারণ সব অভিনেতা ছিলেন—দুর্গাদা, সুশীলদা, দিলীপদা, বিমলদা!

সেবার বড় ছেলেদের মানে আমাদের জন্য নাটক ঠিক হল—মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত 'টিপু সুলতান'। গেমস টিচার সুশীল ঘোষদা পরিচালনার দায়িত্বে। একসপ্তাহ হল অভিনেতা বাছাই থেকে কাস্টিং পর্যন্ত শেষ। টিপু সুলতান—জয়দীপ, শঙ্খ—হায়দার আলি, অভিজিত মণ্ডল—তাঁতিয়া টোপি। এছাড়া বাসব, সৌমেন এরাও আছে। দুদিন পর মহড়া শুরু হবে। হঠাৎ আমার নাটক করার শখ জাগল। সোজা সুশীলদার কাছে গিয়ে কাঁচুমাচু মুখে বললাম, স্যার নাটক করব।

সুশীলদা রাশভারি গলায় বললেন, কিন্তু কাস্টিং তো কমপ্লিট।

আমি মাথা নিচু করে টিচার্স কমনরুম থেকে বেরিয়ে আসছি হঠাৎ সুশীলদা পিছন থেকে ডাকলেন, তুমি আবৃত্তি করো না!

একটা শোনাও দেখি।

আমি ক্লাস নাইনে আবৃত্তিতে সেকেন্ড হয়েছি। সে বছরের প্রতিযোগিতার কবিতাটা—স্বামী বিবেকানন্দের 'ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়'—শুনিয়ে দিলাম।

শুনেটুনে সুশীলদা বললেন, একটা রোল আছে তোমার জন্য—এক ভিক্ষুক মুসলমান বালক, রুস্তম, যে শ্রীরঙ্গপট্টনমের রাস্তায় তার অন্ধ ফকির বাপের সঙ্গে ভিক্ষা করে বেড়ায়। আসলে এটাই নাটকের বিবেকের রোল। আমি অন্ধ ফকিরের পার্টটা নিজে করব।

আমি একটু ঘাবড়েই গেলাম। গেমস টিচার সুশীলদা বেশ রাগী আর গম্ভীর মানুষ তার সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে ভুলচুক হলে মামলা সত্যিই না গম্ভীর হয়ে যায়!

উনি বললেন, রোলটা আসলে মুসলমান কন্যা সোফিয়ার সেটাকেই বদলে চরিত্রটা রুস্তম করা হয়েছে।

বুঝলাম ফিমেল চরিত্র বদলে মেল করা হয়েছে কারণ চরিত্রটা গুরুত্বপূর্ণ বলে। নাটকের মহড়া শুরু হয়ে গেল। বিকেলে খেলার সময় আর ছুটির দিন দুপুরগুলোয় রিহার্সাল হত। নাটকের সপ্তাহখানেক আগে থেকে সন্ধ্যেবেলা স্টাডির সময়ও রিহার্সাল হত। বন্ধু মনীষী ছিল আমাদের প্রম্পটার।

পনেরোই আগস্ট নাটকটা দারুণ উৎরে গিয়েছিল। টিপু সুলতানের চরিত্রে জয়দীপ ফাটাফাটি অভিনয় করেছিল। না, নাটকে পার্ট বিস্মরণজনিত তেমন কোনো হাস্যকর ঘটনা ঘটেনি কেবল একবার মঁসিয়ে লালির

বাবরিওলা চুল আর হায়দার আলির দাড়ি আলগা হয়ে খুলে এসেছিল। আমার মোট তিনটে সিন ছিল। একটা সিনে অন্ধ ফকিরবেশী সুশীলদা নিজের দেওয়া শিবরঞ্জনী রাগে নাটকের গান গেয়েছিলেন—''রবি ডুবে যায়/জাগিল না হায়/তবুও হিন্দুস্তান'' ক্লাস নাইনেই আমার লেখালেখির রোগটা ধরল। ক্লাসে বাংলার টিচার ফণীদা স্কুল ম্যাগাজিনের জন্য আমাদের কাছে লেখা আহ্বান করার পরই আমার মাথায় ভূত চাপল— লেখা দিতে হবে। কিন্তু কি লিখি! এর আগে ক্লাস এইটে আমি একটা কবিতা লিখে জমা দিয়েছিলাম যেটাকে অনেক মেরামত করে দিলীপদা ম্যাগাজিনে ছেপেছিলেন। কিন্তু নাইনে উঠে বুদ্ধি আরেকটু পরিপক্ক হয়েছে। তাই মনে হয়েছিল কি লিখি! এবার আমার স্বরচিত কবিতা বা গল্প যাই লিখি তাতে নুন-তেল-ঝাল কেউ যেন কম-বেশির দোষে দুষ্ট না বলে।

আমার বন্ধু চিরঞ্জীব একবার রেলপথে মুম্বই (তখন বম্বে বলতাম) যাত্রাকালে মহারাষ্ট্রের ইগতপুরী স্টেশনে অনেকক্ষণ আটকে পড়েছিল। ও গল্প করেছিল যে ট্রেন থেকে নেমে লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছিল একটা রেলব্রীজের ওপর, তলায় কলকলিয়ে বয়ে যাচ্ছিল একটা ছোট নদী। আমি টের পেয়েছিলাম চিরঞ্জীব গল্পটা বলার সময় যেন কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল।

ঠিক করলাম চিরঞ্জীবের মুখ থেকে শোনা ভ্রমণ কাহিনীটাই লিখব—প্রথম পুরুষে। এদিকে ইংরেজীর ক্লাসে শক্তিদার মুখ থেকে শুনেছিলাম—ইয়ারো আনভিজিটেড, ইয়ারো ভিজিটেড আর ইয়ারো রিভিজিটেড—ওয়র্ডসওয়ার্থ নিজের লেখা এই তিনটের মধ্যে প্রথমটাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করতেন! আমিও ইগতপুরী না দেখেই লিখে ফেলেছিলাম—'ইগতপুরী'!

আলো ভরা দিনে ছায়া নেমে আসে

ক্লাস টেনে উঠে পড়ার চাপ বেড়ে গেল। বোর্ড পরীক্ষার পরই যে ইঁদুর দৌড়ে সামিল হতে হবে। আমাদের সকলেরই কাঁধের পাশের ডানাগুলো খসে উড়ুক্কু মেজাজটা চলে গেল। তবে পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে অন্য পড়াশুনোও চলত। এই সময় একদিন বন্ধু সিদ্ধার্থর কাছে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন আর যোসেফ স্ট্যালিনের নাম শুনলাম। কলকাতা বইমেলা থেকে আমার বাবা সোভিয়েত রাশিয়ার কিছু বই কিনে দিলেন—ম্যাক্সিম গোর্কীর 'মা', আর্কাদি গাইদারের 'ইশকুল' তার আগেই পড়া ছিল—এবার তার সঙ্গে যোগ হল নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির 'ইস্পাত', স্ট্যালিনের ওপর অ্যালেক্সেই রিবিনের একটা বই আর চে গেভারার 'মোটর সাইকেল ডায়েরি'। এইসব বই পড়তে পড়তে যখন প্রি-টেস্ট পরীক্ষা এগিয়ে এল তখন টের পেলাম বাংলা, ইংরেজী, জীবনবিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞানে ঠিকঠাক থাকলেও অঙ্কের ভিত তখনও ব্যাপক নড়বড়ে হয়ে আছে। এইসময় আমার জীবনে মসীহার মতো এসে হাজির হলেন অঙ্কের হরিশংকরদা। জ্যামিতির উপপাদ্য যখন আমার অখাদ্য লাগত তখন আমার হজম-অযোগ্য সেই গণিতের পাচন তিনি যে কি অপূর্ব দক্ষতায় আমাকে হজম করিয়ে ছেড়ে ছিলেন তা একমাত্র আমিই জানি! মায়েরা যেমন বেয়াদব বাচ্চাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে খাইয়ে দেয়—অনেকটা সেই রকম! মাধ্যমিকে আমার মতো ম্যাথস-ফোবিকের অঙ্কে লেটার পাওয়ার পিছনে সরস্বতী নয় একমাত্র অবদান ছিল হরিদার!

বছরের অন্য সমস্ত ক্রিয়াকর্মের নির্ঘন্ট পেরিয়ে হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম টেস্ট পরীক্ষা এগিয়ে এসেছে। টের পেলাম আমাদের বিদ্যাপীঠের পাঠ চুকোনোর সময় হয়ে এসেছে। এর আগে বহুবার বিদ্যাপীঠের

আশ্রমিক জীবনের শৃঙ্খলার চাপে মন পালাই পালাই করেছে। আমাদের ক্লাসের ব্রতীন একবার জুনিয়র ক্লাসে পালানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিল। ক্লাস টেন-এ পৌঁছে কিন্তু শেষের সেই দিনটা যখন এসে গেল তখন সবাই কেমন নিঝুম হয়ে বসে থাকল। অনেকেই শিক্ষকদের ছোট উপহার, গ্রিটিংস কার্ড দিল। বোর্ডে বড় করে ছবি আঁকা হল, আবৃত্তি হল, গান হল। হল টুকরো টুকরো স্মৃতিচারণ। বাংলার শিক্ষক শান্তিদা ক্লাসে ঢুকে নিঃশব্দে একটা রঙীন চক দিয়ে ঘষঘষ করে কি যেন লিখে গেলেন! লেখা শেষে উনি চেয়ারে বসতেই দেখি ব্ল্যাকবোর্ডে ফুটে আছে এক অনবদ্য কবিতা—

"আলো ভরা দিনে
ছায়া নেমে আসে
বাজে বিদায়ের সুর
স্মৃতিটুকু থাক
চির অমলিন
প্রীতি রসে ভরপুর"

বোর্ডের দিকে তাকিয়ে সেদিন চোখটা ঝাপসা হয়ে এসেছিল। মা শিখিয়েছিল ছেলেদের কাঁদতে নেই তাই পাশের বন্ধুটার দিকে তাকাইনি। কে জানে হয়ত সেও একই কথা ভাবছিল!

বরফের মাছের জলে সাঁতার

মাঝবয়সে পৌঁছে কেন জানি নিজেকে আজকাল বরফের মাছ মনে হত। ভিতরের উত্তাপটুকুও টের পেতাম না। তবে মাঝেমাঝেই জলে সাঁতরানোর দিনগুলো মনে পড়ে যেত। জলের বাইরে বরফের বিছানায় শুয়ে হয়ত ইলিশের দাম বেড়ে যায় কিন্তু রুপোলি পাখনায় স্রোত আর ঢেউয়ের ওঠাপড়ার দিনগুলো কি সে ভুলে যেতে পারে! ভাবে এই মাঝদরিয়ায় আবার এক পশলা বৃষ্টির পর এক রোদেলা দিনে যদি আকাশে উঠত রামধনু, ঢেউয়ে ঢেউয়ে জাগত উন্মাদনা, তাহলে ফের সে রুপোলি পাখনায় মাখত বেনীআসহকলা!

বরফের মাছেদের জলে সাঁতরানোর ইচ্ছেটা তো আর মিথ্যা নয়! তাই বন্ধু দেবাশিস (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ল' অফিসার) একটা নদী আঁকল বরফের মাছেদের সাঁতার কাটার জন্য—একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ গড়ল দেবাশিস। এখন দেশবিদেশের বরফের মাছেরা সেখানে নেমে সাঁতার কাটছে একসাথে। সারাদিন নিজেরা কথা বলছে আর প্রতিদিন একটু একটু করে বুনে চলেছে একটা নকশি-কাঁথা। যেটা গায়ে দিলে মন-খারাপ সেরে যায় আর নিজেদের একটুও বরফের মাছ মনে হয় না।

লেখক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় দপ্তরের আধিকারিক।

একটুকরো স্মৃতির খোঁজে

অভিজিৎ ভট্টাচার্য-২

মাধ্যমিক, ১৯৮৫

প্রায় ৩১ বছর হয়ে গেল, তবু আজও যেন মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। Teachers' Day ছিল, নাটকটার নামটা মনে নেই তবে আমাদের ফণীদার চরিত্রটার কথা পরিস্কার মনে আছে। আমরা যারা ফণীদাকে চিনি তাদের কাছে ফণীদার পরিচয় নতুন করে দেওয়ার কিছু নেই, কিন্তু যারা জানে না তাদের জানিয়ে রাখি যে ফণীদার একটু দাঁত চেপে কথা বলার অভ্যাস ছিল। নাটকে ফণীদা এক দুষ্টু ছেলের চরিত্রে সাদা হাফপ্যান্ট পরে অভিনয় করেছিলেন যে কোন দুষ্টুমী করে ধরা পড়লেই বেমালুম অস্বীকার করে যাচ্ছিল এই বলে যে ''আমি? কই না তো''। ফণীদার ডায়ালগ থ্রো এবং স্বভাবসিদ্ধ দাঁত চেপে ''আমি? কই না তো'' বলার সঙ্গে-সঙ্গে সারা হল তুমুল হাসিতে ফেটে পড়ছিল। এর মধ্যে দিয়েই কখন যেন শেষ হয়ে গেল নাটক।

পরদিন বাংলা ক্লাস, আমাদের হাতে বামনদেব চক্রবর্তীর নতুন ব্যাকরণ বই। আমাদের মধ্যে খুব আলোচনা চলছে বামনদেবের কৃতজ্ঞতা স্বীকার নিয়ে। বামনদেববাবু কয়েক দিন আগেই ঘুরে গিয়েছেন বিদ্যাপীঠ, উনি ফণীদার সম্বন্ধে লিখেছেন যে ''বিগত সংস্করণে ফণীবাবুর নাম ভুলবশত বাদ পড়িয়া গিয়াছিল, ইহাকে নিছক মুদ্রণ-প্রমাদ বলিয়া নিজেকে সান্তনা দিব না, কিন্তু ফণীবাবু এই ঘটনাটিকে আশ্চর্য ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। শিবতুল্য লোক এমনই হন।'' এর মধ্যে ফণীদা ক্লাসে এসে বাংলা পড়ানো শুরু করে দিয়েছেন। হঠাৎ সোমনাথ কী যেন একটা দুষ্টুমি করেছে, আর ফণীদা ''কী হচ্ছেটা কী'' বলার সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথ বলে উঠল ''আমি? কই না তো!'' আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠেছি, আর ফণীদা রেগেমেগে ডাস্টার নিয়ে তাকে মারতে উদ্ধত। তাই দেখে সোমনাথ বলে বসলো ''ফণীদা মারবেন না মারবেন না, আপনি শিবতুল্য মানুষ!'' ফণীদা আর মারবেন কী, হেসেই খুন...আমরাও হেসে চলেছি এতদিন পরেও...

বিদ্যাপীঠ আমাদের জীবনের সঙ্গে ছোটোবেলা থেকেই কেমন যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। এত ঘটনা, এত স্মৃতি রয়েছে যে লিখতে গেলে বোধ হয় কয়েকটা ম্যাগাজিন শেষ হয়ে যাবে। তিরিশ বছর হয়ে গেল, আজও আমরা বন্ধুরা এক সঙ্গে হলে পুরনো স্মৃতিটা আঁকড়ে ধরে নিজেদের অজান্তেই কেমন যেন ছেলেবেলাটা খুঁজে বেড়াই। এমনই একটা ছোট্ট ঘটনা মনে পড়ে গেল আজ, আমার গোলকীপার হয়ে ওঠার গল্প। আমরা তখন ক্লাস ফাইভে, আমাদের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ ক্লাস সিক্স-এ সেকশনের। ওদের টীমে সব বাঘাবাঘা লম্বাচওড়া প্লেয়ার, আমরা তুলনায় ছোটখাটো। ওরা জানে যে ওরা খুব সহজেই জিতে যাবে। কিন্তু আমরা একটু অন্য রকম ভেবেছিলাম বোধহয়। আমাদের টীমের নামকরা প্লেয়াররা হল হিল্লোল (হিল্লোল দাশগুপ্ত), দেবাশিস-২ (দেবাশিস ঘোষ-২), গুহা (দেবব্রত গুহ), ত্রিপাঠি (সঞ্জয় ত্রিপাঠি), সিধু (সিদ্ধার্থ ভৌমিক)। এরা ক্লাস ফোর থেকে ভালো খেলে নিজেদের জায়গা তৈরী করেছে, সবাই কিছুটা সমীহ করে চলে এদের। কিন্তু একটু মুস্কিলে ওরা কারণ আমাদের টীমের এক-নম্বর গোলকীপার পিযুষের শরীর খারাপ। আমি আর শিবাজি লম্বা (তখন কিন্তু আমি তুলনায় লম্বাই ছিলাম, পরে অবশ্য আর বাড়ি নি) হওয়ার জন্যই হয়তো টীমে

চান্স পেয়ে গেলাম। পিযুষের অনুপস্থিতিতে তিনকাঠি সামলানোর দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। খেলা জমে উঠেছে, চাপটা আমাদের দিকেই একটু বেশি। হঠাৎ দেখি ওদের টীমের গোতি (গৌতম নন্দী) একটা ফাঁকা বল পেয়ে গিয়েছে পেনাল্টি box-এর মাথায়, সামনে শুধু আমি। আমি দেখলাম কিচ্ছু করার নেই, মরিয়া হয়ে ঝাঁপ মারলাম গৌতমদার পায়ে। নিজেই অবাক হয়ে দেখলাম বল আমার হাতে আর গৌতমদা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। এক লহমায় হয়ে উঠলাম টীমের প্রিয়...ম্যাচ ড্র...জন্ম নিল এক গোলকীপার...

আরো কত যে ঘটনা আছে...আদ্রা-চক্রুধরপুর ট্রেনে Calcutta batch-এ হইহই করে সারারাত জেগে আসা...কলে জল-না-থাকলে বালতি নিয়ে কুয়ো থেকে জল নিয়ে চান করা...দোলের সময়ে শুধু আবির নিয়ে রং-খেলা...নাটকের সময়ে সর্দারজির বন্দুক থেকে গুলি না বেরোলে মুখে দুম করে আওয়াজ করা...dining hall-এর পিছনের বাগানে বল খুঁজতে গিয়ে পেয়ারা গাছ আবিষ্কার করার পর বারেবারে সেখানেই বল পাঠানোর চেষ্টা করা...দুটো বেড জড়ো করে মশারি টাঙ্গানোর স্ট্যান্ড আড়াআড়ি রেখে টেবিল-টেনিস খেলা...আজ বড্ড মনে পড়ছে...মনে হচ্ছে বেশ হতো যদি টাইম মেশিনে চড়ে চলে যেতে পারতাম বিদ্যাপীঠের দিনগুলোয়... বড় হয়ে বুঝলাম ছোটোবেলাটাই ছিল সবার সেরা!!

লেখক লন্ডন নিবাসী Head of Finance, Torrent Pharma (UK) Ltd.

বিদ্যাপীঠের স্মৃতি

তীর্থংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

পঞ্চম শ্রেণি, ১৯৮০

স্মৃতি বড় অভিমানী। মানস পটে যখন সারি সারি স্মৃতির প্রদর্শনী। তখন বিশেষ কোনো একটার দিকে ঝুঁকলেই অন্যদের মুখ ভার। সম্পাদকের আর্জি বিদ্যাপীঠের স্মৃতি রোমন্থন। মাত্র এক বছরের আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ। স্মৃতির ভার খুব বেশি হওয়ার নয়। কিন্তু লিখতে বসে মনে হয়, যেন স্মৃতির সাগরে ডুব সাঁতারে নেমেছি। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা ধরি!

সত্তরের দশকের শেষ বছরে যখন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, গোলপার্ক-এ বিদ্যাপীঠে ভর্তির পরীক্ষা দিতে গেলাম তখনো বাংলার মানচিত্রে পুরুলিয়া জেলাটা ঠিক কোথায় তাই ভালো করে জানা নেই। তারপরে একটার পর একটা ধাপ পেরিয়ে শেষে, আশির দশকের প্রথম জানুয়ারির এক সকালে পৌঁছনো গেলো সেখানে। হাওড়া-আদ্রা-চক্রধরপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জার তার আগে একবারই চড়া হয়েছে, লেখার পরে ভর্তির মৌখিক পরীক্ষা দিতে যেতে হয়েছিল বিদ্যাপীঠে। তখন ছিলাম ঘোরের মধ্যে। তাই সে'যাত্রার কথা বিশেষ মনে নেই। শুধু মনে আছে, যখন বাবার সাথে রিকশায় চেপে পুরুলিয়া স্টেশন থেকে বিবেকানন্দনগরে বিদ্যাপীঠে পৌঁছলাম তখনো ভোরের আলো ফোটেনি।

বাড়ির বাইরে প্রিয়জনদের থেকে দূরে। সেবারই আমার প্রথম একক জীবন। বাড়ি ছাড়ার আগে ঠাকুমার গলা জড়িয়ে কেঁদেছিলাম খুব। শিবানন্দ সদনের সুবোধানন্দ ধামে একটা দরজার পাশে আমার বিছানা, ছোটো দেওয়াল আলমারি। দরজার অন্য পাশে কৌস্তুভ মুখার্জী। আর বা'পাসে ত্রিদিব দাসের বিছানা-আলমারি। আমার ঠিক উল্টোদিকে তুষার হাজরা-দেবদীপ হাজরা। আমাদের ওয়ার্ডেন তাপস দা।

মন খারাপের প্রথম রাতটা ভালো করে ঘুমোতে পারিনি। সকালে উঠে মশারি গুটিয়ে ট্রাঙ্কে রাখতে যাচ্ছি। যেনো সেদিন-ই আবার বাড়ি ফেরার কথা। ঠিক সেই সময় আমার পাশে তাপসদা। কাঁধে হাত রেখে বললেন, ''মশারিটা বালিশের নীচে রেখে দাও। ওটা আজ আবার লাগবে।'' আমার কাঁচুমাচু মুখ দেখে কিছু বুঝেছিলেন কিনা জানিনা কিন্তু পিঠে হাল্কা চাপ দিয়ে বললেন, ''বাড়ির জন্য মন খারাপ করছে? এখন থেকে এটাই তোমার বাড়ি। তুমি এখানেই থাকবে।'' এমন কত শত স্মৃতি জড়িয়ে আছে বিদ্যাপীঠকে ঘিরে। আর প্রতিটা স্মৃতি-পটের সাথে লেপ্টে আছে বিদ্যাপীঠের দাদা-মহারাজদের স্নেহাশীষ-স্পর্শ।

অঙ্কের শিক্ষক ভি সি রেড্ডি-আমাদের রেড্ডিদা। ক্লাসে এলেন দক্ষিণী স্টাইলে লুঙ্গি'র মতো ধুতি আর শার্ট পরে। আমার এক দশকের জীবনে সেই প্রথম চর্মচক্ষে কোনো দক্ষিণ-ভারতীয়কে দেখলাম। অঙ্ক ভুল হলে বলতেন, ''তুই একটা গরু।'' কিন্তু স্নেহের পরশে কোনো খাদ ছিলো না।

অসিতদা ইতিহাস পড়াতেন নাটক করার মতো করে। পরে ওঁর আর দিলীপ চ্যাটার্জি-র অভিনয়শৈলীর পরিচয়ও পেয়েছি বিদ্যাপীঠেরই সভাগৃহে। এই সভাগৃহ আমার পরম গর্বের এক জায়গা। এখানেই 'লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে' শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম বিবেচিত হয়েছিলাম। আর এখানেই ঐ প্রতিযোগিতায় দেওয়া আমার বক্তব্য আবার বিবৃত করতে হয়েছিল তৎকালীন রাজ্যপাল ভৈরব দত্ত পান্ডে-র সামনে। দশ বছরের একটি ছেলের কাছে নিঃসন্দেহে তা এক বিরাট প্রাপ্তি। আর তা সম্ভব হয়েছিল বিদ্যাপীঠের

সুবাদে। প্রতিযোগিতার আগে আমার বক্তৃতাটি ঘষে মেজে তৈরী করতে সাহায্য করেছিলেন স্বপনদা আর শক্তিদা। ওঁদের ঋণ ভুলি কেমন করে!

রোমন্থন করতে বসে এমন অনেক অমৃত-স্মৃতিই মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে আধবেলা ছুটির দিন বুধবার স্কুল শেষে দৌড়ে বিপনিতে যাওয়ার আগে লাস্ট পিরিয়ডে চণ্ডীদার 'ইউ-এন' ক্লাস। জাতিসঙ্ঘ নিয়ে সেই যে উৎসাহের সূচনা তা আজও অব্যাহত। আর সেই উৎসাহের সুবাদেই হয়ত সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া এবং তার পরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে এত কৌতূহল।

বিদ্যাপীঠে পুজোর ছুটি থাকত স্বল্প সময়ের জন্য। লক্ষ্মীপুজোর পরেই আমাদের স্কুলে ফিরতে হত। স্কুল শুরুর প্রথম দিনে তাই থাকত মাস্টারমশাইদের বিজয়ার প্রণাম করার পালা। বাংলার শিক্ষক দুর্গাপদ ভট্টাচার্য যেভাবে চটি খুলে দু'পা বাড়িয়ে দিয়ে পরম মমতায় মাথায় হাত রেখেছিলেন তাতে বার্ষিক পরীক্ষার আগে সব ফাঁকিবাজি আর দুষ্টুমির দোষ থেকে মুক্তির আশ্বাস পেয়েছিলাম।

পুরুলিয়াতে তখন খবরের কাগজ পৌঁছত একদিন বাদে, তাই স্কুল শুরুর আগে প্রার্থনার সময় উঁচু ক্লাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো পড়ে শোনাত। সেটাই তখন বাইরের জগতের সাথে আমাদের জানালা, আর তাতেই শুনেছিলাম সঞ্জয় গান্ধী, উত্তম কুমার আর দেবব্রত বিশ্বাসের মৃত্যুর খবর।

অসিতদা ইতিহাস পড়াতেন নাটক করার মতো করে। পরে ওঁর আর দিলীপ চ্যাটার্জি-র অভিনয়শৈলীর পরিচয়ও পেয়েছি বিদ্যাপীঠেরই সভাগৃহে। এই সভাগৃহ আমার পরম গর্বের এক জায়গা। এখানেই 'লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে' শীর্ষক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রথম বিবেচিত হয়েছিলাম। আর এখানেই ঐ প্রতিযোগিতায় দেওয়া আমার বক্তব্য আবার বিবৃত করতে হয়েছিল তৎকালীন রাজ্যপাল ভৈরব দত্ত পান্ডে-র সামনে। দশ বছরের একটি ছেলের কাছে নিঃসন্দেহে তা এক বিরাট প্রাপ্তি। আর তা সম্ভব হয়েছিল বিদ্যাপীঠের সুবাদে। প্রতিযোগিতার আগে আমার বক্তৃতাটি ঘষে মেজে তৈরী করতে সাহায্য করেছিলেন স্বপনদা আর শক্তিদা। ওঁদের ঋণ ভুলি কেমন করে!

রোমন্থন করতে বসে এমন অনেক অমৃত-স্মৃতিই মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে আধবেলা ছুটির দিন বুধবার স্কুল শেষে দৌড়ে বিপনিতে যাওয়ার আগে লাস্ট পিরিয়ডে চণ্ডীদার 'ইউ-এন' ক্লাস। জাতিসঙ্ঘ নিয়ে সেই যে উৎসাহের সূচনা তা আজও অব্যাহত। আর সেই উৎসাহের সুবাদেই হয়ত সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়া এবং তার পরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে এত কৌতূহল।

বিদ্যাপীঠে পুজোর ছুটি থাকত স্বল্প সময়ের জন্য। লক্ষ্মীপুজোর পরেই আমাদের স্কুলে ফিরতে হত। স্কুল শুরুর প্রথম দিনে তাই থাকত মাস্টারমশাইদের বিজয়ার প্রণাম করার পালা। বাংলার শিক্ষক দুর্গাপদ ভট্টাচার্য যেভাবে চটি খুলে দু'পা বাড়িয়ে দিয়ে পরম মমতায় মাথায় হাত রেখেছিলেন তাতে বার্ষিক পরীক্ষার আগে সব ফাঁকিবাজি আর দুষ্টুমির দোষ থেকে মুক্তির আশ্বাস পেয়েছিলাম।

পুরুলিয়াতে তখন খবরের কাগজ পৌঁছত একদিন বাদে, তাই স্কুল শুরুর আগে প্রার্থনার সময় উঁচু ক্লাসের একজন গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো পড়ে শোনাত। সেটাই তখন বাইরের জগতের সাথে আমাদের জানালা, আর তাতেই শুনেছিলাম সঞ্জয় গান্ধী, উত্তম কুমার আর দেবব্রত বিশ্বাসের মৃত্যুর খবর।

বড়দের স্কুলবাড়ি সারদা মন্দিরে যেখানে প্রার্থনা হত সেখানে ভারতবর্ষের একটা ব্রোঞ্জ-মানচিত্র আছে। তার সামনে যখন তৎকালীন প্রধান শিক্ষক স্বামী অমরানন্দ এসে দাঁড়াতেন তখন ওঁকে ভারতাত্মা ছাড়া আর

কিছু ভাবা সম্ভব ছিলো না। সঞ্জীবন মহারাজ আবার সোমবার করে 'আই-সি' ক্লাসে চাণক্য শ্লোক, মহাভারতের গল্প ইত্যাদি পড়াতেন। বেশ কয়েক বছর আগে জেনিভায় দেখা হওয়ার সময়ও আমাদের আলোচনার অনেকখানি জুড়ে ছিলো বিদ্যাপীঠেরই কথা।

সুনীল পাল আর রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প-পরিকল্পনায় তৈরী বিদ্যাপীঠকে দৃষ্টিনন্দন বললে কম বলা হয়। মেন গেটের কাছে শ্বেতপাথরের বটবৃক্ষের অবয়ব বা স্কুলের গায়ে সরস্বতীর অপূর্ব মূর্তি বিদ্যাপীঠে পড়তে যাওয়ার বাড়তি পাওনা। এখন অনুভব করি এগুলো রাখার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র শিল্পকলার প্রদর্শন নয় বরং আমাদের চিন্তা-চেতনাকে পরিশীলিত করা।

অথচ এমন শৈল্পিক পরিমণ্ডলও আমার অঙ্কনগুণে এতটুকু পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি, যেমন পারেনি আমার গলার স্বরে এতটুকু সুর ছড়িয়ে দিতে। তাই পাঁচুদা আর সমরদার সামনে বেশ ভয়ে ভয়েই থাকতাম—যদি ছবি আঁকার বা গান গাওয়ার ডাক পড়ে।

এই লেখা লিখতে বসে আমার অনেক সহপাঠীরই নাম-চেহারা-মুখমণ্ডল মনে পড়ছে। তখনো ভারতে জাতপাতের রাজনীতি বা 'আইডেন্টিটি পলিটিক্স' এমন পল্লবিত হয়ে ওঠেনি কিন্তু হিসেব করে দেখলাম সেই সময়েই আমাদের সেকশনে পাঁচ-পাঁচজন বাঙুজ্যে বিরাজমান। দেবব্রত (পানি), চিত্রভাণু, অভিজিৎ, বিশু এবং আমি। আমাদের দরকার ছিলো শুধু একজন মায়াবতী!

মায়াবতী না থাকলেও কালীপদ মহারাজ, ভাণ্ডারি মহারাজ, সুভাষ মহারাজ এবং অন্য আরো অনেকেই যে পরম মমতায় আমাদের বড় হতে সাহায্য করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বহুবার ছুটিতে অনেক পরিকল্পনা করেও কলকাতার বলরাম মন্দিরে গিয়ে কালীপদ মহারাজের সাথে আর দেখা করা হয়ে ওঠেনি। সারা বছর ধরে ওঁর দেওয়া হোমিওপ্যাথি ওষুধ বোধহয় 'বহুজন হিতায়'—রামকৃষ্ণ মিশনের এই আদর্শেরই পরিচয় বহন করে।

বিদ্যাপীঠের আরেকটি আকর্ষণ ছিলো বুধবার আর রবিবারে আলু পোস্ত আর সুজির পায়েশ। শিবানন্দ সদনের বরুণদা কিভাবে যে কোমড়টাকে আধভাঙ্গা করে হান্ড্রেড মিটার স্প্রিন্টের গতিতে অবলীলায় সুজির পায়েশ পরিবেশন করতেন তা নিয়ে আজও আমার কৌতূহল দূর হয়নি।

আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক মাত্র এক বছরের হলেও সাড়ে তিন দশক পরেও নিজেকে বিদ্যাপীঠেরই একজন বলে মনে হয়। অনেক সম্পর্ক খিচুড়ি-পায়েশের মতো। যত বাসি হয় ততই যেন তার স্বাদ বাড়ে।

লেখক মাত্র এক বছর, ১৯৮০ সালে বিদ্যাপিঠের ছাত্র ছিলেন। পরবর্তিতে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণমিশন বিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা করেন। বর্তমানে লন্ডন নিবাসী freelance সাংবাদিক।

হারানিধি অথবা পারশনাথের বিরল তীর্থঙ্কর

প্রসেনজিৎ সিংহ

মাধ্যমিক, ১৯৮৭

শীত সেবার যাই যাই করেও যায়নি। লাঠি ঠকঠকানো বৃদ্ধের মতো কী যেন ভেবে একটু থমকে দাঁড়িয়েছিল। চারপাশটা যেন জারিত সেই শীতের রিক্ত হাহাকারে। আর সেই নাছোড় শীতের হালকা কাঁপুনি ছিল অদ্ভুতানন্দ ধামের ছেলেটার মনেও। নিজের বাড়ির চেনা চৌহদ্দি, পরিবার পরিজনের বাঁধন ছিড়ে মাস দুয়েক হল সে হস্টেলে এসেছে।

সবকিছুর মধ্যে তখনও নতুনের গন্ধ। বিদ্যার্থী হোমের পবিত্র টীকা তখনও কপালে শুকোয়নি।

অপরিচিত পরিবেশ আর আদবকায়দার মধ্যে পড়ে তার আড়-না-ভাঙা মন সদাশঙ্কিত। এই বুঝি কিছু ভুল হল। এই বুঝি ওয়ার্ডেন শ্যাম মহারাজ ডেকে পাঠালেন।

ক্লাস সিক্সে ওর মতো নতুন ছেলে জনা দশ-পনেরো। আর ওদের সেকশনে সংখ্যাটা জনা ছয়েক। বাকি সকলে ক্লাস ফোর কিংবা ফাইভে ভর্তি হয়েছে। 'ওল্ড বয়েজ'। মহারাজদের কঠোর শাসনে নতুনদের ওপর পুরনোদের তেমন আধিপত্য বিস্তারের পরিসর কখনওই তৈরি হয়নি। তবে দু'একজন 'পাণ্ডা' গোছের সহপাঠী মাঝে মধ্যে কোনও কাজ আদায় করতে চোখ রাঙিয়ে বলতে ছাড়ে না, 'মনে রাখবি তোরা নিউ বয়েজ'।

মাঝে মাঝে বাড়ির জন্য কষ্ট হয়। মা-বাবা-বোনের কথা মনে পড়ে। কান্না পায়। কিন্তু সে চোখের জল তো কাউকে দেখাবার নয়। রাতে মাথার বালিশ ভিজে যায়। নিজের নাম লেখা কালো ট্রাঙ্ক থেকে একটা ফ্যামিলি ফটো বের করে মাঝে মাঝে দেখা। বুকের মধ্যে জমে থাকা কষ্টটাকে ঢাকবার অক্ষম প্রয়াস।

ধামের জানলা দিয়ে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখা যায়। পাখিদের ওড়াউড়ি। খেলার মাঠ। তারই ধারে ধারে ছোটবড় গাছপালা। আরও দূরে বিদ্যাপীঠের সীমানাপ্রাচীর। সেই প্রাচীরের ওধারে রেললাইন। রোজ ভোরবেলা সেই লাইনে ঝিকঝিকিয়ে আসে ৩১৫ নম্বর আপ হাওড়া-আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জার। ওই ট্রেনেই একদিন সে পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল। ওই ট্রেনে চেপেই ১৯৮২ সালের ১৭ জানুয়ারি বাবার সঙ্গে ট্রাঙ্ক বেডিং নিয়ে হাজির হয়েছিল জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায়ের সূচনা করতে।

সেই ট্রেনলাইনটা বড্ড মায়া জড়ানো। বুধবার কিংবা রবিবার দুপুরের নিঝুম একাকীত্বে সেই রেলের রাস্তা দিয়ে ঝমঝমিয়ে চলে যেত টাটা-পাটনা প্যাসেঞ্জার। ট্রেন চলে যাওয়ার পরেও সেই যান্ত্রিক ঐক্যতান কানে লেগে থাকত অনেকক্ষণ। তার অনুরণন কোন মুক্তির ইশারায় মনকে আচ্ছন্ন করত, বুঝে উঠতে পারত না সেদিনের সেই ছোট্ট কিশোর।

রাতে ঘুমোবার আগে সাদা ডায়েরি নিয়ে বসতে হত। প্রতিদিন কে যেন লিখে দিত একঘেঁয়ে সেই প্রথম লাইনটা—আজ সকালে ড্রিল হয়েছে। তারপর? বিকেলে ভলি খেলেছি। আজ রাতে মাংস ছিল। ভাল পিস পাইনি। ক্লাস টেস্টে হাতের লেখার জন্য এক নম্বর কাটা গেছে। ইত্যাদি। তারই মধ্যে একদিন একটা নতুন লাইন। আজ বাবা-মা এসেছিল। একজন এসে খবর দিল, 'তোর গেস্ট এসেছে।' ডায়েরিতে বোকাবোকা একটা প্রশ্ন লিখে রাখে ছেলেটা। বাবা-মা কি গেস্ট?

টানা ডর্মেটরির একপ্রান্তে ছেলেটির জন্য বরাদ্দ একটা চৌকি। আর সেই চৌকির শেষপ্রান্তে দেওয়াল আলমারি। তারই মাথায় রাখা কাঠের 'টি'। মশারি টাঙানোর কাজে লাগে। আলমারির পাশেই মুক্তির স্বপ্ন দেখানো জানলা।

সেদিন জানলা দিয়ে দূরের আবছায়া টিলার দিকে তাকিয়ে ছিল ছেলেটা। টিলার ওপারে কী আছে কে জানে! ওর পিছনে এসে দাঁড়ায় এক সহপাঠী। জানিস আমরা এক্সকারশনে যাব। পরের বুধবার। পরেশনাথ। বিদ্যাপীঠে ভর্তি হওয়ার আগে সেভাবে এক্সকারশনে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়নি তার। বন্ধুর কথা শুনে প্রথমেই যেটা মনে হল ছেলেটার, যাক একদিন তাহলে এই ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে পড়া যাবে 'অন্য কোথাও অন্য কোনওখানে'। বিদ্যাপীঠের বাসে যাওয়া-আসার সময় চাকুমচুকুম খাওয়ার উপকরণ আগে থেকেই জোগাড়যন্ত্র করে রাখতে হবে। অন্য বন্ধুদের মতো সে-ও স্টোর থেকে বিস্কিট লজেন্সের পর্যাপ্ত 'স্টক' তুলে রাখে।

স্কুলের পোশাক পরে লাইন দিয়ে উঠে পড়া গেল বিদ্যাপীঠের হালকা গোলাপির বর্ডার দেওয়া সাদা বাসে। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত' লেখা বিদ্যাপীঠ তোরণ পিছনে ফেলে গাড়ি এগিয়ে চলে। বিদ্যাপীঠের সীমানা পার হতেই চেনা পৃথিবীটা বদলে যেতে থাকল একটু একটু করে। কারণ, বিদ্যাপীঠ যে বোঙাবাড়ির (পরে বিবেকানন্দ নগর) অন্তর্গত সেটা আসলে একটা ধূ-ধূ মালভূমির মধ্যে ছোট্ট গ্রাম ছিল। তার মাঝখানে বিদ্যাপীঠ শ্যামলিমার একটুকরো স্বপ্নের মতো। সেই মরুদ্যান পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতেই প্রকৃতির দীর্ণ-রিক্ত বৈরাগীর রূপটা স্পষ্ট হল। খাঁ-খাঁ প্রান্তরে নিস্ফলা মাঠ। তারই মধ্যে কোথাও গোটা দশেক মহুল গাছের জটলা। একটু স্নিগ্ধ ছায়ায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছে রাখাল বালক। কিংবা সেই লালমাটির বেবাক শূন্য উঁচুনিচু প্রান্তরে নিঃসঙ্গ পলাশ। কুচকুচে কালো দেহে গাঢ় কমলা রঙের থোকাথোকা ফুল নিয়ে যেন অনাদিকাল দাঁড়িয়ে রয়েছে কার অপেক্ষায়। চোখের সামনে সরে সরে যায় দৃশ্যপট। আনমনা হয়ে যায় কিশোর মন।

ভারী খোলামেলা বাসটা। ছিমছাম, নিরলঙ্কার। ছাত্রদের সঙ্গে চলেছেন দু'জন ওয়ার্ডেন, একজন মাস্টারমশাই। আর দু'টি ড্রাম। তাতে রয়েছে খিচুড়ি আর আলুরদম।

বাসের চালকের আসনে সুধন্যদা। কী সুন্দর নাম! তেমনই সুঠাম চেহারা। সেই চেহারা দিয়ে তিনি রাস্তায় অন্য গাড়িচালকদের কাছে যে বাড়তি সমীহ আদায় করে নিতেন সেটা হলফ করেই বলা যায়। অথচ স্বভাবে নরম মানুষটাকে দেখলেই বোঝা যেত না স্নেহশীল একটা মানুষ ভেতরে লুকিয়ে রয়েছে।

নীলপাহাড়ের অলিগলি পার হয়ে বাস ততক্ষণে পাশের রাজ্য বিহারে। পারশনাথ। বাংলা লব্জে জৈন তীর্থঙ্কর হয়ে গেছেন পরেশনাথ। পাহাড়ের ওপরে জৈনদের তীর্থস্থান। একসময় মানভূম তথা ছোটনাগপুর মালভূমি এলাকাতে জৈনধর্মের প্রসার ঘটেছিল। সেই ইতিহাসেরই সাক্ষ্য পারশনাথ।

সবুজে সবুজে ঢাকা পাহাড়। মাথায় মন্দির। সেই মন্দিরেই ওঠা হবে। পাহাড়ি রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে সেই ছেলেটা। বন্ধুদের সঙ্গে এটা ওটা কথা বলতে বলতেই প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ। পাহাড়ের উপর থেকে নিচে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের বাসটা দেখে মনে হয় বুঝি ছোটদের কোনও খেলনাই হবে।

ভারী শান্ত আর সমাহিত সেই তীর্থস্থান। প্রকৃতির মাঝে সেই প্রশান্ত গম্ভীর পরিবেশে গিয়ে পড়লে মনে হবে যেন একফালি মধ্যযুগে এসে পড়া গেছে। মন্দিরের চারপাশে কিছু ছোটছোট দোকান। তীর্থঙ্করের ছোটবড় মূর্তি বিক্রি হচ্ছে। ফ্লুওরোসেন্ট সবুজ রঙের মূর্তির ছড়াছড়ি। মূর্তির পিছনে সহস্রফনা। এক দোকানদার

বললেন, ওটা টর্চের আলোর সামনে ধরে রাখলে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে রাতের অন্ধকারে। বাঃ, এ তো ভারী মজা। তবে সেদিকে ছেলেটার চোখ গেল না। সবুজ রঙের অনেক মূর্তির পিছনে এককোণে অবহেলায় পড়েছিল একটা সাদা রঙের মূর্তি। পিছনে তার সহস্রফনার বাহুল্য নেই। এ মূর্তি টর্চের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবু সেটাই চোখে পড়ল। হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখল। ছোট হলেও মুদিতে নয়নে শান্তির ইশারা বাঙ্ময় হয়ে রয়েছে ধ্যানস্থ সেই মূর্তিতে। ছেলেটা কিনে নেয় সেই মূর্তি।

অন্য বন্ধুদের অনেকেরই নজরে এল সেটা। অনেকেই হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। দোকান-গুলোতে গিয়ে খোঁজ করতে লাগল ওইরকমই একটা মূর্তির। নেহাতই ঘটনা। তবু আশ্চর্যের বিষয়, কোনও দোকানেই ওইরকম আরেকটা মূর্তি কেউ পেল না। সারা ক্লাসে একমাত্র সেই ছেলেটির কাছেই রয়ে গেল মূর্তিটা।

রাতে ওরা ফিরে এল বিদ্যাপীঠে। ছেলেদের মুখে মুখে রটে গেছে সেই অদ্ভুত মূর্তির কথা। ক্লাসের অনেকে যারা দেখেনি রাতে তারাও এসে দেখে যায় 'বিরল' মর্যাদা পাওয়া সেই মূর্তি। দেখতে দেখতে বিখ্যাত হয়ে গেল মূর্তিটা। দুধসাদা নয়, মূর্তির রং ছিল ঘোলাটে সাদা। হাতির দাঁতের মতো।

মূর্তিটা রইল কাঠের পাল্লা দেওয়া দেওয়াল আলমারিতে। আলমারির দরজা খুললেই চোখে পড়ত সেই উজ্জ্বল সম্পদ। মূর্তির দিকে তাকিয়ে ভারী গর্ব হতো ছেলেটার।

দিন-মাস ঘুরতে থাকে। বিদ্যাপীঠের একান্ত নিজস্ব পরিবেশে ছেলেটা মিশে যাচ্ছিল একটু একটু করে। একদিন সকালে স্টাডি হল থেকে ফিরে এসে মাথায় হাত। অভ্যেস মতো আলমারির দরজা খুলে দেখল, ভেতরের সবকিছু পরিপাটি করে সাজানো রয়েছে। নেই শুধু মূর্তিটা। ভেতরটা হু-হু করে ওঠে ছেলেটার। বাবা যেদিন ওকে হস্টেলে রেখে গিয়েছিলেন, কষ্টটা অনেকটা সেদিনের মতো।

খোঁজ খোঁজ। কোথায় গেল? আর কোথায় গেল! বন্ধুবান্ধবদের সবাইকে বলেও সন্ধান পাওয়া গেল না। কে যে নিয়েছিল সেই মূর্তি সেটা ঠাহর করে উঠতে পারেনি ছেলেটা। কাকে সন্দেহ করবে সে!

বিদ্যাপীঠ জীবনের শুরুতেই এমন একটা ঘটনা ছেলেটার মনে দুঃখের অনেক আঁকিবুকি কেটে দিয়েছিল সেদিন। কিন্তু জলের দাগের মতোই সেসব একদিন মুছেও গিয়েছিল মন থেকে। সময়ের অমোঘ কৌশল দুঃখ, শোক, তাপ—সবকিছুকেই ভুলিয়ে দেয়।

বিদ্যাপীঠের অন্যরকম জীবন ভাললাগতে থাকে তার। খেলাধূলা-গানবাজনা-নাটক-প্রদর্শনী নানা অনুষ্ঠানে নিজেকে মিশিয়ে দেয় অন্যদের মতোই। শুধু মনের একপ্রান্তে টুকরো স্মৃতি হয়ে পড়ে থাকে পরেশনাথের সেই মূর্তি হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা।

হয়তো সেই তুচ্ছ ঘটনা চিরতরে হারিয়েই যেত। হয়তো বিস্মরণের অতল থেকে বুদবুদের মতো ভেসে উঠত কোনও এক অবসরে। কিংবা তা-ও না। অথচ তা হতে দিল না বিদ্যাপীঠ।

সেদিনের কিশোর তখন বিদ্যাপীঠের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। টেস্ট হয়ে গেছে। বইয়ে খাতায় নামের পাশে লেখা শুরু হয়েছে 'ক্যান্ডি-৮৭'। নিয়মকানুনে বিদ্যাপীঠের কঠোর শৃঙ্খলা যেন একটু আলগা। ভোরবেলা সাদা বর্ডার দেওয়া সবুজ বেডকভার গায়ে দিয়ে তখন ডাইনিং হলে যাওয়া চলে।

স্টাডিহলের বাইরে দুপুরে পড়াশোনা করা চলে গাছের তলায় বসেও। বিচ্যুতি বলা যায় না তাকে। তবু সেটুকুর পূর্ণ সদ্ব্যবহারে কিঞ্চিত মজা পায় অন্যদের সঙ্গে সেই ছেলেটাও।

মাধ্যমিক পরীক্ষা দোরগোড়ায়। একদিন দুপুরে স্টাডিহল থেকে কী একটা বই আনতে নিজের ঘরে এসে অবাক হয় ছেলেটা। এ যে সেই হারানিধি। টানটান সবুজ বিছানার ঠিক মাঝখানে কে যেন পরম যত্নে বসিয়ে দিয়ে গেছে মূর্তিটা। এমনভাবে, যে চোখে না পড়ে উপায় নেই। হাতে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দ্যাখে এতদিন কাছে না থাকা তীর্থঙ্করের সেই মূর্তিটা। মূর্তিটা আগের চেয়েও আরও ভাল লাগে সেদিন।

স্টাডিহলে ফিরে এসে পড়ায় অর মন বসে না।

মনের মধ্যে ভিড় করে আসে হাজারও প্রশ্ন। তার কোন বন্ধু নিয়েছিল মূর্তিখানা? কেন নিয়েছিল? সে তো কোনওদিন ওই মূর্তি সবার সামনে বের করতে পারবে না জানত। তাও কেন? চারবছরে উপলব্ধির কোন কোন স্তর পার হয়ে তার মনে হল, যার জিনিস তার কাছে ফিরে যাওয়াই ভাল! না কি এই প্রত্যর্পণ শুধুই বিবেকের দংশনে?

বিদ্যাপীঠের দিন ফুরিয়ে আসছিল। মাধ্যমিকের প্রস্তুতির ব্যস্ততার মধ্যেই একটু একটু করে ভারী হচ্ছিল মনটা। কে কোথায় চলে যাবে! অনেকের সঙ্গে হয়তো সারাজীবনেও আর দেখা হবে না! তবু এসবের মধ্যেও মূর্তিটাকে নিয়ে প্রবল কৌতূহল মনে জেগে থাকে। কে নিয়েছিল মূর্তিটা? তারই ঘনিষ্ঠ কেউ? হয়তো সংকোচের বশেই ছেলেটার হাতে তুলে দিতে পারেনি সেই ছোট্ট জিনিসটা। কী জানি যদি ভুল বোঝে! কিশোর মনস্তত্ত্বের রহস্যভেদ করে বিদ্যাপীঠে থাকাকালীন আর কোনও উত্তরই জানা হয়নি ছেলেটার।

জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কি খুব জরুরি!

লেখক আনন্দবাজার গোষ্ঠীর পত্রিকা 'এবেলা'-র সাংবাদিক।

প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য

পাশ্চাত্যদেশের বক্তব্য, 'কর্ম কর, কর্ম করে তোমার শক্তি দেখাও'। ভারতের বক্তব্য, 'দুঃখকষ্ট সহ্য করে তোমার শক্তি দেখাও'। মানুষ কত বেশী জিনিসের অধিকারী হতে পারে, পাশ্চাত্য এই সমস্যা পূরণ করেছে; মানুষ কত অল্প নিয়ে থাকতে পারে, ভারত এই সমস্যা পূরণ করেছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

অনুকে লেখা খোলা চিঠি

প্রান্তিক সিংহ

মাধ্যমিক, ১৯৮৮

(১০.০৬.১৪ তারিখে, পুরুলিয়া থেকে হাজার মাইল দূরে আমেরিকার একটি শহরে বসে—এই চিঠি লিখছি)

অনু ফণীদার ছোট ছেলে। আর, অপু ফণীদার বড় ছেলে.....যার চলে যাওয়াটা মানুষটা কোনদিন মানতে পারেন নি।

অপু যে ওপু নয় তা ওনার কাছেই শেখা। অপুকে চেনাও ওনার হাত ধরেই। অপু চলে গেছিল আগেই—সেই ক্ষতটা হয়তো কিছুটা হলেও ভরে দিচ্ছিল কাজল—আমি জানি না ফণীদার নাতির নাম কাজল কিনা—আমার জানা হয় নি...ভাবলে খারাপ লাগে বটে, কিন্তু এরকম অনেক কথাই আমার, আমাদের জানা দরকার, অথচ জানা হয়ে ওঠে না....

এই মানুষগুলো যারা নাকি তিল তিল করে তাঁদের জীবনের প্রতিটা অনুক্ষণ আমাদের দিয়ে গেলেন, আমাদের পথের পাঁচালী-টা রচনা করে দিয়ে গেলেন, তাঁদের জন্য আমরা কতটা করলাম, আর কতটা করতে পারলাম না সে হিসেব মেলাতে বসলে না পারার পাল্লাটা বড্ড ভারী হয়ে যায়...বাস্তবের কাঠ গোড়ায় দাঁড়িয়ে তাই আজ সত্যিই ''রূপ হয়েছেন রূঢ়''....

অনু পাশে দাঁড়াতে পারছি না—পারছি না বলে ভীষণ খারাপ লাগছে, বার বার মনে পড়ছে বাংলা পড়ার ফাঁকে বৌদির চা-বিস্কুট-মিষ্টি আরও কত কিছু—আর মনে পড়ছে সময়ের সাথে সাথে তোর আমার আমাদের সকলের বড় হয়ে ওঠা.... মনে পড়ছে না খালি বড় হতে হতে কখন বাংলা লেখাটাই ভুলে গেলাম....বা হয়ত না ভুলেও, তুলে দিলাম অজানা কোনো এক সিন্দুকে।

তাই বোধহয় আজ লিখতে গিয়ে বানান ভুলের ছড়াছড়ি...অথচ এই ভুলগুলোর হাত ধরেই একদিন চেনা হয়েছিল এই অমায়িক আড়ম্বরবর্জিত মানুষটিকে। বিজ্ঞানের মত নিয়ম মেনে যে ভাষা শেখানো যায়, তা হয়তো এক বা একাধিক সংস্কৃত বা গ্রীক দার্শনিক বলে থাকবেন....আমার জানা নেই, জানার প্রয়োজন হয়নি আগেও—আজও হবে না....প্রয়োজন যদি কিছুর হয়, তা হলো আজকের কালকের এই শূন্যতা ভরার বৃথা চেষ্টায় কিছু ফেলে আসা স্মৃতি রোমন্থন....কিছু অপ্রাসঙ্গিক মুহূর্তের হাতে হাত রেখে, দুরন্ত গতিতে ছুটে গিয়ে সেই ভুবন ডাঙার মাঠ...সেই বোতাম খোলা শার্ট....সেই দুর্গাকে দূর্গা বলে ভুল করে, দাঁত বের করে তেল চিটচিটে মাথায় হাত দিয়ে বোকার মতন হাসার আনন্দ....

বাংলা ভাষার আবেগ শিখেছিলাম যার কাছ থেকে সেই দিলীপদা ''ইচ্ছেকে শালিক করে'' তার ডানায় ভেসে গেছেন আজ বহুকাল আগে—আবেগ ফেলে যার হাত ধরে আবেগের কাটাছেঁড়া...যার কাছে ব্যাকরণের কচকচানিও হয়ে উঠতো কাব্য, তিনিও আজ আর নেই....আমাদের এই পৃথিবীর ''দূষিত বায়ু'' ফেলে রেখে, ফণীদা চলে গেলেন ''দূত হয়ে ওই দূরের দূর্বা ঘাসে''....

পড়ে রইলো ফণীদার সাদা ধুতি ও পাঞ্জাবি, পড়ে রইলো দেশবন্ধু রোডের বাড়িতে ফণীদার দেয়াল-আলমারি ভরা ভাষাচর্চার বই ও খাতা-না লেখা পাণ্ডুলিপি-পড়ে রইলাম আমরা আর আমাদের অব্যবহারে জীর্ণ বাংলা ভাষা....রইলো বৌদি আর বৌদির অকাপট ভালবাসা—রইলো কাজল আর কাজলের মা-অনু দেখিস, তুই দেখিস যেন কাজল বাংলা শেখে অঙ্কের মত করে...

ইতি—

লেখক ব্রাসেলস প্রবাসী, কামিন্স গ্লোবাল লজিস্টিকসের রিজিওনাল ডাইরেক্টর।

মা-বিদ্যাপীঠ

বিশঙ্ক বিশ্বাস

মাধ্যমিক, ১৯৯৩

● **পিঠেপুলি ও একটি আঙুল...**

হরিদা। আমাদের অঙ্কের স্যার। মিঠে-কড়া মেজাজ। মুখে সর্বদা হাসি। তবে শাসনে অপরাজেয়। হাতে দু'ফুটের কাঠের স্কেল। বোর্ডে লাইন 'সোজা' করার জন্য। ছেলেদেরও। জোড়া জোড়া ডেস্কে বসতাম আমরা। কেউ একজন দুষ্টুমি করলে ঐ স্কেলটি মাঝখানে চালিয়ে দিয়ে চটাপট-চটাপট শব্দে দুজনকে পুরস্কৃত করতেন, একসাথে। একবার এক সিনিয়র দাদার নামই চেঞ্জ করে দিলেন মারতে মারতে। 'বাইচান্স মাহাতো'। অরিজিনাল নামটা সত্যিই ভুলে গেছি। অঙ্কে ভালোই ছিল। তবে টেস্টে ১০০-এ ১০০ পায়নি। ক্লাসে খাতা দেখতে দিয়েছেন। অমনি ও খাতা নিয়ে সটান চলে গেল টিচার্স রুমে। হরিদাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলল অন্যায়ভাবে তার নম্বর কাটা হয়েছে। অঙ্কটা সে ঠিকই করেছিল। হরিদা এতটুকু অপ্রতিভ না হয়ে ওর ভুলটা দেখিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠল ''ও তো বাইচান্স ভুল হয়ে গেছে।'' ব্যস, যাবে কোথায়, —সেই টিচার্স রুম থেকে ক্লাস পর্যন্ত ঠ্যাঙাতে ঠ্যাঙাতে নিয়ে এলেন তাকে। সেই থেকে ঐ দাদার নামই হয়ে গেল 'বাইচান্স মাহাতো'।

আমাদের টেস্টের আগে হরিদা open challenge ছুঁড়লেন—'যদি কেউ টেস্টে একশোয় একশো পায় তবে তিনি এ্যাসেম্বলীতে দাঁড়িয়ে সবার সামনে 'হারিকিরি' করবেন। বলা বাহুল্য সেই অঘটনটা ঘটেনি।

প্রায়ই স্বগতোক্তির মতে বলতেন—''অঙ্ক সবার জন্য নয়।'' কিম্বা ''There is no shortcut in Mathematics''। হেঁয়ালিও পছন্দ করতেন বেশ। তখন ক্লাস এইট (VIII), সেকশন 'B'। হরিদার ক্লাস। আমরা একটু বেশী সিরিয়াস হয়েই বসে আছি। হরিদা ঢুকলেন—বলতে বলতে—

''যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এইট বি তে''। সত্যি তার কয়েকদিন পরেই হরিদার পরিবর্তে অঙ্কের নতুন স্যার এলেন—নিত্যানন্দ নাগ (N^3)।

এই হরিদার কাছে আমরা একবার ভয়ে ভয়ে আবদার করে বসলাম।

...ক্লাস নাইন। শীতের সকাল, বুধবার, হাফ স্কুল। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে হরিদা ঢুকলেন। সেদিন হাতে স্কেলটা নেই। আমাদেরকে নিয়ে ক্লাসরুম ফাঁকা করে বেরিয়ে পড়লেন মাঠ পেরিয়ে চ্যারিটেব্‌ল এর দিকে। ক্লাস IV-এর ফুটবল গ্রাউন্ড। সরু সিমেন্টের পার্টিশনের উপর সবাই বসলাম। হরিদার ব্যাগ থেকে বেরোলো পুলি পিঠে ভরা একটা বড় টিফিন বাটি। আরও একটা। খেজুর গুড় সহযোগে আমরা এক অন্য হরিদার স্বাদ পেলাম। স্নেহময়ী হরিদাকে আবিষ্কার করলাম যেন!

এই হরিদার গুরুপল্লীতে প্রচুর ফ্যান। বিকেলে সব বাচ্চারাই চায় হরিদার হাত ধরে হাঁটতে। হরিদার মোটে দুটোই হাত। কচিকাচারা সংখ্যায় ঢের বেশী। বাধ্য হয়ে আঙুল ধরে সাধ মেটাতে হয়। তাতেও হয় না। রাস্তা সরু। আঙুল ধরে পাশাপাশি হাঁটতে পায় বাধে। তাই নতুন পন্থা বেরোলো। হরিদা হাতে একটা দড়ি ধরবেন।

আর বাচ্চারা সেই দড়ি ধরে যেন হরিদাকেই 'ছুঁয়ে' এগোবে।... ব্যাগ ভর্তি চকলেট্, পিঠেপুলি আর স্নেহময়ী আঙুলের স্পর্শ।

● রুলের মার পগার পার

ক্লাস নাইন। রামকৃষ্ণ সদন। শক্তিদার ধাম। কাছে ঘেঁষতে একটু ভয়ই করত। পাহাড় প্রমাণ পারসোনালিটি। তাই একটু গা বাঁচিয়ে দূরে দূরেই থাকতাম।... 'ক্যালকাটা ব্যাচ'-এ সকাল সকাল আদ্রা-চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে করে নতুন ধামে পৌঁছে গেছি। রুম খুঁজে, বেড পেতে দুপুরে ক্লান্তির ঘুম দিয়ে বিকেলে খেলার মাঠে যাওয়ার সময় নীচে সিঁড়ির সামনে শক্তিদাকে প্রণাম করতে যাচ্ছি—সঙ্গে সঙ্গে শক্তিদা বললেন 'এখন সময় হলো?'—আমিতো অবাক। এতগুলো ছেলের মধ্যে আমাকে আলাদা করে মনে রেখেছেন! আগেই দেখা করা উচিৎ ছিল। 'Sorry' বা 'ভুল হয়ে গেছে'—কিছুই মুখ থেকে বেরোলো না। বরং অবাক-লজ্জা আর বিস্ময় নিয়ে চলে গেলাম।

তবে শক্তিদার সঙ্গে প্রথম ইন্টারাকশান হসপিটালে। জ্বর হয়েছে। সারাদিন মন খারাপ। শুয়ে আছি। ঘুম হচ্ছে, হচ্ছে না। কেমন একটা অবশ অবশ ভাব। কখনো ঘোরে, কখনো ক্যারমে। একাকীত্বের একটা কবিতাও লিখে ফেললাম। —এইরকম...

"জলে পড়ে টিপটিপ
রেল চলে ঝিক্ ঝিক্,
আর রয় দুলালের শিস্।
খেতে বড় ইচ্ছে করে
কাজু আর কিসমিস।"

—নিছকই ছন্দে মেলানোর জন্য। তা সত্ত্বেও সন্ধেবেলায় চিঠি দিতে এসে ঐ কবিতাটা দেখেই শক্তিদা ছুটলেন হস্টেলে। আর আধঘণ্টার মধ্যেই দেখি কাজু-কিসমিস ভরা বয়েম হাতে প্রসূন আর পৈঁটা (সৌরভ দত্ত) হাজির। জ্বরের ঘোরে বাড়ির চিঠির চেয়েও বুঝি স্বর্গ পেলাম ক্ষণিকের তরে।

হসপিটাল থেকে ফিরে অবশ্য প্রসূন-পৈঁটার কাছে কথা শুনতে হয়েছিল। মাঝপথে কাজু-কিসমিসের বয়েম অর্ধেক খালি করার জন্য শক্তিদার কাছে ওদের বকা খাওয়ার দায় তো আমার উপরই বর্তায়!! এই শক্তিদর ঘরেই রাজনীতি—একদিকে প্রসূন জ্যোতি বসু অন্যদিকে পৈঁটা-মমতা। কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের অবস্থান নিয়ে শৌনক-দিব্যর ডিবেট্। জন্মাষ্টমীর রিহার্সালে—কৌশিকীর পাকোয়াজ, সমীকের বল্লে-বল্লে... হিল্লোলের—"কাঁছে আঁয়, কাঁছে আঁয়...তোঁরা বঁড় ভাঁলো ছেঁলে...কাঁছে আঁয়...," রেকর্ডিং।

রাত জেগে ম্যাগাজিন...আর সায়ন্তনের কফি সাপ্লাই...। ঘর গোছানোর নামে কত পেটি পেটি বিস্কুট আর হরলিকস যে পার্থ-পৈঁটার পেটে ঢুকেছে তার ইয়ত্তা নেই।

একবার একটা গুরুতর অপরাধের জন্য প্রসূনকে বেধড়ক মার খেতে হয়েছিল শক্তিদার কাছে। সেটা হয়তো প্রসূন কষ্ট করে সহ্য করেছিল, কিন্তু শক্তিদা প্রসূনের ঐ মার খাওয়াটা কিছুতেই সহ্য করতে পারেননি। ...আমরা সবাই ডাইনিং হলে খেতে চলে গেলে সবার অন্তরালে ঐ দেড়ফুট কাঠের রুলটা দিয়ে নিজেই নিজের

পিঠে, পায়, হাতে মেরে দেখেছিলেন কতটা লেগেছিল প্রসূনের। কতটা ব্যথা পেয়েছিল প্রসূন।

সহমর্মিতা আর সমবেদনায় বেদনান্বিত হলেন তিনি প্রসূনের সাথে।... আমাদের সাথে।

● **বোচকা ভরা হসপিটালের রিক্সা...**

ফোর-ফাইভে ছেলেরা সবে নতুন ভর্তি হয়েছে। কিছুই ঠিকমত করতে পারে না নিজেরা। অসুবিধা নেই—খাঁদুদা আছেন। চান করানো, গা মোছানো, চুল আচড়ানো, জামা পরানো,... ধুতি পরানো...জুতোর ফিতে বাঁধা, মশারী টানানো...একেবারে A to Z সব খাঁদুদা।

চান করার সময় বাচ্চাদের ফূর্তি একটু বেশীই। আনন্দ আর ধরে না। শাওয়ারের নীচে লাফাতে লাফাতে পিছ্‌লে গেল দু-একটা। ওমনি কোত্থকে খাঁদুদা এসে চটাস চটাস করে চড় কষালেন। জল-গা। তবে দমার পাত্র নয় ছেলেরা। নাচতে নাচতেই খাঁদুদার কাছে গা মুছে জামা প্যান্ট পরে স্কুলে ছুটলো শিবানন্দ সদন থেকে। বিউগিল পড়ে গেছে অ্যাসেম্বলির।

খেতে বসে মাছের কাঁটা বেছে দেওয়া, রাতে প্রত্যেকের মশারী ঠিক করে গুঁজে দেওয়া, কিম্বা কারও আলমারিতে স্টকে পিঁপড়ে লেগে গেলে পরিষ্কার করে দেওয়া ছিল খাঁদুদারই কাজ। প্রেয়ারের আগে ধুতি পরানো ও পরে ধুতি খুলে ঠিকমত পাট করতে শেখানো, শীতকালে চাদর পরিয়ে পিছনে গিঁট দেওয়া, প্রত্যেকে মাঙ্কি ক্যাপ-মোজা পরেছে কিনা খেয়াল করাও ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। গরমের দিনে রাতে হাত পাখায় হাওয়া করে ছেলেদের ঘুম পাড়ানো...এককথায় মায়ের স্নেহ মমতায় পরিপূর্ণ।

ছেলেদের শরীর খারাপ হলে খাঁদুদার চেহারা যেত বদলে। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় ভরে উঠত মুখ। সবুজ বেড কভারে জামাকাপড়-পেস্ট-ব্রাশ-সাবান—সব পোটলা বেঁধে রিক্সায় চাপিয়ে হসপিটালে নিয়ে যেতেন খাঁদুদা। এই দৃশ্য বিবেক মন্দিরের সকালের স্টাডি হল থেকে কত দেখেছি তার ইয়ত্তা নেই। হসপিটালে ডাঃ দরিপা, 'মামা', অবনীদার ট্রিটমেন্ট ও সর্বোপরি খাঁদুদার স্নেহস্পর্শ আমাদেরকে দ্রুত সারিয়ে তুলত। জ্বর হলে মাথায় জলপটি-দেওয়া, ভিজে গামছায় বারবার গা মুছিয়ে দেওয়া, বিস্কুট-সরবত (সি-ডায়েট), পায়েস-পাউরুটি খাইয়ে দেওয়া...খাঁদুদার সেবার অন্ত নেই।

সেই খাঁদুদা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। বেশ কয়েক বছর হল পরলোকগমন করেছেন। চিন্তা নেই ওখানেও খাঁদুদা সেবাব্রত চালিয়ে যাচ্ছেন আগের মতই। অঙ্কুশ-শ্যামল-অপুদের জ্বর হলে তো খাঁদুদাই ভরসা। ঠিক আগের মতোই কপালে জলপটি দিয়ে দিচ্ছেন...গা মুছিয়ে দিচ্ছেন...ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাচ্ছেন...। দেখবেন খাঁদুদা, ওদের যেন কষ্ট না হয়...ওরা যেন শান্তিতে থাকে। ভালো থাকে।

লেখক বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজের বিশিষ্ট চিকিৎসক।

প্রিয় অর্ক, ইতি অভিষেক

অভিষেক মল্লিক

মাধ্যমিক, ২০০৫

কলকাতা
১৫/১০/২০১৫
সন্ধ্যা ৭টা

প্রিয় অর্ক,

গতকালই তোর সুন্দর হাতের লেখার চিঠি পেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, এই Facebook কিংবা Watsapp-এর যুগে তোর এই চিঠি কিছুটা হলেও অপ্রত্যাশিতই লেগেছিল। যাই হোক, বিশ্বাস কর তোর চিঠি পড়ার মুহূর্ত থেকে এখনও পর্যন্ত সময়ের অনেকটাই নস্টালজিয়াতেই পড়ে রয়েছি। তুই তোর নিজস্ব ভঙ্গিতে যে ভাবে পুরো চিঠিটা লিখেছিস, সত্যিই তা বার বার পড়তে ইচ্ছে করে। তাই তোর চিঠির একটা প্রত্যুত্তর দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। কলকাতার এই কৃত্রিম জগতে থাকতে থাকতে আবার কিছুটা সময়ের জন্য হলেও মিশনের লাল-নীল-সবুজের দিনগুলোতে ফিরে যেতে কার না ভালো লাগে, তুই ই বল!

সালটা স্পষ্ট মনে আছে, তারিখও। ১৯৯৮ সালের ২৬ শে এপ্রিল। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শাল-মহুয়া-জারুলের পথ পেরিয়ে যখন মেন গেট পেরিয়ে মন্দিরের সামনে এসে পৌঁছালাম, ওপরে তাকাতেই দেখতে পেলাম।

"শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী,
তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি।।"

বাবা সুন্দর করে এর ব্যাখ্যা করে দিলেন। সত্যি কথা বলতে কী, এই মন্দিরে ঢুকেই আমার মিশনের প্রতি প্রথম ভালোবাসা শুরু।

তারপর সুবোধানন্দ ধামে প্রথম প্রবেশ। এখনো মনে আছে, আমার bed number ছিল ১, আর তোর ৩৭। আমার কাছাকাছিই তোর bed ছিল। মনে আছে তোর, প্রথম ধুতি পরার দিনগুলো? তোর সাথে প্রথম পরিচয় খুব সম্ভবতঃ হয়েছিল সন্ধ্যের ভজনে। এখনও স্পষ্ট মনে আছে, আমরা দুজনে সেদিন সন্ধ্যের ভজনে কথা বলছিলাম সবার চোখ আড়াল করে। হঠাৎ পেছন থেকে এক senior দাদা ডেকে বলল, মহারাজ ডাকছেন। সেই আমাদের বন্ধুত্বের শুরু।

হাসি-কান্না; ভালোলাগা—মন খারাপের দোল দোলানিতে তখনও বাইরের জগৎকে ঠিকমতো চিনতে শিখিনি। Drill, study, school, বিকেলের খেলা, সন্ধ্যের "খণ্ডন ভব বন্দন", আর তারপর study-তে পেছনের বেঞ্চে লুকিয়ে লুকিয়ে গল্পের বই কিংবা ঘুম—অদ্ভুত ভালোলাগা ছিল, প্রশান্তি ছিল এই রুটিনে। যদিও সকালের drill বড্ড বেশী ragging গোছের ছিল আমার আর তোর জন্য। তোর নিশ্চয়ই মনে থাকার কথা, একদিন drill time-এ আমরা drill করতে না গিয়ে বিছানার নীচে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরে খেলার স্যার ডেকে ৩-৪ দিন বিকেলে খেলাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ক্লাসে আমরা দুজনেই ছিলাম A Section-এ। একেবারে পেছনের বেঞ্চের আগের বেঞ্চে ছিল আমাদের বসার জায়গা। ভাগ্যিস্ কোন স্যারই আমাদের ডেস্কের ভেতরে check করেননি। না হলে চানাচুর, Uncle Chips, গল্পের বই...এসব অনেক কিছুই আবিষ্কার হতো।

তোর সব স্যারেদের মনে আছে এখনও? অঙ্কে রাখরাম হাজরা দা, বাংলায় ভোলানাথ দা, ইংরেজীতে অমিয় পাল দা। মনে আছে এখনও, ক্লাস ফোর এর 1st Term-এ অঙ্কে 2 নম্বর ভুল হয়েছিল বলে কি কান্নাকাটিই না করেছিলি তুই!

বিকেলের খেলার মুহূর্তগুলো খুব বেশী মনে পড়ছে। আমি খেলতাম ডিফেন্সে, আর তুই সেন্ট্রার ফরোয়ার্ড। কখনও একই দলে, কখনও বা আলাদা। প্রত্যেকটা দিনের সারাটা সকাল, সারাটা school time অপেক্ষা করে থাকতাম বিকেলের tiffin-এর পরের 45 minute-এর এই খেলার সময়টার জন্য।

দেখতে দেখতে দিনগুলো স্বপ্নের মতো কিভাবে কেটে যাচ্ছিল, বুঝতেই পারিনি। সুবোধানন্দ ধাম পেরিয়ে ব্রহ্মানন্দ সদন। তারপর ক্লাস ৯, ১০-এর সারদাসদন।

মিশনের অনুষ্ঠানগুলোর কথা খুব বেশী মনে পড়ছে আজ। সরস্বতী পুজো, কালী পুজো, তিথি পুজো, Christmas, জন্মাষ্টমী—বিভিন্ন অনুষ্ঠানেই জাঁকজমক থাকতো সারাটা বছর। তার ওপর বিভিন্ন competition তো আছেই—Quiz Competition, Recitation Competition, Music Competition, Annual Exhibition। এখনও বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই, তোর গানের কী পরিমাণ ভক্ত ছিলাম আমি। এই রকমই এক Music Competition-এ তোর গাওয়া "ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু, পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।" বারবার ওই স্বর্ণালী সন্ধ্যেতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। খুব জানতে ইচ্ছে করে, এখনও গানটা চালিয়ে যাচ্ছিস কিনা। যদি কখনও কলকাতা আসিস, একটা সন্ধ্যে আগেভাগেই book করে রাখলাম তোকে।

তুই তোর চিঠিতে তোর এখনকার কথা লিখেছিস, আর সেই সাথে আমার কথা জানতে চেয়েছিস। তুই তো জানিসই যে, আমি এখন কলকাতাতে একটা job করছি। মিশনের ৯ বছরের আশ্রমিক পরিবেশের ওই দিনগুলো আমার কাছে এখনও স্বপ্নের মতো মনে হয়। ওই পরিবেশের সাথে বাইরের জগৎটার মিল পাইনা এতটুকু। পথহারা এক পথিকের মতো ওই রকমই একটা স্বপ্নের আশ্রয় খুঁজে চলি সবসময় যে কিনা আমার পাশে এসে বলবে, "এসো, তোমার সাথে গল্প করি"।

শুকদেব মাইতিদার কিছুদিন আগেই একটা চিঠি পেলাম। চিঠিটা এতোবার বন্ধুদের পড়ে শুনিয়েছি যে প্রায় মুখস্থই হয়ে গেছে। চিঠিটা অন্য কোনোদিন তোকে পড়ে শোনাব। চিঠিটার প্রথম দু'লাইন ছিল এরকম—

"যাহা পাই, তাহা ভুল করে চাই,
যাহা চাই, তাহা পাই না।।"

অদ্ভুত সুন্দর কথাগুলো, তাই না?

কাকু, কাকীমা কেমন আছেন, জানাস। কলকাতা এলে জানাতে ভুলে যাস না। কলকাতাতে থাকা আমাদের batch-এর সবাই মিলে একটা get together করা যেতে পারে। জানি না, নষ্টালজিয়ার সেই পুরনো স্বাদ আবার ফিরে পাবো কিনা!

হৃদয়ের আবেগে ভাসতে ভাসতে অনেকটা পথ চলে এসেছি। আর নয়। খাবারের সময় হয়ে গেছে।

ভালো থাকিস।

অভিষেক

লেখক পুণে প্রবাসী, সাপুরজী পালোনজী সংস্থায় কর্মরত।

ঘরের ওপরে চিলেকোঠা

প্রকাশ কুণ্ডু

মাধ্যমিক, ২০১২

'বিদ্যাপীঠ' নয়, 'অভ্যুদয়'। পাকাপাকি ভাবে বড় হয়ে গেলাম।

এর চরিত্রও আলাদা। ছোটোবেলায় লেখা জমা দিয়ে মুখিয়ে থাকতাম, কবে পত্রিকা বেরোবে। তারপর ভুলেও যেতাম। কেউ যদি মাঝে কোনোদিন স্যারের কাছ থেকে লেখা সংক্রান্ত ব্যাপারে ডাক পায়—বেশ একটা ব্যাপার। তোরটা সিলেক্ট হয়েছে? আর কারোটা দেখলি। রৌনকেরটা ছিল বোধহয়। শিওর নই। তখন সবকিছুই প্রায় ব্যাপারের তালিকায় পড়ত। ঘটলেই হয়। যেদিন পত্রিকা হাতে পেতাম—সেদিন হুমড়ি খেয়ে পড়তাম সূচীপত্রে। নাম রয়েছে? ছড়াটা হয়নি। আরে, এটা কী? এটা তে একজিবিশনের সময় লিখে এসেছিলাম। এটা ছাপা হয়েছে! কয়েকবার করে পড়া। নিজেরই কথা। সেটাই। তোর বেরিয়েছে? দেখি, দেখি। তাকিয়ে থাকা। ওই, দূর্বাদলের দু'টো বেরিয়েছে! দু'টো কবিতাই ছেপেছে! সেটা পড়া। লাইনে দাঁড়িয়েই টানাটানি। যে পেয়ে বেরিয়ে আসছে। কার কার বেরোল রে? তোর একটা রয়েছে বোধহয়। কোনটা? ওই, কোনটা? এই ছাড়, পরে দেখবি। আরে তুইও তো পাবি। বাবা, এটা রেখে দে—গিয়ে আমার বেডে রেখে দিবি। হারাবি না। হেএই কুণ্ডুউ—হারাবি না। তন্ময় হয়ে পাতা উল্টে দেখা। লাইন এগিয়ে যায়।

এখন আমরা প্রাক্তনী। বাঁধন যেমন আলগা হয়েছে—আমরা ছোটোটি-ও নেই এখন। প্রায় হাত জোড় করে লেখা চাইবার জোগাড়। এর'ম ব্যাপারটা অবশ্য হঠাৎ নয়। ইলেভেন। নরেন্দ্রপুরে পড়ি। সুনীলদা লেখা চেয়ে পাঠিয়েছেন। সেটা অবশ্য আদেশ। তবে সেসময়ও এই লেখা দেওয়ার হুড়োহুড়ি, উৎকণ্ঠা—প্রায় উধাও। চেয়েছেন, লিখে দেব। বড় হওয়ার সাথে সাথে কেমন একটা বাড়তি ভার চলে আসে। আমি আমারই ভারে ঢলে পড়ি। স্বতঃস্ফূর্ততা পিষে যায় কিছুটা। সেটা বাড়তে থাকে, ভার যত বাড়ে।

শারদ্বতদাদের ব্যাচের উচ্চমাধ্যমিকের বিদায়ী। যতদূর মনে পড়ে—অ্যাসেম্বলিতে শারদ্বতদাই পড়েছিলেন। আমি চিনতাম না খুব একটা। তাছাড়া পেছনের রো-য়ে দাঁড়াতাম। মুখ দেখাও যাইনি। সেই প্রথম বার—এই দাগটা পড়েছিল—আমরা বড় হয়ে যাচ্ছি। তাই আমাদের কাঁদতে নেই। টেনে বেরিয়ে আসবার দিন কেঁদেছিলাম। হাউ-হাউ করে। সারাটা ক্লাস কাঁদছে। বিশ্বরূপকে সেই প্রথম কাঁদতে দেখেছিলাম বোধহয়। সন্দীপকেও। রিদ্ধি—সারাজীবন বাজে বকে—সেদিন ঝর-ঝর করে কেঁদে দিল। টুয়েলভে নরেন্দ্রপুর ছাড়ার দিন কাঁদতে পারিনি। সেদিন অত তীব্র অনুভূতিই তৈরী হতে পেল না। আমার না, কারোর না। বড় হয়ে গেছিলাম।

টুয়েলভের টেস্ট পরীক্ষা চলছে। নরেন্দ্রপুরে পড়ি তখন। সেদিন কী সুমতি হয়েছিল, আলো বন্ধ করেই গল্প করছিলাম। অন্যদিন সেটা বই মুখে করে হত। পাঁচমিনিট পর পর বলতাম—এই ঠিক আছে, এবার পর। দু-মিনিট। এই, এটা কী হবে রে? জানি না। এটা আসবে? আরে বাবা, আমি কী করে জানব? এসব কেন যে দেয়? শুরু হয় পরের দফা।

যাহোক, সেদিন আলো বন্ধ। বেশ চুপচাপ রকমে গল্প করছি। সান্দ্র সেদিন বলছিল—টুয়েলভে সব বদলে যায় ক্রমে। নাইন-টেন আর ইলেভেন-টুয়েলভ এক জিনিস নয়। কত মানুষও কেমন যেন বদলে যায়। আরো

কত কিছু। আমাকে বলছিল—পুরুলিয়া নিশ্চয় তোমার অনেক বেশী আপন। কী জানি? নরেন্দ্রপুরও আপন করে টেনেছিল। কিন্তু আমিই তো ততদিনে বড় হয়ে গেছি।

সে কথা না হয় থাক। নরেন্দ্রপুরের গল্পও এটা নয়। এটা বিদ্যাপীঠের গল্প। আবার বড় হওয়ার গল্পও বটে।

বিদ্যাপীঠ বহুদিন আমাদের আগলে রেখেছিল। বড় করেছে, ভার চাপতে দেয়নি। বার বার এগিয়ে দিয়েছে সবকিছুতে। চেষ্টা করতে। না পারলে কী হবে—সেই চাপটা কোনোদিন ছিল না। বিদ্যাপীঠ কাউকে খারাপ ছেলে বলে দেগে দিত না। তোমার দ্বারা হবে না—এই স্টিকারটা লাগিয়ে দিত না। ভুল হল। একেবারেই যে দেয়নি, তা নয়। কিছু ছেলে মার্কামারা হয়ে যেত। ভালো ছেলে—এই ছাপটাও পড়ত। তবুও, অনেকটাই পড়ত না। তোরা সব্বাইই পারবি, চেষ্টা করে দেখ। এই জায়গাতে ভালো-খারাপও নেই। চেষ্টা সব্বাইকে দিয়েই করানো। খারাপের ছাপগুলো মুছে দেওয়া। মায়েরও ভুল হয়। কিন্তু তা থেকে যায় না।

বিদ্যাপীঠ আমাদেরকে বরাবর সৃজনের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। সংকোচ কাটিয়ে দিয়েছে। শক্তিদার ক্লাস। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা। বলতে হবে ইংরাজীতে। চিন্তা করাও শেখা, ইংরাজীও শেখা। আবার নিজের চিন্তা প্রকাশ করাও শেখা। ডেকে ডেকে বলতে বলতেন। সংকোচ কাটাতেন। সংশোধন করতেন প্রয়োজনে। খারাপ-বলেছে-ভালো-বলেছে ব্যাপারটাই অবান্তর ছিল।

এইট। সেই প্রথমবার ইলোকিউশন কম্পিটিশন হবে। সে কী জিনিস? বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। ভালো কথা। আমি আগ বাড়িয়ে নাম দিয়েছি সবেতেই—হিন্দিতেও। দিয়ে হিটের সন্ধ্যা। হিন্দি বক্তৃতা দিচ্ছি। সে যে কী যাচ্ছেতাই বলেছিলাম—নিজেই শেষটায় হেসে ফেলেছিলাম। ইন্দ্রকান্তদা কিন্তু একফোঁটা হাসেন নি। বললেন, প্রয়াস আচ্ছি হৈ। তুম লিখো। লিখকে দিখাও। লিখেছিলাম বসে। অপাঠ্য হাতের লেখা। পাশে নিশান্ত বসে ছিল। বলল, দে, তু মুঝে ডিক্টেশন দে। দিতে দিতে ব্যাকরণে ভুল। ও ঠিক করে দিচ্ছে। দিয়ে শেষটায় ইন্দ্রকান্তদাকে দেওয়া। পরের দিন সকালের স্টাডির আগে বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় সদনে এসে লাল কালিতে ঠিক করা স্ক্রিপ্ট দিয়ে গেলেন। তৈয়ার করো।

'তোর ঘাড় করবে।'

ভালোবাসতে শেখাটাই তো বিদ্যাপীঠে। সবাইকে আপন করে নেওয়া। ক্লাসগুলো পরিবার। মাধ্যমিকের শেষদিন—গৌতমদাও কেঁদে ফেলেছেন। তপনদাও।

প্রাক্তনী হয়ে প্রথমবার বিদ্যাপীঠে গেছি। তখনও ছাপটা হাল্কা। ইলেভেন। আমারই ব্যাচ বিদ্যাপীঠে বর্তমান তখনও। ফিরে আমরা প্রায় ছাত্রই। চাদরটা ধরতে দিয়ে বল করলাম দু-টো। একটা গেল ময়ূখের মাথার ওপর দিয়ে। পরেরটায় উইকেট-কিপার দাঁড়ায়নি কেউ আর। বিশ্বরূপের সঙ্গে ঘুরলাম কতক্ষণ। ডেয়ারি। গুরুপল্লী। আরো কত জায়গা। টেন অবধি যাইনি কোনোদিন।

ডাইনিং হলে খেতে বসেছি। তুই এতটুক তরকারি লিলি! আরো দু-হাতা। জিজ্ঞেসও করেননি নিমাইদা। আমি ঠিক কতটা তরকারি নিই, মা'ও এত নিশ্চিত করে জানে না। বাড়ি যেতাম তো বছরে তিন মাসও না।

শ্রদ্ধা কাকে বলে, বিদ্যাপীঠে কিঞ্চিৎ শেখা। না, আমাদেরকে শ্রদ্ধা করতে শেখানো হয়েছে—বড়দের সম্মান করতে হত—সে কথা বলছি না। আমাদেরকে 'বড়'রা শ্রদ্ধা করতেন। আমরা সেখান থেকে শিখেছি।

স্বাধীনতা কী, তাও।

ফাইভের নবীনবরণে 'ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করতে চাই'—গুলো টুয়েলভে জয়েন্ট খেয়ে ফেলে। মক-টেস্ট। র‍্যাঙ্ক। মানুষ, সেবা—এগুলো মরে যায়।

বিদ্যাপীঠেও মক-টেস্ট হয়। ইলেভেন-টুয়েলভ এসে আদর্শগুলোয় থাবা বসায়।

কিন্তু, বিদ্যাপীঠ তবুও আগলায়। টেন অবধি যে আগলেছে, আমি হলফ করেই বলতে পারি। ভালো মানুষ হতে হবে—এটা জিইয়েছে।

পরীক্ষার নম্বর—কে পাত্তা দেয়। স্যারেরাই দেখতেন না অত।

শেখার গুরুত্ব ছিল বৈকি।

আর ভালো মানুষ হওয়ার।

শক্তিদার ক্লাসে রাজনীতির পিণ্ডি চটকানো খুব কমন ব্যাপার ছিল। সমসাময়িক কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচনা হলেই ভিলেন হত 'করাপ্ট পলিটিশিয়ান'। কমন ভিলেন। করাপশন সে সময়ে বিশাল চলতি কথা। একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললেন—তোরা তো বড় হয়ে রাজনীতিতে যেতে পারিস। রাজনীতিতে দৃঢ়, সৎ মানুষের যাওয়ার দরকার রয়েছে। তোদের মতো ছেলেরা গেলে ভালো হবে। তোরা সব্বাইই বলিস রাজনীতি নোংরা। তোদেরকে দায়িত্ব নিয়ে পরিষ্কারও করতে হবে তো।

বিদ্যাপীঠ আমাদেরকে নম্বরের গল্প শোনায় না। সাফল্যের কথাও না। সাফল্য গৌণ। মানুষ আসল।

ক্লাস সিক্স। বিবেকদার কাছে নম্বর বাড়াতে গেছি। বাড়ান নি। বললেন, পরীক্ষার খাতাটা তোমার আয়না। তুমি যা পড়াশোনা করেছ, সেটা ওখানে দেখতে পাবে। এভাবে নম্বর বাড়ালে সেটা ভুল দেখবে তখন।

পরীক্ষা যে নিজের, এবং শুধুই নিজের, সেদিন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। নম্বর নিয়ে লাফালাফির সার্কাস বিদ্যাপীঠ নয়।

'এখানে আমরা মানি-মেকিং-মেশিন তৈরী করি না, মানুষ তৈরী করি। বিদ্যাপীঠ হ'ল ম্যান-মেকিং-মেশিন।'

মাধ্যমিক। জীবনের প্রথম বোর্ড পরীক্ষা। আগের রাতে স্বপনদা এসেছেন স্টাডিহলে। 'তোমরা ইউসুফদাকে চেনো? ইউসুফদা। মাতৃ সদনের সামনের লনটাতে মালীর কাজ করেন। আমাকে একদিন পরীক্ষা চলাকালীন জিজ্ঞেস করলেন—হামাদের ছেল্যাদের পরীক্ষা ভালো হইঞ্ছে তো। লক্ষ্য করো—বলছেন আমাদের ছেলে। তোমাদেরকে কতটা ভালোবাসেন। কতটা আপন করে দেখেন। আমি বললাম—হ্যাঁ ইউসুফ, ওরা ভালোই পরীক্ষা দিচ্ছে—তুমি ওদের জন্য একটু দোয়া কোরো। ইউসুফদা বললেন—"হামি দোয়া করি তো, রোজ করি।"

'তোমরা আজ যেখানে আছ, মাথায় রেখো তার পেছনে অনেকের অনেক ত্যাগ, অনেক ভালোবাসা রয়েছে।'

'তাঁর কৃপা সকলের ওপরেই সমানভাবে বর্ষিত, তবুও, যে তা অনুভব করতে পারে, সে আরো বেশী করে ধন্য।' স্বপনদা-ই বলেছিলেন। আগের বছর যখন বিদ্যাপীঠ গেলাম—ওনার ঘরে ছিলাম অনেকক্ষণ। আসার সময়ে বললেন।

'অচলায়তন'-এর কথা প্রথম শোনা বিশ্বজিৎদার কাছে। এইটে পড়াকালীনই খুব সম্ভব, রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন এসেছিলেন। বক্তৃতাটা মনে আছে একটাই কারণে—পরের বার কুইজে 'অচলায়তন' নিয়ে প্রশ্ন এসেছিল, এবং পেরেছিলাম। আর মনে আছে বিশ্বজিৎদা ওনাদের ব্যাচে মাধ্যমিকে বাংলা আর জীবনবিজ্ঞানে হায়েস্ট পেয়েছিলেন

বলে। সেক্রেটারি মহারাজ বড়মুখ করে বলেছিলেন। নিশ্চিত ছিলেন না বলে অজয়দাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন স্টেজ থেকেই।

শেষের দিকের কথাগুলো বিশেষ মনে রয়েছে। দেওয়াল ভেঙে দেওয়ার পর। পাথর ভেঙে পড়ে রয়েছে। গুরু পাঁচুকে বলছেন—এরপরে গড়বার কথা। 'অচলায়তন' কিন্তু ভাঙবার গল্প নয়—ভাঙবার পরে গড়বার গল্প। অচলকে ভেঙে সচলকে গড়বার গল্প। সেই গড়লে কী বিদ্যাপীঠ হয়?

জানি না। একটা অধ্যায় হাতড়াচ্ছি। অগোছালো। স্মৃতিচারণা?

কমেমোরেটিভ ভলিউম। ভর্তি স্মৃতিচারণা। পড়তাম, আর বিদ্যাপীঠকে ছুঁতাম। এখনকার। তখনকার। তখনও বিদায়বেলা আসেনি।

নাইনে অনুভবই খুব সম্ভব গৌতমদার কাছ থেকে এককপি 'অভ্যুদয়' নিয়ে এসেছিল। রি-উনিয়নের সময়ই বোধহয়। তখন আমরাও অনুভব করছি, যাওয়ার সময় হয়ে আসছে। যারা চলে গেছে। তারা কী বলে। সব্যসাচীদা মারা গেছিলেন আগের বছরই। খুব কষ্টে। সেবছর লেখা বেরিয়েছিল 'অভ্যুদয়'-এ। সব্যসাচীদাকে নিয়ে। আরো কত। স্মৃতি।

'অভ্যুদয়' স্মৃতির চিলেকোঠা। আমরা সেখানে রোদ্দুর ছুঁয়ে দেখছিলাম সেদিন।

আজকে, 'অভ্যুদয়'-এ লেখা পাঠানোর বেলা চলে এল। শক্তিদা 'বিদ্যাপীঠ'-এ চিঠি দিতেন 'প্রিয় অভি,' সম্বোধন করে।

'বিদ্যাপীঠ'-এ আর্টিকল দিতাম। সবাই প্রায় আর্টিকলই দিতাম। কত বিষয়। অথবা কবিতা।

আর 'অভ্যুদয়'-এ। স্মৃতি? হুঁ। হয়ত।

তাই-ই লিখছি। গোছাইও নি।

বিদ্যাপীঠের কথা। বড়ো হবার কথা।

কারণ, বড় হয়ে তো আবার করে ছোটো হতে হচ্ছে। মানুষ হওয়া কী, তা ছোটবেলাতেই বুঝতাম ভালো।

আমার ভালো-ভালোবাসা-ঘর-স্বাধীনতা-বিবেকানন্দ-মানুষ-হওয়া—সব বিদ্যাপীঠ। বিদ্যাপীঠে আমাকে তো ফিরে ফিরে যেতে হবেই। বার বার।

বিদ্যাপীঠ একটা বোধ। একটা আদর্শ। ভিত।

'যাই বলতে নেই। বলো, আসি।'

> "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world."
>
> **–Nelson Mandela**

লেখক বেঙ্গালুরু ভারতীয় বিজ্ঞান সংস্থায় স্নাতকস্তরে পাঠরত।

My School : Remembrance of things past

Niranjan Goswami

Madhyamik 1976

Memory fades and time lapses - yet something remains that one never forgets. My school is not the same as yours, even if you attended the same institution. My school is created in my mind - a mix of imagination, aspiration, memory and apprehension.

We never thought that Vidyapith was like any other school, that its teachers, administrators, monks lived in a socio-political reality that had its pulls and tugs on it. We lived in a bubble - our minds were saturated with dreams; we had our immediate goals: to write an essay, to participate in a recitation competition or in drill demonstration. Will there be a football match with the Sainik School this year? Will our Naga students excel in this year's match like last year? Will Shivaji Platoon be the championin this year's drill competition again? These were our immediate thoughts. We had a class-mate, a local boy from Purulia. He would tell us that his family had extreme left political sympathy - we understood these things only dimly. We also heard the stories of the Naxalites of previous batches who agitated and led to some reforms in the hostel. We were told that many of them did brilliantly in the Final Examination though they were not allowed to appear from the school.

When we were sent up for the Madhyamik, we remained and studied in the school for a few months. We were then called 'candidates.' At this stage we had immense liberties because we didn't have to follow the usual school routine. We were drunk with this newly felt liberty. Though we studied very hard yet there was a propensity to violate discipline. Looking back, now I realize all this desire to violate discipline was normal, a rite of passage. None of us ever really lost admiration for the school, its teachers or the monks. We were fortunate that there were a few wise monks and all our transgressions were forgiven.

There were so many things in our school of which we could be proud. The buildings, the prayer hall innumerable art objects here and there inspired us, elevated our minds. The presence of students from the North-East broadened our minds. The practice of teaching in different mediums of language enhanced the cosmopolitan atmosphere. We could never think of Hindi or Sanskrit as alien languages - nor did English ever dominate our training. It was a judicious mix of languages that informed our minds. It is true that I realized later that our English medium was not as good as those English medium schools which taught English as a first language. But it would not have been possible to have the same set of values in a purely English medium school. It is perhaps possible to improve one's language later but it is never possible to imbibe a set of values outside a particular school.

All recollections of one's school days are of one's friends and teachers and the monks who were there setting a high example before our impressionable minds. But I am not

going to talk about these particulars today. I am talking about the wonder in our lives which a school is. We spend only a few years in a boarding school. The life that we live outside the school is so much longer. Adolescence, romance, marriage, children, family responsibilities, bereavements - most of these events of great importance, take place outside our school lives. Yet when we meet a school friend after a separation of thirty years, we immediately connect; we seem to lose all interest in the intervening years. It seems to us that nothing is more important than our school days.

My school, therefore, remains for me a lost Eden, an enchanted place half grasped, half imagined through the romantic glasses of childhood. Where else could I have formed friendship with tribal students from Arunachal or talented students from Assam or brilliant sportspersons from Manipur? The idyllic atmosphere of Vidyapith with its zoo, dairy, mango orchards, prayer hall and playing fields reminded one of Shantiniketan. However, the very spirit of a Ramakrishna Mission centre is radically different from that of Shantiniketan. Here, a different spirit than that of the poet presided. The spirit of Swamiji, the little that we could imbibe through our daily experience at school, encouraged us to be bold, smart, courageous and patriotic. In other words, it instilled in all of us a leadership quality. That is why those who studied here, all charted a success story.

It is very easy to get out of touch - to lose connection with the school or friends; it is equally easy to come back to the fold. The invisible umbilical cord is never cut. What is so special about Vidyapith that we feel so proud of - for many, the ideology of Sri Ramakrishna and Vivekananda provides a unique system of value that endures through life; for others, the high achievement in terms of results provides an identity for this school in Purulia. Forme my school is different and unique because it is in Purulia - the beauty, uniqueness in culture, landscape, and dialect of which leaves an indelible mark on the school. The terrible heat, drought and diet of 'posto' and dal - would it have been the same if the school were situated in some other district?

Years later, when I was teaching at Darjeeling Government College a group of Chhou dancers were presenting their performance on the Mall. When they were taking those wonderful somersaults in the air and falling on their knees on the hard surface of the Mall, I could hardly suppress my tears. I felt as if those dancers were from my home district, my own men.

It is not sufficient to say that the school has a great education system - inclusive of sports, music, painting, games, pursuing science and so on. We learnt something from the vast expanse, from the huge fields, the great number of leafy trees, flowers, fruits and animals in the school. We did not know then theories of environment, but somebody knew and took care that all that was conducive to the health of body and mind were there.

I have told you about my school, as I see in it retrospect. It is, as I said, fabricated with my imagination with a heady mix of memory. Tell me friends, did I imagine it right?

Author is Prof. of English in Chandannagar College

A Desperate Effort

Jaydip Ganguli

Madhyamik 1985

Before you read any further, dear reader, here is a gentle word of caution. I am not a writer. These words have not been bubbling and churning inside me as I have learned from the experience of myriad writes, exerting enormous pressure inside me to get out and providing a great cathartic pleasure when they do. A phenomenon almost akin to flood water bursting out of an Indian dam, which more often than not does not wait for technology to open its gates but develops helpful cracks to ensure immediate action. These words, rather, I have extracted out of me, by exerting enormous pressure on my feeble mind, goaded by my publisher's repeated assurance, that whatever I write will be published for dearth of enough material to fill the pages. So when you read it, if at all you have the time, and the propensity of reading things,which will not help you even an iota in your future walk of life, then let me be among the first to pledge you my undying gratitude. I write from the irresistible temptation of seeing my words in print not at my cost - a snare used by my publisher to an effect easily as devastating as a promise of large-scale industrialisation by a seasoned politician.

So those of you, who by now have been seized by the absolutely justifiable emotion of not willing to read any further or those who are begin to apprehend the dreaded possibility of being subjected to this onslaught issue after issue can breathe easy. I have literally scraped the very bottom of my literary barrel clean to write this article itself. Any more will have to wait for another lifetime, if I, perchance am born with more talent. And if, since God has not yet ceased to perform an occasional miracle, any of you, after reading this decide to wait with bated breath for more such literary gems, I beg pardon. Please understand that my ability is not enough to repeat this feat any more time, at least during my present tenure on mother earth.

Now that I have addressed the twin burning issues of apology to unsuspecting readers and insuring myself against caustic criticisms, comes the million dollar question - what do I write about? I am not a writer, so I can't build beautiful stories without the backing of a shred of fact.. I am basically an advertising copywriter: someone who can make facts seem beautiful, albeit very mundane facts like a hair cream or a piston ring. Now who's ever heard of great literature being inspired by a piston ring! So what do I do?

As I pause to ponder this unsurmountable barrier, another thought, extremely irrelevant to literary excellence yet equally relevant to my ability, strikes! How have I managed to write this far, and even more astoundingly, how at all have I managed to

keep myself from abject penury by writing sales pitches in English! I have no English Honours or post graduate degree to my credit. In fact I had lived my graduation years beneath the shameful shadow of not having been been able to crack the Joint! In fact, to be really candid, perhaps one of the greatest impartial judgements I have ever made about myself, which prevented me from wasting at least six hours of my largely wasted lifetime, was the decision not to sit for the dreaded exam at all. I was sanguine that far from being able to come up with intelligent answers, I won't even be able to make sense of most of the questions, if not all of them. After which I took up commerce even though I had no love for that subject. In fact I was absolutely amazed at having passed the exam at all. So then, this being the state of affairs, where did my English come from?

It came from two sources: the reading of it from a student and the love of it from a teacher. And both were frowned upon when they did. My classmate Siddhartha, more famous (or infamous) for his grey tent-sized chador which I can vouch was never introduced to soap or water during its entire lifetime, had more to him then its smell and horribly repulsive colour. He was an avid reader of English books, except the text ones. It was to him that, when we were both in class VI, that I had professed my satisfaction at reading my first English story book (from Hitchcock's Three Investigator series). From then there was simply no stopping him! A vacation would never end but with him bringing a literal bag full of wonderful English story books for me. I also kept up my end of the barter, and thus we would begin every post vacation term with about thirty-forty books to go through. Books that introduced me to a very wide spectrum of facts and feelings, from the charm of the English language to the way world politics run. The pile of text books and exercise copies on our desks progressively climbed higher and higher in proportion with the teacher's podium, not as a testament to our studiousness, but to hide the open storybooks from the hawk eyes of the teacher supervising our study. One day it was different when the wonderful Satish Da stood up at his desk during study and I hastened to hide the story book I had open before me. 'You don't have to do it. I personally feel reading story books is a wonderful habit,' he said; a beautiful gesture which warms my heart even today.

But I am transgressing from the topic. I had spoken about the influence of a student and a teacher. The student has been described. But the teacher? This is where the finger pauses inadvertently on the keyboard, where goosebumps break upon my skin, and where an insidious lump forms somewhere in the pit of my stomach and rapidly climbs up to choke my throat. This is where I am at a loss. Because, even after writing millions of English words over a period of thirty years, even after reading, literally devouring, thousands of English books of myriad authors, I don't know the word that can describe

what this person was to me. Though I know that the word teacher describes just a small, very small, part of it.

Teachers as a whole constituted the maximum portion, if not the entirety, of the Vidyapith effect that has till date made me blend into the society at large and even stand out among crowds with embarrassing frequency. I blush at the memory of those countless times when the knowledge that I was from Purulia Ramkrishna Mission had brought about a new light of admiration on the faces of assembled crowds. They all had, then onwards, sneaked expectant glances towards me, ready for those moments when I would, by some gem of word or action, prove my mettle and give them some life-changing experience to take back home. And such is the charisma of the school, that even when (as expected) I have failed to rise to the occasion with unfailing frequency, it hasn't changed their optimistic expectation from me. I hate to tell them that they will only realise the futility of their wait when either they or I meet the maker, because, being human, I relish the little bit of admiration that at times come my way, however misconstrued. But again I am being guilty of transgression.

Teachers of Vidyapith! Thankfully this magazine will be read by people who are either present, or ex-students of Vidaypith or in some way well associated with it. Thankfully, since my ability though will fall far short of describing them, it will not hinder them from instantly understanding what I want to say. They are probably already nodding their heads. Because all who have studied here, at least till the time I passed out, know what I am trying to say - the sheer wonder that these four words depict - the teachers of Vidyapith! Their dedication, patience, love, knowledge, their amazing pleasure at our success and frustration at our failures, their silent displeasure whenever any of us were punished for something they thought we were innocent of, their absolute imperviousness to our mind boggling array of mischiefs, their way of going out of the way to give us much much more then what they were supposed to. Sushil Da chasing us from five in the morning with bunches of neem leaves so that we could fall into the habit of taking a few every morning, Rashbihari da passing me story books since he knew of my love for them, Subrata Da, the unsung librarian, who opened the wonderful world his entire library to me at great personal risk, Perumal Da, so disturbed at my horrible Maths marks in class ten half-yearly that I was more alarmed for his well-being than my performance, Bhola Da, who never lost his smile (though he was always struggling his utmost to hide it and present himself to us as a stern and forbidding warden) despite his job of living day and night with us resembled more the job of a zoo-keeper than a dorm warden. That unforgettable experience when Dilip Da, frustrated with a Bengali syllabus that only allowed us a few lines of Mahabharat by Kashiram Das that painted Duryodhan

as the villain, suddenly exclaimed that to Rabindranath he was a great statesman whose only fault was his ambition, and the determination to pursue it at any cost. And then had come those mind-boggling couple of periods, when he had made us close the doors and windows of our class and recited to us the entire Gandhari's Abedon. How a man, with a congenital defective way of speech that made him slur every word, brought alive through a sheer force of passion, the helplessness of Dhritarashtra, the corrosive all-consuming anger of Duryodhan, the excruciating agony of Gandhari. It was this act that has made me read Gandharir Abedan at least fifty times till date, and keep a Sanchayita always within my reach.

If I haven't named a large number of my teachers in the last paragraph, it is because of shortage of space and memory, and nothing else. So many of them had touched our lives in so many special ways, it is humanly impossible to describe it in its entirety. The teachers of Vidyapith - perhaps saints, perhaps guides, perhaps beacons - but definitely much much more than teachers.

So one can well imagine the mettle of someone who can stand out even among people like these. Such was the man, or rather a young boy of about twenty five who joined Vidyapith as its youngest teacher when I was perhaps in class six or seven. Too young to even understand his encyclopaedic knowledge of his subject or his passion for it. But old enough to feel the astonishing tenderness he had for us the students, and the love for everything that embodied a Ramakrishna Mission school. The first class he took of ours also made us understand one thing very clearly - here was a teacher whose approach to teaching was different. And as each day went by, one thing became clear to us. Shakti Da was different in many more ways than a way of teaching the language of English.

I could understand within the first few days of our interaction that Shakti Da liked me, but it took me thirty years to understand why. It was also that long a time that I took to understand the extent his influence on me. All those things about him that had struck me most throughout my Vidyapith years, now come back to me in bits and pieces.

This freedom to learn, or rather, the lack of it was another of Shakti Da's constant grouses against our way of education. Time and again he used to exclaim that our system of education taught us everything but the way to learn! He said that this would be the chief impediment after our tenth class, when there won't be teachers anywhere as dedicated as we now have. We'd have to fend for ourselves in the great amphitheatre of education, perhaps no less fearsome than the Roman ones. And then we'd have to learn to learn by ourselves. Already too precocious for my age, I hadn't cared enough to even try to understand it then, but Shakti Da, if you are reading this, please know that

somehow I never stopped learning. My childhood precociousness had grown alarmingly, ultimately taking me to the very brink of destruction. When I pulled back and took up the reins of my life, in my mid-thirties, my contemporaries were already in the middle of their careers, enjoying the fruits of their labour. But even then, whatever I am today, it is far more than I ever dreamt possible or actually deserve to be, having almost completely wasted my golden years. And the only thing that stood me in good stead during my journey of recovery was what you had said. For even in my worst times, I had never stopped learning. The germ planted in the little boy of thirteen had grown into an insatiable hunger for reading anything English. I read. And I learned. Then one day I discovered that not only can I read, I can also write. And that's what I have been doing since then.

Shakti Da's memory doesn't stop there. My fingers grow tired trying to keep pace with the speed and numerosity with which they crowd me now. I remember his habit of dropping into the hospital every afternoon. One of them coincided with me being there with a fever (genuine, I swear, to all those classmates on whose lips I can see the beginning of a crooked smile). I asked him for a packet of chanachur to fight the constant bad taste in my mouth from the ailment and antibiotics. The very next evening he brought it, and when I wanted to pay, I remember his affectionately caustic answer 'Mudra amar kacheo achhey.' I remember his futile fight for Kiriti Da's life, a silent fourth class staffer whose silence had been his undoing. The man had been bitten by a dog but had kept silent about it, trusting local quackery over modern medicine. Subsequently, when he was struck by rabies, I remember how Shakti Da used to rush to Purulia General Hospital every day, trying to make him live when science told him otherwise with unfailing certainty. I remember him stepping behind the closed doors of his bath-room when informed of Kiriti Da's death. We all knew then that he was crying. But what I know today is that Kiriti Da wouldn't have died had he told Shakti Da of the dog bite when it happened. I know he wouldn't have gone back with the advice of taking the required injection, but he would have had the injections given to him, the cost gladly being borne by Shakti Da.

Knowledge and compassion were not the only things I remember him by. I remember him also for his passion for my success, which was by any measure much much more than I had. He taught me how to debate, he taught me elocution. I remember his enthusiasm when he got me to participate in a district level debate, and his tension over the result. And when they were announced and I came first, for a man who was always among the quietest and the most reserved, I'll never forget his first few moments of wild jubilation. The next step was a state-wide debate to be held in Kolkata. He had already

begun to prepare for it when I told him that I wouldn't go. Our annual drama was coming up and I didn't want to miss my role there for a debate. He was very bitter about it. He said he couldn't understand how acting before an audience of Vidyapith could be more attractive than competing in an illustrious Kolkata debate. But ultimately he didn't stop me, though he by then easily had the authority to do so. Even then, what he was giving me, was the freedom to make my own decision and live with the consequence.

One good thing about this article, though it has taken place entirely through happenstance rather than literary dexterity on my part, is that I've been able to save the best for the last. It is Shakti Da's immense contribution to the art of teaching us Englsih. It began when we were about to become mute sufferers of a deadly boring poem - Quality of Mercy - by none other than William Shakespeare. Shakti Da spent the first few minutes trying to teach us the poem as befitted students whose sole mission was to get as many marks as possible. Suddenly he had enough! He said that someone had once remarked that the surest way to make even Tintin a boring read was to simply include it in a syllabus! And then began the phenomenon which, despite the then mantra of taking up science in higher secondary and cracking Joint Entrance, despite the then threat of joblessness that loomed at the end of any other literary pursuit, took root inside me. The phenomenon that ultimately shaped my destiny, that made me able enough to earn my bread by doing what I am doing now; writing my way to monthly cheques that not only pay for my food and family, but even my petrol and internet bills. That made fate, decide that, I, for better or worse, would become a writer in the English language.

It was that poem, actually destined to make Shakespearean literature an object of utter hatred among students without the means to avoid it, that made Shakti Da put down the book and take up Shakespeare. It was then, class after class, despite the cardinal sin of not teaching us ways to gain more marks, Shakti Da unveiled the charm of a writer whose words has moved millions of hearts through countries and ages. He told us how the witches had enticed Macbeth to a destiny of destruction, how he had exclaimed 'me thought I heard a voice cry..' after slaying the king, how Lady Macbeth had lamented that all the perfumes of Arabia could not erase the smell of blood from her hands. He told us how Shakespeare had conjured the image of sleep that continued to elude Macbeth, of the the timeless soliloquy 'tomorrow and tomorrow and tomorrow...' that burned its way into my memory. We journeyed with him to the Rome of Caesar, to Mark Antony's pun-filled speech that roused it to rebellion. And till my last day at school, he never stopped it with me. I remember once, when I had made some unexpected mistake in one of my class tests, he had written, in red ink, at the very top of the page, 'Et tu, Brute', and had taken great pleasure in explaining the significance of the line when

I asked him its meaning. While writing this, I can still sense the bitter taste of regret that I had felt when the constraints of time and marks had made him revert back to the syllabus mode.

Though it was Shakespeare, or rather his introducer, who really made me fall in love with the English language, I am yet to read him. I had started once, and to my utter amazement, found that I could actually easily understand his words and even his spirit. Still, I regret to admit, I am yet to read the bard in its entirety, though I know someday I will. But even today, I can easily slide into any layman's discussion on him, keeping my end up with generous quoting of his lines and expressions, and get away with it. People have looked at me with unabashed admiration, their expressions clearly stating their thinking that if all this could come out from just scratching the surface, to what untold depths my knowledge of the bard runs to! Little realising that what I say is not the tip of the iceberg but the entire north pole - it is the entire sum-total of my knowledge about Shakespeare, gleaned not from reading him, but from listening, with bated breath to a wonderful man trying to initiate us into the wonderful writings of another.

It has taken me thirty years to realise the enormous positive effect that Vidyapith, its teachers as a whole and Shakti Da in particular, has had on me. And it took a very short, on time-snatched-from-official-work visit to Vidyapith to meet Shakti Da, to understand what he had seen in me. When he rushed out of school and told me something which he knew he couldn't have told me when I was studying there - it would have gone straight to my head and done me more harm than good. He said that I was, I still blush at the memory, 'the most creative boy' he had come across. And then I understood what it was that had always made me feel that he always held me in special attention during my school days. It was the joy of a true teacher, at finding someone who, he felt, had the capacity to learn all those things that the syllabus and the system restrained him from teaching us.

I hope, Shakti Da, that you're not reading this. Being what you are, this will cause you more embarrassment than pleasure. You'd be apprehensive of the limelight that this article might flood you with and nonplussed at being praised for something which you feel was nothing more than duty and humanity. . But then pardon me. Understand that this is not meant as an eulogy to a great teacher or a great man. It is a desperate effort by someone, thirty years too late, to express his gratitude for a teacher who shaped his destiny.

Author is Kolkata based Head-Corporate & Advertising Communication, Shyam Steel Group

Purulia Ramakrishna Mission—My memories

Somrita Mazumder

Childhood's fond memories, one such place that has given me the abundance of such fond and beautiful moments is Purulia Ramkrishna Mission. Yes you got it right, it's the boy's boarding school. You must be wondering how I being a girl have fond memories of a boy's boarding school and that too Ramkrishna Mission. To clear the confusion let me introduce myself, I am Somrita Majumder daughter of Mr. Dibyendu Mazumder, batch of 1966. I have been asked by my father to pen down my memories of his school that I often visited during the official re-union meets with my family.

Ramakrishna Mission Belur Math has always been very close to me and I have been a regular visitor there since I was an infant. Sri Sri Ramakrishna, MaaSaroda and Swamiji has always been worshipped at our place and their teachings was introduced to me at a very young age. I paid my first visit in Purulia Ramakrishna Mission in the year 1997. It was during the winter month, December. We reached early in the morning and there was a bus which came to pick the entire gang to school. The premises of the school is very similar to that of Belur Math and so is the silence, serenity and calmness. As I start sharing my memories one person who has always inspired me is Swami Ramananda Maharaj, this was the first time I had met him. He was my father's teacher in his school days. My mother always complained me of being a truant child and, I seriously lacked concentration while studying. My mother who had known Swami RamanandaMaharaj from before shared her troubled situation with him. He in return spoke to me very calmly and asked me very clearly of what all the things interests me? He also asked me a very funny question and that was what are the thoughts that come to my mind when I sit to study? To his this questions I had no answer as who keeps a tab of all the weird ,unnecessary thoughts that crosses one's mind specially a child's mind while studying. He did not ask for any explanation or dint give me any advice that would disinterest me. Instead he gave me three very handy books and they were teaching of Sri Sri Ramakrishana, MaaSaroda and Swamiji. He just asked me to read a few page of the books before I start my studies every evening. Little did I realise then what the implication of this exercise be. I am ever so grateful to him cause it not only did calm my mind and increased my concentration. It also helped me to understand the world and its practices in a very different way. It completely changed my thought process. I will be ever so obliged and thankful to Swami Ramananda Mahaaraj for it.

I have heard many stories of my father's experiences, mischief's and adventures during his school days from him. One such story of their mischief goes somewhat like

this. He and his friend's had planned to watch a movie in the evening at town since the Secretary Maharaj, Hiranmayonanadaji would be travelling to Kolkata for some work. My father being the smarter one had reached town earlier to organise the tickets and his gang was to follow soon. But as the luck would have it the Secretary Maharaj was returning to the school all of a sudden. And to one's surprise he did spot the group running through the fields and at once was certain that the boys were from his school. He concluded to the judgment really soon as he was clear that the tall guy in the group was Late Tapan Chatterjee. Tapan Kaku again was a wonderful and humorous person. We shared many jokes and moments together. A very dear friend of my father. Wherever you are kaku, your soul may rest in peace.

Another story that I heard from my father was once there was a very heavy hailstorm in Purulia at evening so much so that the ice pieces dint melt till early afternoon the next day. Baba has always been fond of photography and dint leave such a moment uncaptured. I have seen the photograph myself, may be if my article is getting published in the souvenir then he will attach the picture. The re-unions have always been fun, enriching and exciting, except the Sunday morning meetings, which I used find awfully boring. There were football matches, chou naach, food and hullor.

I can keep writing pages on my memories in Purulia Ramakrishna Mission but strangely I cannot, as I'm space bound in the article. The most important thing that Purulia Ramakrishna Mission has given me is my father's friends, the bond, and the love. His friends and their families are our families who stood by my father and me for so many years and they still do. I would have liked to name all of you here but then it would become too very personal, but if you all are reading this, you all would know who you all are. Thanks for being a part of our life.

Author is daughter of Dibyendu Majumder, Ex. student of 1966.

জলের জঙ্গলে

পেশার নেশা

অয়ন ঘোষ

মাধ্যমিক, ১৯৯০

সুন্দরবন বিষয়ে কিছু লেখার আগে বারবার যা মনে হচ্ছে সেটা আগে বলে-নি, প্রথমতঃ সুন্দরবন নিয়ে বহু বিদগ্ধ মানুষের বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে। আমার নগণ্য অভিজ্ঞতা দিয়ে কিছু লিখতে যাওয়া তাই বাতুলতা। আমি যাদের জন্য বা যাদের কথা ভেবে আমার কথাগুলো বলছি তারা আমাদের জঙ্গলের চারপাশের খেটে খাওয়া মানুষ। তাই ছোটখাটো ভুলভ্রান্তিগুলো তারা বড় করে দেখবে না। সুন্দরবনের 'সুন্দর' কথাটাতে পরে আসছি। আগে আমার সঙ্গে 'বন'-এর পরিচয়টা সেরে নি। জন্মসূত্রে পুরুলিয়া জেলায় থাকার সময় দেখেছি আমাদের স্কুলে বনমহোৎসব হত। সালটা সত্তর এবং আশির দশক, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম সেজে আমরা প্লাস্টিকের ঠোঙায় ভরা গাছের চারা লাগাতাম। পরে জেনেছি ওটা Polypot raised one year old seedling. সেই সময় দেখতাম বরাকর রোডের দুই পাশে কংসাবতি-১ বনবিভাগ-এর সাইনবোর্ড দিয়ে ইউক্যালিপটাস এবং আকাশমণি গাছ লাগানো হচ্ছে। বেড়া হত Ipomea দিয়ে। সেই সময় অযোধ্যা পাহাড় বেড়াতে গিয়ে দেখেছি শাল, মহুয়া আর পাইন গাছের জঙ্গল। সত্যি পুরুলিয়া জেলায় পাইন গাছ, ভাবতে অবাক লাগে, ওটা যেন হিমালয় মহারাজের নৈতিক সম্মতি। স্কুল কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে হঠাৎই বনবিভাগে ঢুকে পড়লাম। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জঙ্গল ও মানুষ দেখলাম, এই চাকরীর প্রায় এক দশকের মাথায় সুন্দরবনের সঙ্গে পরিচয় হল কোমর অবধি কাদায় আটকে গিয়ে। বুঝেছিলাম এখানে মানুষ এবং কর্মচারীকে কতটা সংগ্রাম করে জীবন কাটাতে হয়। বিচিত্র এই সুন্দরবনের জীবনযাত্রা, সারা ভূ-ভারতে এর জুড়ি মেলা ভার জোয়ার ভাটায় রোজ জল প্রায় প্রতিদিন গড়ে ৮-১০ ফুট ওঠানামা করে। গাছ লাগাতে হলে থলথলে পাঁকে নেমে বড়োজোর চার ঘন্টা সময় পাওয়া যাবে। তার ওপরে রয়েছে ঢেউ-এর ধাক্কা। তবে একটু বড় হলেই এইসব বাদাবন ঢেউ সামাল দেওয়াতে ওস্তাদ। ২০০৮ সালের অতবড় আয়লায় কলস ক্যাম্পের ভিতর কোনো প্রভাবই পড়ল না, শুধুমাত্র বাদাবন ছিল বলে।

জীবন এবং জীবিকার স্বার্থে এখানকার মানুষ সম্পূর্ণভাবে জলনির্ভর। প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ মৎস্যজীবী। কেউ ছোট নৌকা নিয়ে কাঁকড়া ধরে, মেয়েরা বাগ্‌দা মিন। আবার ট্রলারগুলো তীব্র গতিতে সমুদ্রের দিকে বরফ বোঝাই হয়ে ছুটে যায় আর ফেরে নানান ধরণের মাছ নিয়ে। ট্রলার কিন্তু আবার নদীর তলদেশ ঝেঁটিয়ে নিয়ে যায়। দেশে অনেক আইন, অনেক বিধিনিষেধ, যার বেশির ভাগটাই সাধারণ মানুষ জানে না, বা জানলেও মানতে পারে না। পেটের জ্বালা আনে লোভ। হয়তো বা দুটোই। এই আরো পাওয়ার আকাঙ্খায় দিনের পর দিন কত জেলে নৌকা, ট্রলার সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে রাণী রাসমণির দয়ায় যাতায়াত করে, তার সঠিক পরিসংখ্যান দেওয়া ভার। তবে তা হাজার হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এযাবৎকালে জেলে নৌকা, ট্রলার একটু কমই দেখছি, কারণ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার জল, খাবার, বরফ নিয়ে মাছ ধরতে ঢুকে শূন্য হাতে ফিরতে হচ্ছে। 'মাছ নেই', 'মাছ নেই', এই টাকা আবার ধার (দাদন) দেয় মহাজনেরা, চড়াসুদে। কিন্তু কেন মাছ নেই? সুন্দরবন হলো মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ক্ষেত। তবু যে কারণগুলো বারবার মনে হয়—এক ঃ যে

তিনমাস মাছ ধরা বন্ধ রাখা উচিৎ তা মেনে চললে হয়তো ভালো হত। দুই ঃ জঙ্গল সংলগ্ন অঞ্চল, যেখানে বাদাবনের গাছের পাতা পচে জৈব খাদ্য তৈরী করে সেখানেও লুকিয়ে মাছ ধরা বা চরপাটা জাল দেওয়া। তিন ঃ ভবিষ্যৎ না ভেবে শুধুমাত্র বর্তমান নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় বেশীর ভাগ মানুষ। হয়তো খানিকটা দোষারোপ করা হয়ে গেল। খেটে খাওয়া মানুষ প্রতিমুহূর্তে যাদের শুধুমাত্র বেঁচেবর্তে থাকার জন্য সংগ্রাম করতে হয়, কখনো একটু মিষ্টি জলের জন্য, কখনো বা একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য।

মানুষকে ভিটে ছাড়তে বলা বড় বালাই। কিন্তু এটা তো বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুমান অথবা ভবিতব্য যে সুন্দরবনের জলতল প্রতিবছর একটু একটু করে উঠে চলেছে। নদী গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে চাষের জমি, বসতবাটি, নদীবাঁধ দিয়ে যাকে ঠেকানো সম্ভব নয়। আবার এত মানুষকে ছোট্ট এই তরণীতে ঠাঁই বা দেবে কোথায়, অগত্যা কপাল অথবা ভগবানের দোহাই দিয়ে বসে থাকা। যদিও জানি ৮০ শতাংশ সুন্দরবন ২০৫০ সালের মধ্যে জলের তলায় চলে যাবে, এ তথ্য বিশ্বব্যাঙ্কের।

অস্ট্রেলিয়ার একটা সভার কথা আজ বারবার মনে হচ্ছে, whale shark একধরণের কামট সমুদ্র থেকে নদীতে ফিরে এসে ডিম দিত। হঠাৎ জেলেদের মাথায় এল এরা তো তাদের গর্ভবতী কন্যাসন্তান এর মতো বাপের বাড়িতে এসেছে। এদের বাঁচানো তাদের দায়িত্ব। অমনি কামট জালে ধরা পড়লেই তা তারা ছেড়ে দেওয়া শুরু করল।

জানি না কী লিখলাম। জানি না যাদের কথা ভেবে লিখলাম তাদের কিছু বোঝাতে পারলাম কিনা তবু মনে আশা জলের জঙ্গল আর মানুষ জঙ্গল নিয়ে যুগ যুগ বেঁচে থাকবে, বেঁচে থাকবে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন ও জীবিকার স্বার্থে।

যা লিখছিলাম হঠাৎ করে থামিয়ে দিতে হয়েছিল কারণ জল থেকে ডাঙায় ওঠার সময় হয়ে গিয়েছিল। সুন্দরবনের অরণ্য জীবনের এক মজার বৈশিষ্ট্য হল দীর্ঘ সময় ও পথ জলযানে অতিবাহিত করা আর হঠাৎ করে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া, কিন্তু 'সিধেল চোরের' গল্পটা না বলে শেষ করলে একটা অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে বলে মনে হচ্ছে বার বার। ২০১২-র এপ্রিলের গোড়ার দিকে একদিন দুপুর ১২টা নাগাদ হঠাৎ ডি.এফ.ও'র ফোন, একজন খুব মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হেড়োভাঙা পৌঁছাতে হবে। অগত্যা সারথীকে খবর দিলাম। তিনটে নাগাদ সারথী তার রথ নিয়ে রওনা দিল ঝড়খালির দিকে। রাত আটটা নাগাদ পৌঁছালাম হেড়োভাঙাতে, সহকর্মীরা জানালো সামনের জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে আমার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং বিধেয়। উদ্দেশ্য জাল দিয়ে প্রায় আট কিলোমিটার এলাকা ঘিরে দিতে বললাম। বলিহারি সব বন দপ্তরের কর্মীদের। ওই রাতেই সব নেমে পড়ল এলাকা ঘিরে ফেলতে। নদী বাঁধের ওপর রাত কাটিয়ে সকালবেলা জাল পর্যবেক্ষণের সময় চোখে পড়ল দক্ষিণের জাল খানিকটা কাটা। অর্থাৎ চোর সিধ কেটে বেরিয়ে গেছে। একটু হেঁয়ালি করে ফেলছি মনে হয়, আদতে এক বাঘিনীর (পায়ের ছাপ দেখে অনুমান) কাহিনী বলতে বসেছি, সহকর্মীদের সাথে আলোচনা করে বাঘ রাখার খাঁচা পাতা হলো অগত্যা। ভিতরে রাখা হল আস্ত এক ছাগল আর খাঁচার বাইরে মুরগী, আর মাঝে মাঝে হেঁতাল জঙ্গলের মধ্যে লম্বা ২৫ ফুটের ঘরাঞ্চি দাঁড় করিয়ে অভিপ্রেতকে খুঁজে বেড়ানো, খুঁজতে খুঁজতে পাওয়া গেল পায়ের ছাপ, যাকে আমরা বলি 'পাগ মার্ক', আর সেটা পাওয়া গেল প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার উত্তরে নদীর পাড়ে বাদাবনের জঙ্গলে, বাদাবন উপহার দিল

হেঁতাল কাঁটার অসংখ্য খোঁচা। সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করে কাঁটা এবং জাল সরিয়ে আনা হল। আবার নতুন করে খাঁচার ভিতর ছাগল আর বাইরে মুরগী। আবার প্রায় ৮-১০ কিলোমিটার নতুন করে জাল দিয়ে ঘেরা। এই দক্ষযজ্ঞ অবলীলাক্রমে হেরোভাঙার কর্মচারীরা সেরে ফেলল ২-৩ ঘন্টার মধ্যে। হেড়োভাঙা নদীতে এবার লঞ্চে প্রতীক্ষার পালা, কারণ সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, মনে মনে খুব চাইছিলাম বাঘিনী কিছু একটা খেয়ে আমাদের এযাত্রা উদ্ধার করুক। সারারাত তিনখানা নৌকা নিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে কাটালাম, যদি তিনি গ্রামের দিক থেকে হেড়োভাঙার জঙ্গলে যাওয়ার সময় দেখা দেন, আজ বেশ চিন্তামুক্ত লাগছিল, কারণ গ্রামের দিকের বাদাবনের তিনদিক দুইসারি জাল দিয়ে ঘেরা আছে। জলে তাকে আবার নামতেই হবে নচেৎ খাঁচায় পড়তে হবে, কিন্তু না, তেমনটা হল না। ভোরবেলা আবার সকলকে নিয়ে নেমে জাল এর অবস্থা দেখতে বের হলাম, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না কারণ তখনও জোয়ারের জল নামেনি, ঘন্টা দুয়েক অপেক্ষার পর জল সরার পর দেখলাম সিঁধেল চোর আবার জাল কাটার চেষ্টা করেছেন এবং খুঁটি সুদ্ধ উপড়ে ফেলেছেন। কিন্তু তারপর যে আরেকদফা জাল আছে বোঝেন নি। লম্বা পা ফেলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় জালে জড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ লাফালাফি করে জাল কেটে নদীতে নেমেছেন, এবং আমাদের সাথে দেখা না করেই উঠেছেন হেড়োভাঙার জঙ্গলে। মাঝে পেরিয়েছেন পায়ে হেঁটে কাঞ্চনচর। একটা সুখের অনুভূতি এল। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। কারণ তিনি আবার যদি গ্রামের পাড়ে ওঠেন। তাই আবার দিনরাত্রি নদীতে ২-৩টি নৌকা নিয়ে কাটালাম। গল্পটা বেশ লম্বা হয়ে যাচ্ছে, শেষ করতে হবে। এরপর সেদিন রাতেই আরেকটি নদী পার হয়ে তিনি গিয়ে উঠলেন পীরখালির জঙ্গলে, এও কিন্তু পায়ের ছাপ দেখে বুঝেছি। এবার কলকাতা ফেরার পালা, আমি ফিরছি... ... ...। একটু মনটা খারাপ। তিনি দেখা দেননি এই চারদিন, একটু দেখা দিলে ক্ষতি কী ছিল?

লেখক WBFS আধিকারিক । বর্তমানে বিভাগীয় বনাধিকারিক, পাঞ্চেত বনবিভাগ।

"Intelligence plus character–that is the goal of true education."

–Martin Luther King Jr.

RAMAKRISHNA MISSION VIDYAPITH
P.O. VIVEKANANDANAGAR, DIST. PURULIA-723147
(A branch centre of Ramakrishna Mission, Belur Math, Howrah, W.B. 711202)
Phone : Code : 03252-202877, 202883, FAX No. : 202868
e-mail : rkmvpurulia@gmail.com; website : www.rkmvpurulia.org

Ref. No. 037/14 Date- 08-05-14

Sri Anindya Sundar Ghosh
Joint Secretary
Purulia Ramakrishna Mission Vidyapith Alumny Association
For Batch1978-1985
9/1 Akrur Dutta Lane, (II Flr), Kolkata- 700 012

Dear brother,

With heart-felt gratitude we acknowledge the receipt of your precious donation of Rs.4,05,000/- (Rupees four lakh five thousand) only for distribution among the non-Government Group D Staff of Vidyapith working almost continuously for 5 years or more either as permanent, temporary or casual basis. Really it moves our heart, if not filled with utter joy and satisfaction, to see that our former students developed such fellow-feeling in this materialistic age in spite of their heavy responsibilities at homes and for their kith and kin. Swamiji once said " so long as the millions die in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who having been educated at their expenses and pays not a least heed to them.'' Bravo! You did not prove to be like those common run. Obviously we are proud of you.

We enclose herewith a money receipt bearing No. 00071 dated 12-04-14 for your sweet record.

May the blessings of Sri Sri Thakur, Ma and Swamiji be showered on you and us all incessantly.

With deep love and best wishes,

Yours in the feet of Swamiji,

Jn. Jnanalokananda

(Swami Jnanalokananda)
Secretary

Enclo: 1 money receipt.

"বিদ্যাপীঠের তরুলতা মুগ্ধ করে মন..."

Alumni Association Executive Committee : 2013-15

Designation	*Name*	*Batch*
Chief Patron :	Swami Putananda	
President	Dr Tapendro Mullick	1973
Vice Presidents	Samir Kumar Payne	1966
	Ranjit Kumar Mukherjee	1968
	Dr Partha Banerjee	1977
	Dr Dinabandhu Kundu	1980
	Agnimitra Biswas	1986
General Secretary	Sanjay Chattopadhyay	1988
Joint Secretaries	Rana Sengupta	1983
	Anindyasundar Ghosh	1985
Assistant Secretaries	Satyajit Raychaudhuri	1995
	Subhasis Mondal	2002
	Subhankar Maity	2005
	Dhrubajyoti Konar	2007
Treasurer	Subhas Chowdhuri	1966
Assistant Treasurer	Jyotirindra Dhar Chowdhury	1973
Cultural Secretaries	Jayanta Bhattacharya	1971
	Nilanjan Bhattacharya	1989
Magazine Secretaries	Debasis Ghosh **2**	1985
	Chayan Chakrabarty	2005
	Manas Sarkar	2007
Webmasters	Chirantan Kundu	1988
	Indrajit Raychaudhuri	1992
Liason Officer	Sanjib Mukherjee	1968
Members	Dr Dhruba Marjit	1961
	Partha Chatterjee	1961
	Dipak Adhikary	1966
	Subhas Chatterjee	1975
	Pranab Mahato	1977
	Siddhartha Dutta	1982
	Banibrata Nayek	1986
	Arindam Bhattacharya	1987
	Riju Basu	1992
	Dr Bisanka Biswas	1993

With Best Compliments From :

PREMIER KNITWEAR

MANUFACTURER OF 100% COTTON
Hosiery Goods

70B, SURYA SEN STREET
KOLKATA - 700 009
PH-2241 8534

With Best Compliments From :

I.S. GRAPHICS

EXCLUSIVE COMMERCIAL
&
TEXTILE DESIGNER

55/3, ALTARA ROAD (LISHUBAGAN),
BHADRESWAR, HOOGHLY
Ph. : 9433144119, 8420350677, 7278789442
E-mail : santosh.saha40@yahoo.com

With Best Compliments From :

PADMAVATI INVESTMENT LIMITED

9/1, R.N. MUKHERJEE ROAD,

KOLKATA – 700001.

Phone : 22427398

With Best Compliments From :

JPM MERCHANDISE AGENCIES LIMITED

9/1, R.N. MUKHERJEE ROAD,
KOLKATA – 700001.
PHONE : 22427398

With Best Compliments From :

AN EX-STUDENT OF 1985 BATCH

With Best Compliments From :

AN EX-STUDENT OF 1986 BATCH

With Best Compliments From :

AN EX-STUDENT OF 1973 BATCH

Wishing all Ex-students of our school a memorable Re-Union with old friends.

JYOTIRINDRA DHARCHAUDHURI

Ex-student (1973)

Seasons' Greetings to all Monastic members, Teaching Staff members, Non-Teaching Staff members, All others Associated with our school. Wish you a Very Happy and prosperous New Year 201 !

Wishing all students a successful and glorious academic year 2012.

With Best Compliments From :

Dr. ALOKE DAS

Goverment Contractor (Civil)

4, Lal Mohan Bhattacharjee Road
Kolkata - 700 014
Phone : 9830293174

With best compliments from :

BHARAT ENGINEERING WORKS

16, RISHI BANKIM CHANDRA ROAD
KOLKATA-700028
PHONE – 033-2579-0052

With best compliments from :

GUHA ALUMINIUM FABRICATION

76/27, RISHI BANKIM CHANDRA ROAD
KOLKATA-700028
PHONE – 033-2579-0053

With Best Compliments From :

SOOR - O - JHANKAR
SANGEET MAHAVIDYALA

Imparting Music Education in its various branches since 1968

143, L.I.C. TOWNSHIP
MADHYAMGRAM, KOLKATA – 700129
PHONE : 2538-3455

An Organization Affiliated to :
PRAYAG SANGIT SAMITI, ALLAHABAD
PRACHEEN KALA KENDRA, CHANDIGARH
&
SASTRIYA SANGIT KALA PARISHAD, KOLKATA

With Best Compliments From :

RG

Rangoon Glass Center

Dealers in :
Modi Guard Float Glass & Modi Guard Mirrors

10, OLD CHINA BAZAR STREET, KOLKATA
Phone : 2242 0666 / 7580

With best compliments from:

ACHINTYANARAYAN PANDIT

M.A.

[1968 Batch]

Proprietor: M/s. RIVER ENGINEERS
CLASS I – CONTRACTORS OF I. & W. D.
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

13/1, BIPIN PAL ROAD, KOLKATA – 700026
PHONE : 033-2464 0135
MOBILE : 9433891493

With Best Compliments From :

PEECO®

PEECO HYDRAULIC PVT. LTD.

AMBICA KUNDU LANE, RAMRAJATALA
HOWRAH – 711 104 (W.B.)

Gram : 'Oildrolik' Santragachi.
P.O. : Howrah
Phones : (O) 2627 – 0717/1425
Fax : 033 – 266 772 26, 033 – 266 026 99

An Ex – Students Enterprise
ARIJIT LAHIRI (1962)

With Best Compliments From :

Phone : (W) 2522 0662
(R) 2554 2930
Fax : (033) 2521 3743
E-mail : mmp.spayne@gmail.com

MAK METALS PRODUCTS

Aluminium Door, Windows, Partition, False Ceiling and Railing etc.
and
Aluminium Architectural Building Products.

6, G. C. GHOSH ROAD (PATIPUKUR)
KOLKATA - 700 048

Prop. SUJIT PAYNE
(Batch - 1968)

I am the Mother of the wicked,
As I am the Mother of the virtuous.
Whenever you are in distress,
Just say to yourself, "I have a Mother".

Sri Sri Ma Sarada

With Best Compliments From :

SARADA STONE CRUSHER

Supplier of premium quality black stone chips for construction and allied purposes

Works & office at:
SILDA, PASCHIM MEDINIPUR, (W.B.)
Dial: 03221-252239/252411
e-mail: dipmalik@sancharnet.in

With Best Compliments From :

AUSADH VYAPAAR PVT. LTD.

(Pharmaceutical Distributor)

1/103, GARIAHAT ROAD
(103 JODHPUR PARK)
KOLKATA – 700 068
Phone : 2423-7929, 2423-7550
Mobile :
e-mail : amitavanath@sify.com

প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন ঃ

আধুনিক বস্ত্র সম্ভারের
একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

নিউ ছায়া স্টোর্স

২৮, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কোলকাতা — ৭০০ ০০৯
ফোন ঃ ২৩৫০ ২৯১৭
(শিয়ালদহ উড়ালপুলের সম্মুখে)

প্রাক্তন ছাত্র দ্বারা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান

রত্ন জগতে ৪৭ বর্ষ
ঐতিহ্য সর্বশীর্ষ

রত্নগিরি

জ্যোতিষ গ্রহরত্ন হীরের গহনা

১২৬, অরবিন্দ সরণী, (৫৫/৮ গ্রে স্ট্রীট)
হাতিবাগান জংশন,
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
ফোন ঃ ২৫৫৫ ৮৬২৩, ২৫৪৩ ০৯৩৫

৯৬-এ.বি.রাসবিহারী এভিনিউ
(লেক মার্কেটের কাছে)
কলকাতা - ৭০০ ০২৬
ফোন ঃ ২৪৬৩ ৮৬৩৪, টেলিফ্যাক্স ঃ ২৪৬৬ ৭২২৩

প্রাক্তন ছাত্র বিশ্বজিৎ চক্রবর্ত্তী (১৯৮৭) দ্বারা পরিচালিত

With best compliments from:

SHUSRUSHA

NURSING HOME PVT. LTD.

BUILDING ON TRUST

1 Fully Equipped Intensive Care Unit & High Dependency Unit
2 USG / X Ray / ECG / Echo • 24 Hours Pathology
3 Pharmacy • General Medicine
4 All Types of Minimally Invasive Surgeries by Renowned Surgeons

❑ Lap. Appendisectomy ❑ Lap. Cholecystectomy ❑ LAVH ❑ Lap. Repair of Hernia ❑ Lap. Spleenectomy ❑ Lap. APR ❑ Lap. Onco Surgeries ❑ Lap.Ligation ❑ Diagnostic Laparoscopy

• General and Onco Surgeries • Eye Microsurgery / Phaco • Urology / TURP • Orthopaedic

P-290, C.I.T. Scheme VI-M
Upendra Chandra Banerjee Road, Kolkata – 54
Phone: 2362 8863, 2362 8430, 2364 8910, 3290 1609

With Best Compliments From :

DIGITEK

House of Power, Electronics and Telecommunications

UPS — INVERTER — STABILIZER — EPABX

100, Garia Main Road (Mathurapur Road)
Mahamayatala
Kolkata – 700 103
e-mail: digitek_kol@hotmail.com
Phone: (033) 2435 4042/55110851

An Ex-Student's Enterprise

ABHIJIT RAY (1989)

শ্মশানের বুকে আমরা রোপণ করেছি পঞ্চবটী তাহারি ছায়ায় আমরা মিলাব জগতের শতকোটি

AN ORGANISATION RUN BY AN ALUMNUS OF VIDYAPITH

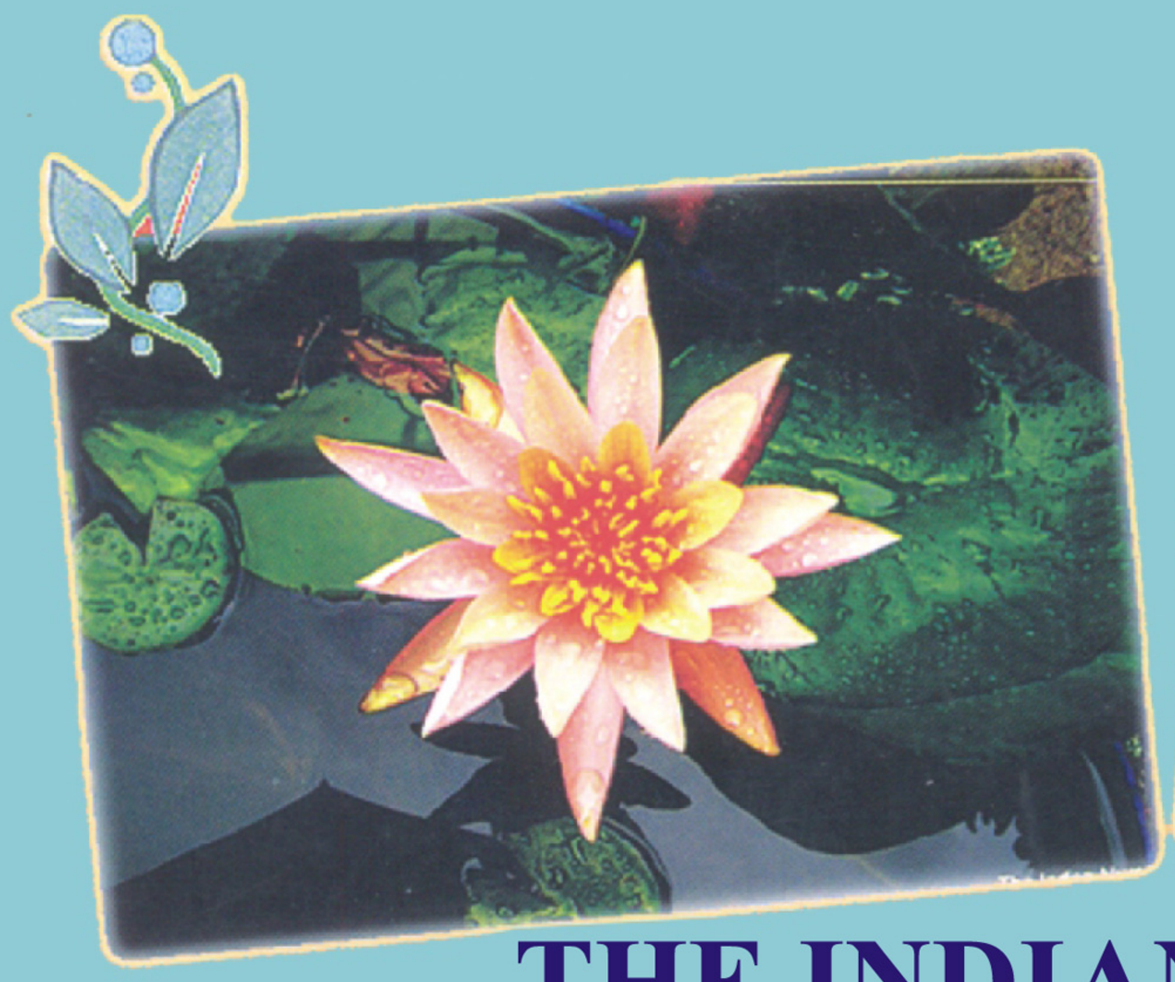

THE INDIAN NURSERY

www.indiannursery.com